

অজীর্ণতা

প্রতিকার ও ব্যবস্থা ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র বহুত্ব করিয়া আমাদের দেশে
প্রচলিত সমুদয় প্রকার খাদ্য ও পানীয় এবং নানক
দ্রব্যাদির সুবিজ্ঞান সম্বন্ধ বিচার সহ
পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা সম্বন্ধিত ।

কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজের সুবিজ্ঞ অধ্যাপক এবং
হোমিওপ্যাথিক রসে “ত্রি-চিকিৎসা” “নিম্ন-চিকিৎসা”
“ওলাউঠাষি চিকিৎসা” “বান্ধু ও গীড়ার কারণ-
তত্ত্ব” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা—

ডাক্তার শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র কর্তৃক
প্রণীত ।

INDIGESTION
ITS PREVENTION AND CURE.
(*On an easy and Sure Method*)

BY
DR. J. K. MAITRA.
Lecturer Calcutta Homœopathic College
and Author of treatises on Women
& children diseases & . & .

মূল্য ১।০ বাত ।

PUBLISHED FROM

MAITRA & SONS.

Homæo. Chemists, Simla, P.O.

84 Balaram Day Street.

(ALCUTTA.

BY

A. K. MAITRA.

—

Printed by

K. C. Dav,

5. Chudam moodi's Lane,

CALCUTTA.

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক ।

- ১। স্ত্রী-চিকিৎসা—(২য় সংস্করণ) মূল্য ২৫০ টাকা ।
- ২। শিশু-চিকিৎসা—(২য় সংস্করণ) মূল্য ১৫০ টাকা ।
- ৩। ওলাউঠা-রক্তামাশায় চিকিৎসা—বা ডাক্তার
বেলের গ্রন্থ—মূল্য ১৫০ আনা ।
- ৪। স্বাস্থ্য ও পীড়ার কারণ তত্ত্ব—মূল্য ১০ টাকা ।

আধুনিক তথ্যে পরিপূর্ণ উপরোক্ত হোমিওপ্যাথিক মতে
বঙ্গভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলি নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায় ।

মৈত্রী এণ্ড সন্স । সিমলা পোঃ । ৫৭ নং ১৩৩৭ সাল ।	}	শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রী, ম্যানেজার ৮৪ নং বলরাম দেব স্ট্রীট, কলিকাতা ।
---	---	---

প্রকাশকের নিবেদন

এ পুস্তকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা উপক্রমণিকা মধ্যে বলা হইয়াছে ; সুতরাং এখানে পদ্ধতি অনুসারে তাহা বলিবার আবশ্যকতা আর নাই ; কিন্তু পুস্তকের নামকরণ সম্বন্ধে ২১ কথা বলা কর্তব্য মনে করি। খাদ্য (Food) বিশেষতঃ দেশীয় খাদ্য পানীয়াদির সমালোচনা সম্বন্ধীয় কোন উল্লেখযোগ্য পুস্তক না থাকায়—গ্রন্থকার আয়ুর্বেদীয় ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রন্থাদি হইতে সার সংগ্রহ করিয়া ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। অধিকন্তু সাময়িক ইংরাজী ও বাংলা পত্রাদিতে এই সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত যত কিছু তথ্য, বিভিন্নদেশীয় মনিয়োগণ কর্তৃক বিবৃত হইয়াছে তাহারও সমালোচনা ইহাতে পাইবেন।

যে অজ্ঞানতার ভীষণ প্রকোপে আবালবৃদ্ধবৃন্দিত। আজকাল গ্রন্থে সুখশাস্তি হারা হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার উপর মূল লক্ষ্য রাখিয়াই—আমাদের দেশে নিত্য ব্যবহার্য্য সমুদয় খাদ্য পানীয় ও মাদক দ্রব্যাদির ব্যবহার বিশেষ প্রকারে ইহাতে সমালোচিত হইয়াছে, সুতরাং মূল বিষয় অনুযায়ীই ইহার নামকরণ করা গেল। ঔষধ সেবনে সাময়িক উপশম ভিন্ন এই অজ্ঞানতা দূরীকরণের কোনই সহায়তা পাওয়া যায় না, কিন্তু খাদ্য পানীয়াদি বিচারে সাবধানতা অবলম্বন করিলে যে, উহা স্বাস্থ্যী ফলদান করিতে পারে, তাহা এই পুস্তকখানি পাঠ করিলেই সকলে জানিতে পারিবেন। খাদ্য পানীয়াদির বিচার করিয়া চলিতে পারিলে যে অজ্ঞান ব্যাধি ও সহজে আক্রমণ করিতে পারে না তাহারও পরিচয় ইহাতে পাইবেন।’

বৈজ্ঞানিক যুগের প্রভাবে আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রে সকল বিষয়ে উত্তর অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, সুতরাং আমাদের খাদ্যপদার্থের রাসায়নিক উপাদান সমূহ এবং কোন্ কোন্ উপাদান, স্বল্প বা অধিক মাত্রায় আহারে, শরীরের সম্পূর্ণ সাধন বা জীর্ণক্রিয়ার পক্ষে বাধা জন্মাইয়া থাকে তাহাই ইহাতে দেখান হইয়াছে। পরিশেষে যে আমিষ ও নিরামিষ আহার লইয়া সমুদয় জগৎ আজি ঘোর আন্দোলনে নিয়োজিত রহিয়াছে, তাহারও উভয়দিকের সামঞ্জস্য বিচার করিয়া, কোন্ আহার এই গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে আমাদের পক্ষে উপযুক্ত তাহা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা ইহাতে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন।

স্বাস্থ্য সধকীয় সমুদয় ব্যবস্থা এবং হিন্দুধর্মের সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সধক্য বিষয়ে নূতন প্রকার আলোচনা ইহাতে দেখিতে পাইবেন। খাদ্য, পানীয় এবং বায়ু বিষয়ে সাবধানতা লইলেই যে প্রকৃত স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারে, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। এ পুস্তকে ঐ সমুদয়েরও বিশদ বর্ণনা থাকায় স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার ক্ষেত্রে ইহা আপনাকে সাহায্য করিবে।

এখন এই পুস্তক পাঠে যদি একজন অজীর্ণরোগীও উপকার লাভ করিতে পারেন, তবেই আমাদের ৪ বৎসরের শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

সূচীপত্র ।

রাসায়নিক ও মেক্যানিক্যাল উপায়ে

পরিপাক ক্রিয়া ।

১।	উপক্রমণিকা ও উদ্দেশ্য	১
২।	পাকস্থলী ও পরিপাক প্রণালী	৬
৩।	অল্পমধ্যে পরিপাক ক্রিয়ার সমাধা এবং বহুত ও পিষ্টের কার্য	৪৭
৪।	পরিপাক ক্রিয়া ও অবচূষণের সংক্ষিপ্তসার	৬২

খাদ্য ও পানীয় এবং মাদকদ্রব্য

সমুদয়ের বিচার ।

৫।	শস্ত্রাদি, শাকসব্জী এবং ফল মূল	৬৭
৬।	মৎস্ত, মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং মসলাদি	১০০
৭।	জল, দুগ্ধ, মদ, চা ইত্যাদি পানীয় পদার্থ	১২৮
৮।	তামাক, অহিফেন, গাঁজা ইত্যাদি মাদক দ্রব্য	১৭৫
৯।	খাদ্যপদার্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	১৮৮

বিবিধ ।

১০।	কোষ্ঠবদ্ধতা	১৯৭
১১।	খাদ্যের রাসায়নিক তথ্য বিচার	২১৪
১২।	আমিষ ও নিরামিষ আহার	২৩৮
১৩।	অজীর্ণরোগীর প্রতি উপদেশ	২৫২

পরম স্নেহভাজন

শ্রীতাংশুশেখর কালীর প্রীতি-মধুর স্মৃটিকোরক

সুকম-স্বতির উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইল।

থোকা ভাই !

সতের বৎসর পূর্বে এক নিদাঘের প্রারম্ভে তোমার সুকুমারি স্নিগ্ধ মুখখানি প্রথম দেখিয়াছিলাম ; তখন তুমি নিতান্ত শিশু ছিলে, সুতরাং তোমার বিশেষত্ব কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি নাই ; কিন্তু ব্যোমকির সহকারে তোমার গুণে এমন আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, তোমাকে কনিষ্ঠ সহোদর ভিন্ন আর কিছুই মনে হইত না ! শৈশবে আমি একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা হারাইয়াছিলাম, তখন তাহার জন্ত প্রাণে কিরূপ বেদনা পাইয়াছিলাম মনে নাই। কিন্তু জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, কনিষ্ঠের ভালবাসা ও ভক্তি পাইবার জন্য, প্রাণে একটি আকাঙ্ক্ষা অমূল্যব করিতাম ! জানিনা ভগবাণ আমার সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভালবাসার আশ্বাদ প্রাপ্তি, তোমাকে দিয়া মিটাইয়া দিলেন কি না ! তুমি আমার উপর যেসকল শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিতে, সহোদর কনিষ্ঠের জ্যেষ্ঠের প্রতি ততদূর রাখিতে পারে কিনা সন্দেহ ! তোমার সত্যনিষ্ঠতা, জ্ঞানার্জন স্পৃহা, ধর্মপ্রবণতা ও গুরুজনে ভক্তির কথা আদর্শস্থানীয় হইলেও এখানে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক দেখি না। কিন্তু তোমার জীবন ও দেহ পরিবর্তনে আমার যে শিকালান্ত হইয়াছে তাহাই আজ বলিব।

“মাতুল জড়দেহ ত্যাগ করিয়া কোথায় যায় ?” এ সম্বন্ধে হুস্ম দার্শনিক তত্ত্বের বহু যীমাংসী থাকা সত্ত্বেও, সাধারণের স্মার

আমিও এতদিন উহার অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিতে পারি নাই !
 কিন্তু পরমারাধ্যা জননীসমা স্নেহময়ী জ্যোষ্ঠা ভগিনী ৮ শোহাগী
 দেবী এবং পরম স্নেহভাজন সারল্যপ্রতিম সুহৃদরোগম ৮
 শীতাংশুশেখর কালী—তোমাদের উভয়ের, স্বল্পদিবস ব্যবধানে,
 নখর জড়দেহ ত্যাগ দেখিয়া প্রকৃতই বুঝিলাম যে, জীবাত্মা দেহ
 পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া, কোন এক অজ্ঞাত দেশে—যশা-
 কার সংবাদ আজ পর্য্যন্ত কেহ এ ধরায় আনিয়া দিতে পারে
 নাই—বেড়াইতে য য় মাত্র ! তাহার অস্তিত্ব লোপ হয় না !!
 কারণ যখনই তোমাদের আলেখ্য-চিত্র প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়,
 তখনই মনে হয় যেন তোমরা কোথায়—দূরে—বহুদূরে ভ্রমণে
 গিয়াছ ! তোমাদের এ ভ্রমণ, আমাদের জ্ঞান পার্শ্বব জনের ভ্রমণ
 সহ তুলনীয় হয় না, যে হেতু এ পৃথিবীর ভ্রমণে ফিরিয়া আসিবার
 একটা আশা—নিজের ও আত্মীয় স্বজনের—মনে সদা জাগরক
 থাকে ; কিন্তু জড়দেহ পরিত্যাগের পর উভয় পক্ষ হইতেই উহা
 বিলুপ্ত হইয়া যায় ! এই অভিনব শিক্ষালাভ করিয়া আমি
 প্রাণে যে কি শান্তি পাইয়াছি, তাহা ভাবায় ব্যস্ত করিতে পারি
 না । যখনই তোমাদের কথা মনে হয়, তখনই একবার স্থিরনেত্রে
 আলেখ্যচিত্র দেখিলেই, কেমন আপনা হইতে শান্তি আসিয়া প্রাণ
 শীতল করিয়া দেয় ! তোমাদেরই অদৃশ্যশক্তি অলক্ষ্যে থাকিয়া
 এই প্রাণ-শীতলকর কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে কিনা জানিনা !
 তবে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, সন্তগুরুদয়ী যদি কেহ
 আত্মীয় স্বজনের দেহান্তর ধারণ ভাবটী, আমার জ্ঞান এইরূপে
 ছদ্মবেশে গোপন করিতে পারেন, তাহা হইলে অনায়াসে প্রাণে
 শান্তি পাইতে পারিবেন ।

তাই ! সংসারের মায়া কাটাইয়া মহাপ্রয়াণ করিবার সময়,
 তুমি আমাদের সকলের নিকট হইতেই বিদায় লইয়া গিয়াছ !
 কিন্তু আমরা—সংসারের দগ্ধজীব—প্রতিনিয়ত জালাবজ্বলা
 ভোগে নিযুক্ত থাকায়, আমাদেরই জ্ঞান রক্তমাংসের শরীরবিশিষ্ট
 তোমাঞ্চে উহা এড়াইতে দেখিয়া, স্বর্ধিবশে তোমার মুক্তির পথে
 বাধা দিবার জন্য, কান্দিতে ব্যস্ত থাকায় তখন তোমায় আশী-
 র্বাদ করিতে পারি নাই ! তাই মুক্তকণ্ঠে আশীর্বাদম্বলে
 তোমার স্নেহময় নামের মধুর স্মৃতি জাগাইয়া রাখিবার জন্য
 আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি তোমায় নামে উৎসর্গ করিলাম ।
 ইহার কিয়দংশ তোমার জীবদ্দশাতেই লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু
 হায় ! তখন ভাবি নাই যে, এই ভাবে ইহার পরিসমাপ্তি হইবে !!
 আমার সম্পর্কীয় সমুদয় জিনিষই জীবিতকালে তুমি স্মরণনে
 দেখিতে ! তুমি এখন সুদূর দেবলোকে থাকিলেও যে, ইহা পূর্বের
 জ্ঞান তোমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবে তাহা আমি জানি,
 তাই অল্প কাহাকেও না দিয়া তোমার উদ্দেশেই ইহা প্রদান
 করিলাম ।

তোমার আত্মার চির মঙ্গলাকাজী—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্রী ।

অজীর্ণতা

প্রতিকার ও ব্যবস্থা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা ও উদ্দেশ্য।

যে প্রক্রিয়া দ্বারা খাদ্য পানীয়াদি অবস্থাস্থিতি হইয়া অৱচুষণ (absorption) এবং সমীকরণের (assimilation) উপ-
যুক্ত হয় এবং তাহার দ্বারা আমাদের শরীরের পরিপোষণ
কার্য্য সাধিত হয়, তাহাকে আমরা পরিপাক বা জীর্ণক্রিয়া
কহি; এই কার্য্য সাধনের জন্তই ক্ষুধা—খাদ্য পরিপাক বা
এবং পানীয়ের আকাঙ্ক্ষা—আমরা অনুভব জীর্ণক্রিয়া
করিয়া থাকি।

পরিপাক কার্য্যের ব্যতিক্রমই অপরিপাক বা অজীর্ণতা;

পরিমাণে ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকি, একারণ সমানরূপে ইহার লক্ষণাদি আমাদের জানিয়া রাখা কর্তব্য। ইহা আমা-
দের নিকট নানাতাবে উপস্থিত হইতে পারে এবং অজীর্ণতার
উভা তইতেই নানা পীড়া আসিয়া আমাদের লক্ষণ
আক্রমণ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ বেদনা, পেট ফাঁপা, ক্ষুধা-
মান্দা মুখে মন্দাস্বাদ, ভগ্নকী উল্কার উঠা, মুখদিয়া ভাল উঠা (সময়ের
সময়ে প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিলেই), ক্লেশযুক্ত জিহ্বা—
কখন থলু থলু অথবা কাটা বা শুক দুর্ভলতা ইত্যাদি
অনুভূত হয়; অনেক আবার সাধারণ অলসতা, হতাশতাব,
পুষ্ট বেদনা, নিদ্রাশূন্যতা, বদমেজাজতাব অথবা চিন্তা শক্তি-
বিহীনতা মাত্র এবং (সাংঘাতিক স্থলে) শীর্ণতাও অনুভব
করিয়া থাকেন।

এই অজীর্ণতা—বাহাকে আজকাল আমরা সকলে বিলাতী
কথার ডিম্পেপ্‌সিয়া নামে অভিহিত করিয়া থাকি—হইতে যে
কতপ্রকার রোগের উৎপত্তি হইতে পারে এবং ইহার দ্বারা
আক্রান্ত রোগী যে কতপ্রকার অসুখের কথাই বলিয়া থাকে
তাহার ইয়দা নাই। ঘোড়ের উপর এই জানিয়া রাখিলেই
যথেষ্ট হইবে যে, ইহাই সর্বরোগের আকর। আমরা এখানে
ইহার লক্ষণাদি স্পষ্টভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা
দেখি না। ঘোড়া মুটি বাগা সদা দৃষ্ট হয় তাহা সংক্ষেপে পূর্বেই
উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে
যে, বাবতীর শারীরিক বেদনা ও অসুখের সহিতই, মুখ্য বা
গৌণভাবে, পার্শ্ববর্তী রোগবোগের সম্বন্ধ বসিষ্টভাবে বর্ণনায়

থাকে । অবশ্য সকলের নিকট ইহা সমীচীন বলিয়া চরিত্র বোধ হইবেনা, কিন্তু এটি যে প্রবাসতা তাহা জানিয়া রাখিবে । ইংরা জীতে একটি প্রবাদ আছে যে (we must eat to live and not live to eat) অর্থাৎ আমরা, আহাৰ করিব জীবন বারংবার জন্ত কিন্তু জীবনধারণ কারব না শুদ্ধ খাইবার জন্ত । শরীরের পোষণের জন্ত সেটুকু নিত্য প্রয়োজন তাহাই আমরা আহাৰ করিব মাত্র এবং বাহ্যতে তাহা সমগ্রকৃতিভবনের (assimilation), পুষ্কই জীণ হইয়া যায় এবং এই সমগ্রকৃতিভবন কাগাট, শরীরের স্বাস্থ্য এবং পরিপোষণের পক্ষে, সুসম্পন্ন ভাবে নিম্পন্ন হইতে পারে, তাহার জন্ত সাবশেষ যত্নবান হইতে হইবে ; নতুবা শুধু আহাৰ করিয়া পাকস্থলী পূর্ণ করিলেই চলিবেনা । পরিপাক ক্রিয়া যদি কিঞ্চৎ অসম্পূর্ণ ভাবেও হইতে থাকে তাহা হইলে তাহাকে আমরা সুস্থতার লক্ষণ বলিতে পারিব না ।

এই পুস্তক কোন প্রকার “পেটেন্ট ঔষধের” এই পুস্তকের —যাহা আজকাল বাজারে সংখ্যাভারিতরূপে উদ্ভেদ শনৈঃ শনৈঃ পরিচালিত হইতেছে—গুণ-গারমা বিস্তার জন্ত অথবা কোন খেলালের বশে লাভত হইতেছেনা ; কিন্তু ইহা দ্বারা যে চিকিৎসকের অভাব কোন প্রকারে পূরণ হইতে পারিবে তাহাও আমরা বলি না । তবে এই অভাবতা দূরীকরণ জন্য বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ সময় সময়, যে সকল উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহাই যোগ্যক্রান্ত ব্যক্তি এবং সৰ্ব সাধারণের মানস পটে প্রাহাতে সঙ্গী অঙ্কিত থাকিতে পারে, তাহার জন্তই এই প্রয়াস । এই পুস্তক পাঠে তুমি তোমার নিজের অন্তঃসম্বন্ধে গবেষণা করিতে পারিবে এবং কেন যে, ইহা না,

উহা করিতে চিকিৎসক ব্যবস্থা দিয়া থাকেন তাহার উত্তর পাইবে। ইহা তোমাকে সুপথে চালিত করিয়া ঔষধাদির সম্ভাবহার করিতে এবং সর্বোপরি, কোন প্রকারে পাকস্থলী, পীড়ার হাত হইতে একবার নিস্তার পাইলে আর যাহাতে রোগাক্রান্ত না হয় তৎবিষয়ে যত্ববান হইতে শিক্ষা দিবে।

আমরা যে সমুদয় পীড়া বহুদৃষ্টিতে দেখিতে পাই-- যেমন কোনপ্রকার চর্মরোগ, বাতব্যাধী ইত্যাদি--তাহারই বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইয়া প্রতিকারের জন্ত চেষ্টিত হই ; কিন্তু পাকস্থলীটি চর্মচক্ষুর অন্তকালে থাকায় উহার গোলযোগের বিষয়ে আমরা প্রথমে কোনই প্রতিকার করিতে দেখি। আমাদেরই হাতে করি না। কিন্তু দেখেই সকল যন্ত্রের অপেক্ষা প্রতিকার ইহার কার্য প্রণালীতেই আমরা, একটু যত্ন করিলেই, বিশেষ সাহায্য করিয়া সুফল উৎপাদন করাইতে পারি ; কারণ এই পাকস্থলীতে জীর্ণ হইবার জন্ত, যে প্রকার এবং পরিমাণ খাদ্য উহাতে নিপতিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ আমাদেরই হস্তে নিহিত। এই জীব্যাদি পাকস্থলীতে জীর্ণ না হইলেই রোগের উৎপত্তি হয়, সুতরাং বাবতীর পাকশায়িক গোলযোগাদির প্রতিকার যে আমাদের হাতে তাহা আর বলিতে হইবে কি ?

তোমার অজীর্ণ রোগ আছে--তাহার প্রতিকারার্থে তুমি পারিবারিক চিকিৎসকের নিকট বাইলে তিনি ঔষধ ও ব্যবস্থা বিধান করিলেন ; তুমি ঔষধ ব্যবহার করিলে বটে, কিন্তু যে উপদেশাদি পালন করিতে বলিয়াছিলেন, হয় তাহা তাক্ষিণ্য করিলে অথবা ভুলিয়া গেলে, কিংবা হয়ত তাহার সমুদয়ই

তোমার নিকট গোলমাল হইয়া গেল। ঔষধের জোরে তুমি কতক শাস্তি পাইলে বটে, কিন্তু অজ্ঞানতা বা ডিম্পোপ্‌সিয়া পুনরায় দেখা দিল। উপরি উপরি কয়েকবার এইরূপ হইতে হইতে এমন এক সময় আসিয়া উপস্থিত হইবে যে, চিকিৎসকের আদেশাদি সম্পূর্ণ পালন না করিলে, আর শুধু ঔষধে পাকাত্মিক গোলযোগ নিবৃত্ত হইবে না। চিকিৎসকের আদেশমত উপদেশাদি সঠিক ভাবে পালন করা একান্ত কর্তব্য, নতুবা তোমার রোগ সারিবে না; অথচ চিকিৎসকের উপদেশাদি নীরস হওয়ায় তোমার তাহা মনেও থাকে না। এই সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য জুটাই আমরা পুস্তকাকারে সেই সকল কথা লিপিবদ্ধ রাখিলাম। চিকিৎসক শুধুই উপদেশ দিবেন, কিন্তু তাহার (Reason) কোন কারণ দেখাইবেন না; এখানে উপদেশের সহ বিস্তারিত ভাবে কারণগুলি Reason দেওয়া হইল। ইহা পাঠ করিয়া, ঠিক নিয়মে চলিতে আরম্ভ করিয়া সেই সঙ্গে ঔষধ সেবন করিতে থাক, দেখিবে অচিরমধ্যে নিজে কত অধিক সুস্থতা বোধ করিবে এবং সেই সঙ্গে আপনায় চিকিৎসক ও ঔষধ সকলের (তৎ প্রদত্ত) রোগ সারাইবার অক্ষমতা সঘনাই নিজে সন্দেহচ্যুত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

—:~:~:~:—

পাকস্থলী ও পরিপাক প্রণালী ।

জীর্ণক্রিয়া অংশত রাসায়নিক এবং অংশত mechanical উপায়ে নিহিত । আমাদের জীর্ণ প্রণালী শরীরের তিনটি পৃথক বিভাগে এই mechanical উপায়ের যন্ত্র ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার রাসায়নিক দ্রব্যাদি কার্য্য করিয়া থাকে । বিভাগ তিনটি, যথা, (১) মুখগহ্বর ২) পাকস্থলী, (৩) অন্ত্রপথ । অজীর্ণরোগ এই কয় বিভাগেরই একক বা তৎ সৃষ্টির কোন প্রকার দোষ হেতু উৎপন্ন হইয়া থাকে । যদি একটি মাত্র বিভাগের গোলযোগ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা মেকানিক্যাল অথবা রাসায়নিক গোলযোগের (defect) একক অথবা উভয়তঃ দোষেও হইতে পারে ।

আমরা প্রত্যেক বিভাগই পৃথক ভাবে আলোচনা করিয়া যাইব । প্রথমতঃ মুখগহ্বরের ধরা ঘাউক :—মুখগহ্বর— মুখগহ্বরের কার্য্য হইতেছে যে, আমরা যে দ্রব্য ভক্ষণ করি তাহা খণ্ড বিখণ্ডিত ও লালান্যাবেস সহ সংমিশ্রণ করা । এই কার্য্যকে চৰ্শ্বণ-ক্রিয়া বলে এবং ইহাই mechanical উপায় । চৰ্শ্বিত দ্রব্যের উপর লালান্যাবেস যে রাসায়নিক কার্য্য সংসাধিত হয়, উহাই মুখগহ্বরের রাসায়নিক কার্য্য বলিয়া জানিবে ।

যাও দ্রব্য আমরা যে রন্ধনাদি করিয়া আহার করি, তাহা ও

রসনা ও চক্ষুর তৃপ্তিকর হইবে বলিয়া নহে; উহা দ্বারা আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে জানিবে । রক্তনের উদ্দেশ্য

রক্তনের দ্বারা ঐ জবা সকল সাধারণতঃ পরিপাকের পক্ষে সুবিধাজনক হইয়া থাকে । কেমন করিয়া যে রক্তন আমাদের

হজম হওয়ার পক্ষে সুবিধা করিয়া দেয়, তাহা একটু বিশদভাবে বর্ণনা করা আবশ্যক রক্তন দ্বারা খাদ্য দ্রব্য নরম হইয়া, পর্বণের

বেশ সহায়তা ব ইহা মেক্যানিক্যাল উঃ) ; আরও

মৎস্য, মাংস, শাক, সবজী প্রভৃতির তত্ত্ব সকল (fibres)

রক্তনে শিথিলিত হইয়া যায় । সুতরাং আমাদের শরীর নিঃসৃত

পরিপাককারক রস সমুদয়—মুখের লালাশাব, পাকায়নের

গ্যাস্ট্রিক রস, পিত্ত প্রভৃতি—বাহ্যতে অস্থপথে (intestines)

উহাদের মধ্যে সহজে প্রবিষ্ট হইতে পারে এবং পরে

ভক্ষিত পদার্থের উপর নির্দিষ্ট রাসায়নিক কার্য সাধিত

করিতে পারে, তাহাও রক্তনে সাধিত হইয়া থাকে (ইহাই

রাসায়নিক প্রক্রিয়া) । ইহাত গেল রক্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য ;

এখন দেখা যাউক—গৌণভাবে ইহার কোন কার্য আছে

কিনা ? রক্তনে দ্রব্যাদি সুগন্ধি, সুবাস্ত্ব এবং নরম ও মনের

আনন্দদায়ক হওয়ার আহ্বারের ইচ্ছা—স্বাদা—উদ্ভিক্ত হইয়া এবং

ভিন্ন ভিন্ন পরিপাককারক গুণসকল (Glands) * প্রচুর রস

নিঃস্রবে উত্তেজিত হইয়া উঠে । এইরূপেই ঐ সমুদয় রসাদি

পর্যাপ্ত ক্ষরণ হওয়াতে ভুক্ত দ্রব্যের উপর উত্তমরূপে রাসায়নিক

কার্য সাংসাধন করিতে সমর্থ হয় ।

রক্তন করা দ্রব্য যে, কাঁচা দ্রব্যাদি অপেক্ষা সহজে হজম হইয়া থাকে তাহা বোধ হয় এখন সকলেই বুঝিতে পারি-

লেন । তবে রন্ধনটা ত্রিক্রমের হওয়া চাই তাহাও জানা আব-
শ্যক—রন্ধনে দ্রব্যাদি বেশ সুসিদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন ; শুধু
পোড়াইয়া কঠিন করিয়া লইলে হইবেনা, সুসিদ্ধ হওয়া

তাহাতে খাদ্যদ্রব্যকে অপরিপাচ্য করা হয় চাই ।

জানিবে ; আবার তৈল বা ঘৃত (চর্কি) দ্বারা অর্ধপক (আধসিদ্ধ)
করিলেও চলিবেনা ; ইহাতে বিবিধা, ঘৃণা এবং ক্ষুধামান্দ্য
উপস্থিত হইতে পারে । যদি উত্তমরূপে পরিপাক করাইতে চাহ,
বা হজম শক্তি বজায় রাখিতে চাহ, তাহা হইলে খাদ্য দ্রব্যাদি
মাতাতে উত্তমরূপে সুসিদ্ধ হয়, তাহার উপায় নিম্নরূপে করিবে ।

আমাদিগের খাদ্যদ্রব্য বিশেষতঃ বাঙ্গালীর—রন্ধন প্রণালী
সুবিজ্ঞান সম্মত এবং আমরা উহা সুসিদ্ধ না করিয়া ভোজনই
করি না, সুতরাং এসম্বন্ধে আমাদের অধিক না বলিলেও চলে ;
কিন্তু সময় প্রভাবে আজকাল আমরাও সমুদয় বিলাতী
(পাশ্চাত্য!) প্রথা অনুকরণ করিতে বাইরা, আমাদিগের
নিজস্ব চিরন্তন রন্ধন প্রথাও পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করি-
য়াছি । অন্ন সিদ্ধ বা অসিদ্ধ দ্রব্যাদি ভোজন আমাদিগের
আত্মার পক্ষে যে কোন মতেই উপযোগী নহে, তাহা আমরা
আর মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি ! সুতরাং বিলাতী হোটেলের
রন্ধন করা উক্ত দ্রব্যাদিও অন্নানবদনে আহার করিতে আরম্ভ
করিয়াছি । আমাদিগের দেশের কাঁহাকেও বোধ হয় একথা
বলিয়া দিতে হইবে না যে, আমাদিগের রন্ধন প্রক্রিয়া তাহা-
দিগের অপেক্ষা শতগুণে উত্তম !! কিন্তু ভিন্ন কচিহঁ লোকঃ ।

স্থলগতবস্তুর Mechanical দোষ অর্থাৎ চর্ষণ ক্রিয়া পর্যাপ্ত-
রূপে না হওয়ার, অজীর্ণতা উদ্ভূত হইতে পারে ; কারণ গলনাশী

মধ্যে সহজে প্রবিষ্ট হইবার উপযুক্ত হওয়ার জন্ত, ভূত
 দ্রব্যাদি বিশেষভাবে টুকরা টুকরা হওয়া প্রয়োজন এবং টুকরা
 টুকরা করিবার জন্ত দন্তের সাহায্য নিতান্তই পর্যাপ্ত চর্ষণ
 প্রয়োজন। আমরা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, মুখ-
 গহ্বর, পাকায় প্রভৃতির নিঃসৃত রস ভক্ষিত দ্রব্যের প্রাত
 অন্ন পরমাণুর সহ স্মৃমিশ্রিত হইলে তবে পরিপাক কার্য
 উত্তম ভাবে হইতে পারে। সকলেই জানেন যে মিছরী অপেক্ষা
 চিনি অল্প সময়ের মধ্যে জলে মিশ্রিত হইয়া থাকে; সুতরাং
 চর্ষণ দ্বারা দ্রব্যাদি যত টুকরা হইবে তত সত্তর যে উহা
 পুষ্টোক্ত নিঃসৃত রসাদি সহ মিশ্রিয়া যাইবে, ইহা বোধ হয়
 সকলেই অনুমান করিতে পারেন। তবেই দেখা যাইতেছে যে
 চর্ষণ ক্রিয়া যত পর্যাপ্তরূপে হইতে থাকিবে, তোমার পরিপাক
 ক্রিয়াও তত উত্তম ভাবে হইবে; এখনও কি বলিতে হইবে
 যে চর্ষণ ক্রিয়া যতদূর সম্ভব পর্যাপ্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়?
 যদি তোমার দন্ত সকল উপযুক্ত শক্তি সম্পন্ন না হয়, অথবা
 অন্য কোন দস্তপীড়া থাকে, যে জন্ত চর্ষণে বাধা জন্মাইতে
 পারে, তাহা হইলে কোন দস্তচিকিৎসকের উপদেশমত উহার
 বিশেষ প্রতিকার করিয়া লওয়া কর্তব্য। এইরূপে দন্তের
 উপযুক্ত ব্যবহা করিয়া লইয়া, আহারের সময় তাড়াতাড়ি করিয়া
 খাওয়া বন্ধ গিলিয়া না থহিয়া, জগদীশ্বর যে জন্ত দন্ত দিয়াছেন
 তাহার সচ্যবহার করিবে; অর্থাৎ ধীরে ধীরে সম্পূর্ণরূপে
খাদ্য বস্ত চর্ষণ করিবে। কারণ তাহা হইলেই উহা খণ্ড বিখণ্ড হ
 হইয়া লালাস্রাবের সহিত বেশ মিশ্রিয়া যাইবে এবং ভক্ষিত
 বস্তর উপর নির্দিষ্ট রাসায়নিক কার্য করিতে সমর্থ হইবে।

একজন কৃতব্রত পাণ্ডিত্য মনিষী চিকিৎসক তাঁহার অজীর্ণ রোগীগণকে আদেশ করিতেন যে, “কতবার চৰ্ষণ কর তাহা গণিয়া রাখিবে।” স্বাস্থ্যরক্ষার পুস্তকেও আমরা উহার অল্প-মোদন দেখিতে পাই। গণনা কারয়া থাইতে বলার অর্থ আর কিছুই নহে, যত অধিক সময় চৰ্ষণে নিয়োগ করিতে পারা যায়, তাহাই আদেশ করা মঙ্গল জানিবে।

“বাক্ক্যে অথবা যখন ক্রীড়ম দস্ত সাহায্যে চৰ্ষণ করিতে অসমর্থ হইবে, তখন ভোজন পদার্থ কোন যন্ত্র সাহায্যে উত্তম-রূপে ছোঁচয়া লইয়া, তবে আহাৰ করা কৰ্তব্য। অনেকে বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন যে, পাত্তদস্তক বৃদ্ধগণ অথবা চন্দ্রশাস্ত্র লোকেরা তাহুলাদ ছোঁচয়া লইয়া আহাৰ করেন। এ প্রথা আত উত্তম জানিবে, তবে উহা শুধু তাহুলা-দিতেই নিহত না রাখিয়া, সকল কঠিন দ্রব্যের জন্তই ঐ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বৃদ্ধবয়সে দন্তের মাড়ী অল্প সমর্যাপেক্ষা কঠিন-তর হয় বটে, কিন্তু দস্ত দ্বারা যে কাষ্য পুষ্ক-সাবত হইত তাহা সম্যকরূপে সাধিতে সমর্থ হয় না। এই জন্তই “দাঁত থাকিতে দাঁতের মন্ম বুঝা যায় না” প্রবাদবাক্যের স্মৃতি হইয়াছে জানিবে।

ভুক্ত পদার্থ মুখপথে চালিত হইবার সময় উষ্ণ বরফ ও হইয়া উঠে; এ সময় বরফ অথবা বরফবৎ শীতল বরফ জল কোন প্রকার খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য, (যাহা পাকায়গ্রে প্রবিষ্ট হইবার পুষ্ক, মুখ পথে উষ্ণ হইবার পম্যাপ্ত সুযোগ পাইবে না) সেবন করা কৰ্তব্য নহে। এ প্রকার শীতল দ্রব্য থাইলে পাকা-শয়ে ঠাণ্ডা লাগিবে, আর উহাকে নিজ কৰ্তব্য সাধনে বাধাও দিয়া অজীর্ণতা উৎপাদন করিবে। এই কারণে আহাৰ কালে

কোন প্রকার অধিক উষ্ণ পানীয় বা খাদ্য দ্রব্যও সেবন করা উচিত নহে। যদি তুমি সন্ধ্যা সন্ধ্যা রাতিতে পার বে, অত্যধিক শীতল বা উষ্ণ পানীয় অথবা খাদ্যদ্রব্য খাওয়া উচিত নহে এবং আহ্বারের সময়, অথবা বাস্তবতা প্রদর্শন না করিয়া, ধীরে ধীরে ও পর্যাপ্তরূপে চর্ষণ করিয়া ভোজন করা কর্তব্য (কারণ তাহাতে খাদ্য দ্রব্যের উপর লালাশ্রাব অনিয়োজিত কার্য্য করণে সামর্থ্য ও সুযোগ পায়), তাহা হইলেই জানিবে যে মুখগহ্বরের কার্য্য সম্পাদনে, তোমার যাহা অধিকার তাহা উপযুক্ত রূপেই করা হইল। মুখ নিঃসৃত লালাস্রবের পরিমাণ বা Quality গুণ সম্বন্ধে যদি কোন দোষ থাকে, তাহার সংশোধন জ্ঞাত যে ব্যবস্থা করা কর্তব্য, তাহা তোমার চিকিৎসক করিবেন। কিন্তু যদি চিকিৎসকের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, নিজে নিশ্চেষ্ট থাকিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে দেখিবে যে শুদ্ধ ঔষধে চিকিৎসক তোমার রোগ নিরাময় করিতে সমর্থ হইবেন না! নিজের চেষ্টা নিজে না করিলে অন্তের চেষ্টায় তাহা ভালরূপে সাধিত হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয় জানিয়া রাখিবে।

পরিপাক সম্বন্ধে মুখ গহ্বরের নির্দিষ্ট কার্য্য বর্ণনা করার পর, এইবার আমরা (পূর্বে বিভাগ মত) দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে, অর্থাৎ পাকাশয়ে উহার কার্য্যাকার্য্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

মুখগহ্বরে ভক্ষিত পদার্থ পর্যাপ্তরূপে চর্ষিত পাকাশয়ে এবং লালাস্রবে মিশ্রিত হইয়া, জিহ্বা দ্বারা পরিপাক ক্রিয়া গলদেশের পশ্চাৎভাগে নীত হয়; এই স্থানে উহা গল-গহ্বরের মুখের (Gullet) মাংসপেশী দ্বারা আঁকড়াইয়া

যত, গিলিত এবং অন্ননলী (oesophagus) মধ্যে চালিত হয় ।
 এই অন্ননলীর সমুদয় গাত্র মাংসপেশী দ্বারা গঠিত থাকায়,
 উচ্চ ভুক্তি দ্রব্যকে এমন ভাবে চালনা করিতে থাকে যে, উহা
 ঐ নলপথে (২৬ ফিট) , সতর্কতাই ভ্রমণ করিতে সমর্থ হয় । খাদ্য
 বস্তুর এই ভ্রমণ পথের প্রথম বিরাট স্থানটি আমাদের পাকায়ন ।
 এই স্থানে আসিতে হইলে অন্ননলী ও পাকায়নের সন্ধিস্থলস্থ
 (lock-gate) রুদ্ধ-কবাট বৃদ্ধ রক্তপথ পার হইয়া
 উচ্চাঙ্গে আসিতে হয় । পাকায়নে পরিণত ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলে,
 ভুক্তি পদার্থ এখন ক্ষুদ্রাঙ্গে (Small intestines) নীত
 হয়, পরে বৃহদাঙ্গে আসিয়া থাকে । সুস্থাবস্থায় এবং যখন পাকা
 যন্ত্র শূন্য (empty) থাকে, তখন ঐ পূর্বোক্ত রক্তপথ—অন্ননলী
 ও পাকায়নের সন্ধিস্থল—অন্ননলী হইতে পাকায়নে ভুক্তি পদার্থ
 প্রবিষ্ট হইলেই তৎক্ষণাৎ আপনা হইতে (automatically)
 রুদ্ধ হইয়া যায়; আবার কোন পদার্থ গলাধঃকৃত হইলে
 উচ্চ আপনা হইতে উন্মুক্ত হইয়া যায় ।

এই ত গেল ভগবানের ইঞ্জিনিয়ারী কার্যের একটা নিদ-
 র্শন মাত্র; এখন দেখা যাউক পাকায়নে ভুক্তি পদার্থ উপনীত
 হইলে উচ্চাঙ্গে তাহার mechanical process কি উপায়ে
 সাধিত হইয়া থাকে; সুস্থাবস্থায় ভুক্তি পাকায়নের
 পদার্থ পাকায়নে আসিলেই উহার রক্তাধার মেকানিকাল
 সকল বর্দ্ধিতায়ত্তন হইয়া উঠে । কাজে উপায়
 কাজেই ঐ সময়ে পাকায়নে রক্ত অধিক সঞ্চারিত হইতে
 থাকে । পাকায়নের গাত্রে যে সমুদয় স্রাও আছে, উহা
 হইতে সেই সময় রস (Gastric juice) নিঃসৃত হইয়া পাকায়নের

খাদ্য পদার্থে মিশ্রিত হয় এবং উহা জীর্ণ করিতে চেষ্টা করে ।
এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ঐ চেষ্টা কি পকারে সাধিত
হইয়া উঠে ? পাকায়ের গায় সমুদয়ই বেনীর ভাগ, পেশী দ্বারা
গঠিত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে ; খাদ্য জ্বা পাকায়ের যে
মাত্র উপস্থিত হয়, তখনই উহা সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং
অনবরত ঐ পেশী সকলের আকৃষণ স্বনিত একটা আলোড়ন
উপস্থিত হইয়া ভক্ষিত পদার্থকে মহন করিতে থাকে । মাগন
প্রস্তুত জাত্য নবনীত যে পকারে মথিত হইয়া থাকে, তাহা যদি
কেহ দেখিয়া থাক, তাহা হইলে সে পকারে ঐ ভক্ষিত পদার্থ
পাকায়ের মথিত হইয়া যায় তাহার কতকটা ধারণা
কবিত্তে সমর্থ হইবে । পাকায়ের এই আলোড়ন, পরিপাক
সম্বন্ধে বিশেষ আনুকূল্য জ্ঞানিবে ; ইহা দ্বারাই খাদ্য বস্তু,
গ্যাষ্ট্রিক গণ্ড সম্ভূত রসাদি সহ প্রকৃষ্টরূপে মিশ্রিত হইয়া যায় ।
সুতরাং ঐ রসাদিও খাদ্য বস্তুর অণু পরমাণুর উপর নিজ
রাসায়নিক কার্য সম্পাদনে অধিকার প্রাপ্ত হয় । এই মহন
দ্বারা খাদ্য বস্তু আরও (pulpy) তরল দলা যুক্ত হইয়া
পড়ে এবং অন্নলীপথে পরিভ্রমণ করিবার সময়, জীর্ণক্রিয়া
বস্তুই অগম্য হইতে থাকে, পাকায়ের আলোড়ন পাটরা
ভক্ষিত পদার্থ ততই পাকায় হইতে অল্পপথে চালিত হইতে
থাকে, এবং অত্যন্ত পরিপাক সম্বন্ধীয় রসাদি সহ সুভাবে মিশ্রিত
হইবার উপযুক্ত হয় । পাকায়ের অভ্যন্তরে এই মহন ক্রিয়াই
—পাকায়ের পর্যাপ্ত আকৃষণ—উহার পরিপাক সম্বন্ধীয়
মেক্যানিকাল পদ্ধি এবং খাদ্য বস্তুর উপরে পূর্বোক্ত রসাদির

পাকশয়ের পরিপাক প্রক্রিয়া বোধ হয় এখন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। স্বস্থানস্থায় উহার কার্য নিয়মিতরূপেই চলিয়া থাকে, সুতরাং পাকশয়ে অজীর্ণতা অজীর্ণতা অর্থাৎ পাকশয়ের অসুস্থতা দেখা দিলেই অনুমান করিঁত হইবে যে, উহা পাকশয়েরই মেক্যানিক্যাল বা রাসায়নিক অথবা উভয়েরই একর সংযোগে সম্ভূত হইয়াছে। দোসী ব্যক্তি নিজদোষ সম্যক উপলব্ধি করিতে পাবিলে, অনুতাপজনিত যে প্রকার অব্যক্ত যাতনা অনুভব করিয়া থাকে, সেটুকু পাকশয়ও নিজদোষ বুঝিতে পারিয়া যে অনুতাপাগ্নি সজ্জ করিয়া থাকে, তাহাই অজীর্ণতারূপে আমাদের অনুভূত হয় এইরূপ অনেক বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা পূর্বে দেখাইয়া আসিয়াছি যে, এই পীড়া যুগ্মক্লেশের দোষজনিতও উদ্ভূত হইতে পারে এবং পরে আরও দেখাইব যে, অন্ত্রপথীয় দোষ হইতেও উহা দেখা গাইতে পারে; সুতরাং একমাত্র পাকশয়কেই ইহার জন্ত অনুযোগ দেওয়া বিজ্ঞানোচিত কার্য্য হয় না।

প্রথমতঃ এখন দেখা যাউক যে, পাকশয়ের মেক্যানিক্যাল দোষ অর্থাৎ পূনোক্ত মছন প্রক্রিয়া কি প্রকারে দোষাবিহীন হইতে পারে এবং সামান্য সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা কি পরিমাণে তাহার প্রতিকার সাধিত হইতে পারে। পাকশয়ের মেক্যানিক্যাল দোষের অর্থে আমরা এই বুঝি যে, উহার পেশী সকল খাণ্ডবস্থকে সম্যক প্রকারে আঁকড়াইয়া ধরা, মছন এবং বহিঃনিসারণ কার্য্য সম্পন্ন করে না। এখন কথা এই যে কেন উহা করে না? পাকশয়ের পেশী সমুদয় দুর্বল এবং

থলথলে ও আপন নির্দিষ্ট কার্য্যকরণের উপযুক্ত শক্তিহীন হওয়ায় ইহা ঘটতে পারে। পাকাশয়টি আমাদের শরীরের একটি অংশবিশেষ ; যদি কোন কারণে সমুদয় শরীরটি আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহার অংশবিশেষও যে উহাতে আক্রান্ত হইবে ইহা নিশ্চয়। এখন যদি মনে করা যায় যে শরীরের সমুদয় পেশী দুর্বল এবং থলথলে হইয়াছে তাহা হইলে পাকাশয়ের পেশীগুলিও যে সেইরূপ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ আছে কি ? পেশী সমুদয়ের এই দুর্বলগাৱস্থা অনেক সময় মুক্ত বাতাস ও ব্যায়ামের অভাব দ্বারা আনীত হইয়া থাকে ; কিন্তু দু'একটি কঠিন পীড়ার স্থল ব্যতিরেকে, ইহা কখনই স্বল্প দিবস অথবা সপ্তাহের মধ্যে সংঘটিত হয় না। ঐ ক্ষয়প্রক্রিয়া বহুদিবস পূর্ণ হইতেই আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ অগ্রগামী হইতে থাকে ! আমাদের জীবনীশক্তি যতক্ষণ সামর্থ্য উহাকে উপেক্ষা করিয়া যায়, কিন্তু পরে এমন এক সময় আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তখন আর উপেক্ষা করা চলে না ; কাজেই তখন আমরা বাহ্যতঃ অসুস্থ হইয়া পড়ি। রোগের বিকাশ হইতেও যেমন দীর্ঘ সময় লাগিতে দেখা যায়, উহার উপশম বা নিরাময় হইতেও যে,সেই পরিমাণে সময় লাগিবে ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক। অনেকে এই বিষয় সম্যক অবগত না থাকায় রোগারোগ্য সন্ধক্ষে অগত্যা হতান হইয়া পড়েন, এবং চিকিৎসকের উপর দোষারোপ করিতে থাকেন। এই কথা জ্ঞাত থাকিলে সম্ভবতঃ তাহারা আশঙ্ক হইতে পারিবেন।

স্বাস্থ্যরক্ষা এবং পরিপাক ক্রিয়া, উভয়রূপে হই- উভয়ক বান্ধ
বার জন্য উভয়ক সুবাতাস আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয়ত

প্রয়োজনীয় । অহুত্বোপযুক্ত সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন (oxygen) যদি আমরা না পাই, তাহা হইলে অধিকক্ষণ জীবন ধারণ করিতে পারি না । উন্মুক্ত স্রবাস বলিতে আমরা এই বুঝি যে, যাহাতে অধিক পরিমাণ অক্সিজেন আছে, এবং যে বাতাসে উহার পরিমাণ স্বল্প থাকিয়া কাসানক আসিড্ গ্যাসের পরিমাণ অধিক থাকে, তাহাকেই আমরা মন্দ অথবা দূষিত বাতাস বলিয়া থাকি ।

সমধিক অক্সিজেন না পাইলে আমরা অধিকক্ষণ জীবন ধারণ করিতে পারি না, কিন্তু না খাইয়াও আমরা কয়েক দিবস কাটাইয়া দিতে পারি । মনে রাখিবে যে, সমুদয় দিবস ও রাত্রি তুমি স্বল্পাধিক পরিমাণে দূষিত অথবা শোধিত বায়ু শ্বাস গ্রন্থাসে গ্রহণ করিতেছ এবং এই যে শ্বাসগ্রন্থাস ক্রিয়া দিবারাত্র অব্যাহতভাবে চলিতেছে, উহা তোমার সুস্থতার (সুতরাং জীর্ণক্রিয়ার) উপরও বিশেষ প্রভাবযুক্ত হইয়া আছে । প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন অথবা অস্তান্ত সময়, তুমি স্রবাস সেবন করিয়া থাক বলিয়া সন্দেহ হইলে চলবে না ; তোমার শয়ন কক্ষ সৰ্ব্বক্ষে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । প্রত্যেক লোকেই দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে, মোটের উপর অধিকাংশ সময় শয়ন কক্ষে কাটাইয়া থাকে ; একারণ প্রত্যেকের শয়ন কক্ষই সর্বাঙ্গোৎকৃষ্ট হওয়া চাই ।

বায়ু চলাচল সম্পন্ন হওয়া কর্তব্য । কিন্তু তাৎক্ষণিক লোকে জায়গা মনে করিয়া থাকে যে, যেমন তেমন—আলোক ও বায়ু চলাচল থাক বা না থাক—ছোট বা বড় ঘর হউক না কেন শয়নের কার্য্য তাহাতেই চলিতে পারে ; কিন্তু বৈঠকখানা বা

অভ্যর্থনা গৃহ উৎকৃষ্টতম হওয়া কর্তব্য, কারণ অভ্যাগত সকলে
যেন তাহা দেখিয়া সুখ্যাতি করিতে পারে ! বাহ্য পারিপাট্য
দেখাইয়া সর্ব সাধারণের প্রীতিলাভের আকাঙ্ক্ষা আমাদের
এতই অধিক ! ! আমাদের মনে হয় যে কি স্ত্রী, কি পুরুষ,
সকলেই জীবনের এক তৃতীয়াংশ কাল শয়ন কক্ষেই যত্নপূর্ণ
করিয়া থাকেন ; সুতরাং দেখা উচিত যে শয়ন গৃহ যেন বেশ বড়
উচ্চ, উন্মুক্ত বায়ু চলাচল পূর্ণ, দক্ষিণ দিক খোলা এবং আত-
রিক্ত মোটা পর্দাদি দ্বারা আবর্তিত না থাকে । শয়ন গৃহে অপ্র-
য়োজনীয় কোন প্রকার বড় বড় আলমারী, দেয়াল প্রভৃতি
রাখাও উচিত নহে ; যদি পাট বা পালক রাখা
প্রয়োজন হয়, তবে একখানি বড় না রাখিয়া, দুই শয়ন কক্ষ
খানি ছোট ছোট রাখা কর্তব্য এবং তাহাই

স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী জানিবে । গৃহে বায়ু চলাচল সুভাবে
চলিবার বন্দোবস্ত করিয়া সুখে নিদ্রা যাওয়া কর্তব্য ; আমা-
দিগের দেশে গৃহস্থেরা প্রায়ই সকলে অথবা অনেকে একত্রে
একই গৃহে শয়ন করিয়া থাকেন ; এ প্রথা ভাল নহে—
অবশ্য বাহার সামর্থ্য আছে তাহাদের পক্ষে । সহরে আস
করিতে হইলেই, স্থানভাব বশতঃ ঐক্যপূর্ণ জীবনযাপন করিতে
হয়, একারণ সহরের বাহিরে পল্লীগামের কোন শান্ত শীতল
শ্যামল ছায়ার ঘাইয়া অপারগগনের থাকা উচিত । শয়ন গৃহের
সমুদয় জানালাই উন্মুক্ত রাখা কর্তব্য—বিশেষতঃ যদি একগৃহে
অধিক লোক শয়ন করিতে বাধ্য হয়—অবশ্য শীতকাল উষ্ণ
ব্যতিক্রম করা প্রয়োজন । কিন্তু তখনও একেবারে সমুদয় রন্ধাদি
পর্বান্ত বন্ধ করিয়া, গৃহে ঠাণ্ডা আসিবার আশঙ্কা নিবারণ করা

কর্তব্য নহে। পরস্ফা হাতে বাহিরের মুক্ত বায়ু কক্ষমণ্ডে যাইয়া, তদ্ব্যবস্থায় দূষিত বায়ু শোষণ করিতে পারে, সদা তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যদি গায়ে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ই থাকে, তবে ঠিক মাথার দিকের জানালা উন্মুক্ত না রাখিয়া, পায়ের দ্বাৰে উহা মুক্ত রাখা দরকার এবং গৃহ অধিক শীতল হইতে থাকিলে, সেই উন্মুক্ত জানালার গায়ে একখানি বড় পাতলা পর্দা অথবা বস্ত্র ঝুলাইয়া দিলেই উভয় কার্য সাধিত হইতে পারিবে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নিয়মে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন--গায়ে উপর একখানি সমরোপযোগী বস্ত্র দিয়া উহা আবৃত করিয়া রাখা উচিত। এই প্রকারে গায়ে ও exposed থাকিবা হঠাৎ বাতাসের ঝাপটা লাগায় ঠাণ্ডা লাগিতে পারে না এবং গৃহে যথোপযুক্ত স্রবাতাস পূর্ণ থাকিয়া, স্বাস্থ্য এবং জীর্ণ ক্রিয়া পক্ষে বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়া থাকে।

আমাদিগের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও শয়ন গৃহের বাতাসন উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন একথা কি বলিয়া দিতে হইবে? বাতাসের ঝাপটা (draught) গায়ে লাগিতে দেওয়া কোন মতেই কর্তব্য নহে। আলোক ও বাতাস চলাচলের পথ মুক্ত রাখিয়া, আমরা যদি বাস করিতে পারি, তবে দেখিবে যে অর্ধেক সংখ্যা রোগ নিজেই মারিয়া গিয়াছে অথবা উহা আমাদের ত্রিসীমানায় আসিতেও পারে নাই!

দেহ দুর্বল এবং অসুস্থ থাকিলে—মুক্ত স্রবাতাসের অভাবে বাহ্য প্রায়ই উপস্থিত হইয়া পড়ে--শরীরের সমুদয় অংশের সহ লীকাশয়ের পেশী সমুদয়ও দুর্বল হইয়া পড়ে এবং সম্যকরূপে

স্বকর্তব্য পালন করিতে পারে না। পাকশয়িক পেশী গাত্র দুর্বল হওয়ার ক্রমে পাকশয় বিবৃদ্ধ হইয়া পাকশয়িক পেশীর পড়ে ; আবার পাকশয় বড় এবং বিবৃদ্ধ দুর্বলতা

হওয়ার, তন্নিহিত পদার্থ তন্মধ্যে উদ্ভূত প্রকারে মথিত হয় না। এষ্ট কারণে ভুক্ত বস্তু তথায় দুই, তিন অথবা চারি ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণরূপে জীর্ণ হইতে না পারিয়া বহু বিলম্বে হইতে থাকে ; সুতরাং ঐ ভুক্ত বস্তু যত সহর অন্ত্রনাম্যে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক তাহা হইতে পারে না। পাকশয় প্রায়ই একেবারে শূন্যাবস্থায় থাকে না, খালি বস্তুর কিছু অংশ সদাই তন্মধ্যে থাকিয়া যায়, এবং অধিকক্ষণ যাবৎ তথায় থাকার জন্য উহা গাঁজলাইয়া (fermentation) উঠে, নানাপ্রকার গ্যাসের উদ্ভব করিতে থাকে এবং তজ্জগৎ রোগী শরীর মধ্যে বায়ু-জমা (flatulence) (অতীব কষ্টনায়ক বেদনাজনিত ক্রেশ) অনুভব করে। এই অবস্থা অধিক দিবস স্থায়ী হইলেই, ভুক্ত পদার্থ ফেণাযুক্ত গাঁজলান ভাবের হইয়া, বমিত হইতে থাকে।

আমরা অবশ্য এ কথা বলি না যে, অজীর্ণ রোগী মাত্রেরই পাকশয় বর্জিতায়তন হইয়া থাকে ; কিন্তু পাকশয়িক inec-hanical কার্য সুভাবে না চলিলে যে উহা বর্জিতায়তন, ময়লা এবং দোষযুক্ত হইয়া পড়ে ইহা নিশ্চয়। তবে সকল রোগের ন্যায় ঈহারও অবস্থাবিশেষের তারতম্য হইয়া থাকে। চিকিৎসকের উপদেশাদি মানিয়া না চলা হুহু, যে অজীর্ণতা দৃষ্ট হয়, তাহা প্রধানতঃ পাকশয়িক mechanical কার্যের অসম্পূর্ণতা

হইতেই উদ্ধৃত । শরীরের সাধারণ সুস্থতা, এবং দিবসে ও রাত্ৰিতে উন্নুক্ত সুবাসনা সেবন করা বাতীতও, আরও কয়েকটি

মেক্যানিকাল কার্যের
সহায় সাধন

বিষয় পরিচর্যা করিলে, তবে গাকাশয়িক পেশী সমুদয়ের কার্যক্ষমতা নিবারণ করা যাউতে পারে । ব্যায়ামে এ বিষয়ের

উপকারীতা বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয় ; একারণ ব্যায়াম করা

আবশ্যক, কিন্তু ইহা যেন মাত্রায় অত্যধিক অথবা অত্যল্প না হয় । পাঠবিশেষে যে একই বিষয় অমৃত ও বিষতুল্য হইয়া থাকে তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন , এই ব্যায়াম বিষয়েও উহা সম প্রযোজ্য :—একের পক্ষে যাহা পরিশ্রম বলিয়া মনেই হয় না, অস্ত্রের পক্ষে হয়ত তাহাই সবিশেষ শ্রমসাধ্য হইয়া পড়ে । অখারোহণে ভ্রমণ বড়ই শ্রমসাধ্য ব্যায়াম, কিন্তু বাহাদিগের হৃৎপি-

ণ্ডের পীড়া আছে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা বিষতুল্য পরিত্যাজ্য ।

আমাদিগের মতে পাদ-ভ্রমণই সর্বোৎকৃষ্ট প্রকারের ব্যায়াম ব্যায়াম বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু তাহা বলিয়া দীর মন্থর গমনে শতপাদ মাত্র ভ্রমণ করিলেই যে কাজ হইবে তাহা নহে । বেড়াইবার সময় দৃঢ়চিত্তে ঐমত পরিমাণ পথ অতিক্রম করা প্রয়োজন, বাহাতে তোমার সর্পশরীর উপযুক্ত চালিত হইয়া, শ্রম উপলব্ধি করিতে পারে । তোমার শরীরের পক্ষে কতখানি পরিশ্রম সহ্য হইবে, তাহা চিকিৎসক দ্বারা নিরূপণ করাইয়া লইলেই ভাল হয়, কারণ অনেক সময় নিজের বিবেচনা শক্তি উহা নিরূপণে সমর্থ হয় না । রোগবিশেষে দেখিয়াছি যে রোগী কেমন একপ্রকার জড়বতাবাপন্ন হইয়া পড়ে যে, "খেদ্দার."

সামর্থ্য সম্বন্ধে, অল্প কোন পরিশ্রম করিতে চেষ্টা করা দূরে থাক, সামান্য বেড়াইতেও চাহে না ! এরূপ স্থলে চিকিৎসকের কর্তব্য যে একরূপ জোর করিয়াই, তাহাকে পরিমাণ নির্দেশপূর্বক, পাদ-ভ্রমণে নিযুক্ত করা এবং তাহা সমাক্রমে সাধিত হয় কিনা দেখিবার জন্য তাহার কোন আত্মীয়ের উপরে ভার অর্পণ করা । পাকাশয় ও হৃৎপিণ্ড, উভয়ের পক্ষেই ব্যায়ামাদিক্য হানিকারক । দুর্বল রোগীগণের আরোগ্যাবস্থায় (invalid) যখন কোন প্রকার শ্রমই করিবার সামর্থ্য থাকে না, তখন massage practice অতিশয় প্রয়োজনীয় এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী জানিবে ।

শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া কখনও আহারে প্রবৃত্ত হইবে না ।

মনে রাখিবে যে, যদি নিজের নিরতিশয় শ্রান্ত আহারের পূর্বে হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার পাকা- বিশ্রাম শয়ের পেশী সমুদয় সম্যক কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে না । আহারের নির্দিষ্ট সময়ে, যদি তুমি শ্রান্তি ও ক্লান্তি অতুচ্ছ করিতে থাক, তাহা হইলে অন্ততঃ ১৫ মিনিট. (নিম্ন মত অর্ধ ঘণ্টা হইলেই ভাল হয়) উপবেশন করিয়া, শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম উপভোগ করিয়া লইবে । পাকাশয়ে খাদ্য বস্তু চাপা-ইবার পূর্বে, সাধারণতঃ শরীরবিধানকে শাস্তি প্রদান করা কর্তব্য ; কারণ জীর্ণক্রিয়ার জন্য ঐ শরীর বিধানের, কোন অংশেই ত আবার শ্রম করিতে হইবে ? যদি পূর্ব হইতেই শ্রান্ত থাকে, তবে কেমন করিয়া আবার পূর্ণ উত্তমে উহা কার্য্য করিতে সক্ষম হইতে পারে ?

আহারের অব্যবহিত পূর্বের কার্য্য বর্ণনা করিয়া, এখন উহার পরে কি করা কর্তব্য তাহাই আলোচনা করা প্রয়োজন। পাকশয় গাত্র অতিশয় পাতলা—২।৩ খানি ব্রাউন কাগজ একত্রিত করিলে বতটা পুরু হয় মাথ ততটা—এবং এট যন্ত্র তোমার আজীবন সঙ্গী থাকিবে। ইচ্ছা করিলেই যে তুমি উঠা বদলাইয়া দিবে তাহা পারিবে না ; চিকিৎসকের নিকট যাইলেও তিনি বড়জোড় না হয়, উহা জোড়াতাড়ি দিয়া রাখিবেন, কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন একটি তৈয়ারী করিয়া বসাইয়া দিতে পারিবেন না ! জুংপিণ্ডের অতি সন্নিকটেই যে পাকশয় অবস্থিত এবং এই পাকশয়ই কার্য্য যে বড়ই delicate অর্থাৎ সহজেই বিকৃত হইয়া যাইবার সম্ভব, তাহা সকলেরই জ্ঞাত থাকা প্রয়োজন। ইহা হহতে বে গ্যাষ্ট্রিক রুস নিঃসৃত হইয়া থাকে, তাহা উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুণ্ড হইতেই হয় এবং তাহা তেজশালী অম্লবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত শুদ্ধ চক্ষ-চক্ষে দোথতেও পাওয়া যায় না। এই সকল বিষয় সম্যক জ্ঞাত থাকিলে বোধ হয়, কাহাকেও আর বালিয়া দিতে হইবে না যে, আহারের পর অন্ততঃ ২০।৩০ মিনিট উপবেশন ও বিশ্রাম লাভ করা প্রয়োজন, নতুবা পাকশয় নিজ যাত্ৰিক কার্য্য আরম্ভ করবার উপযুক্ত অবসর গ্রাপ্ত হয় না। কোন একটি বিষয় ধীরভাবে চিন্তা করিবার সময়, বাদ তোমার মাগুফ হইয়া না থাকিবা, অনবরত চাকলা অমুভব করতে থাকে, তাহা হইলে যেমন সেই চিন্তার কোনরূপ স্মৃতিমাংসা করা কঠিন হইয়া পড়ে, সেইরূপ পাকশয়ও কার্য্য আরম্ভ করিবার সময়,

যদি উপযুক্ত শৈথল্য ও ধীরতা প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে ক্ষুভাবে চলিতে পারে না জানিবে। বিশেষতঃ বাহাদের জ্বংপিও দুর্বল অথবা উহার কোন প্রকার বাহ্যিক পীড়া বর্তমান থাকে, তাহাদের পক্ষে আহারের পর বিশ্রাম অতি আবশ্যিক। কারণ খাদ্যদ্রব্য ও বায়ু দ্বারা, যখন পাকায় ক্ষীণ হইয়া উঠে, তখন উহা জ্বংপিওর উপর চাপিয়া পড়ে। (পাকায়িক এই ক্ষীণপ্রযুক্ত জ্বংপিও যে কি ভাবে চাপগ্রস্ত হইয়া পড়ে তাহা পর পৃষ্ঠায় প্রতিকৃতি দেখিলেই সচজে বুঝিতে পারা যাইবে)।

পূর্ণ আহারের পর, যদি কোন কারণে জীর্ণক্রিয়া বাধা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ভক্ষিত পদার্থ অল্প মন্যে পরিচালিত হওয়ার পক্ষে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই জ্বংপিও গোলযোগযুক্ত হইয়া পড়ে, এবং জ্বংম্পন্দন পরিলক্ষিত হয়। উহার উপর আবাব যদি আকস্মিক অথবা আহারের পক্ষেই কোন অতিরিক্ত শ্রম হেতু জ্বংম্পন্দন আঘাত পরিলক্ষিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহা আরও সম-

ধিক বিপদজনকভাবে গোলযোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। উহারই পরিণাম স্বরূপ দেখা গিয়াছে যে, কেহ কেহ পূর্ণ আহারের অব্যবহিত পরেই, বাস্তবিক প্রযুক্ত রোগগাড়ী পরিবার জন্ত, অথবা অল্প কোন বিশেষ কার্যসাধন জন্ত, চেষ্টা করিতে গিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই সকল বিষয় অবগত থাকি সত্বেও, আমরা প্রতিনিয়তই দেখিয়া থাকি যে, কতলোক আহারের পরই—এমন কি নাকে মুখে গুঁজিয়াই—বিশ্রাম না করিয়াই

দেখাইয়া থাকেন। জীবনযাত্রা ও সংসার পরিপোষণ জন্য, অনেক সময় এসব করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু সদাই মনে রাখা দরকার যে, সময়ে সকলই পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু হৃৎযন্ত্রের কার্যা যদি কোন প্রকারে স্থগিত অথবা বিকল হইয়া যায়, তাহা হইলে সহস্র চেষ্টাতেও উদ্ধার সচল করা যাইতে পারে না !! সুতরাং যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া উহার কার্যো বাধা না দিয়া, সহায়তা করাই যুক্তিসঙ্গত। পাকাশয়ের জ্বর ঐর্ষ্যাশালী বন্ধেরও যে, একটা দৈর্ঘ্যের সীমা আছে, তাহা তাঁহারা মানিতে চাহেন না। সুতরাং অনতিবিলম্বে এমন এক সময় আসিয়া উপস্থিত হয় যে, এই পাকাশয়ই—শাস্ত্র, শিষ্টে অর্থও যেমন অতিরিক্ত তাক্‌নিরুক্ত হইলে, উত্‌্যাক্‌কারীকে পদাঘাত না করিয়া থাকিতে পারে না—সহ্যাতিরিক্ত বিরক্ত হওয়ার পর বাধ্য হইয়া, উত্‌্যাক্‌কারীকে তাহার অবিমুখ্যকারী-তার ফলভোগ করাইতে থাকে। ইহার ফলে তিনি বেদনা, পেটফাঁপা, অথবা অসুস্থতাব অসুভব করিয়া, পাকাশয়কে পুনর্বার ঠিক পথে আনিবার জন্য চিকিৎসকের সাহায্য লইয়া থাকেন এবং এই উপায়েই ঔষধ দ্বারা তাহার বিকৃতভাবের প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু মনেও একবার ভাবেন না যে, অস্ত্রের সাহায্য না লইয়াও তিনি নিজেই উহার প্রতিকারে সমর্থ হইতে পারেন। সকল বিষয়েই দেখা যায় যে, বাহার বাহা প্রাপ্য যদি, তাহা দেওয়া যায়, তাহা হইলে আর বিসম্মদের কোনই কারণ থাকে না। যদি পাকাশয়ের সহ-বিবাহ বিসম্মাদ দূর করিতে হয়—তাহা হইলে, সর্বাগ্রে তাহার

সকলেরই জানিয়া রাখা কর্তব্য। রোগের প্রতিবিধান করা যে তাহার আরোগ্য সাধন অপেক্ষা প্রের, তাহা সকলে মনে রাখিতে পারেন না, কাজেই রোগ আরোগ্য করিবার জন্যই লোক অধিক ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এই প্রকৃতির মানবদিগের মনে রাখা কর্তব্য যে, বতবারই রোগ আরোগ্য করাইবে শুদ্ধ-বার, যে বস্ত্রই আক্রান্ত হউক কেন না, একটু করিয়া দ্রুত তাহাতে থাকিয়াই বার। এইরূপে একটি বস্ত্র (পাকশয়ই ধরা-বাউক) বারেরবারে আক্রান্ত ও আরোগ্য হইতে থাকিলেও, ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে যে, রোগ তখন চিরস্থায়ী ভাবেই থাকিয়া বার। প্রতিকারার্থ ঔষধ ব্যবহারে মাত্র সাময়িক উপশম বোধ হইয়া থাকে; একেবারে আরোগ্য হইয়া বার না। এই দৃষ্ট সম্পূর্ণ অবিচলিত সত্য হইলেও, লোকচক্ষে বিশেষ কালিমাময় বলিয়া গণ্য হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু সচরাচর যে আমরা ইহা সাময়িক ভাবে দেখিতে পাই না, তাহার প্রধান কারণই হইতেছে যে, আক-কালকার বৈজ্ঞানিক যুগে নব নব আবিষ্কৃত ঔষধে বিশ্বাসের ফলোন্নয়ন হইয়া থাকে। তবে রোগের উদ্ভব কারণ ও উদ্ভব কারণ বিনষ্ট না হইলে, শুদ্ধ ঔষধ ব্যবহারে প্রকৃত স্থায়ী কল-

প্রাণির আশা করিলে নিশ্চয়ই প্রভাবিত হইতে হইবে।

পাকশয়ের রাসায়নিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত অর্থাৎ প্যাট্রিক রসের সম্বন্ধে বস্তব্য বর্ণনা করিবার পূর্বে, এই মেক্যানিকাল অর্থাৎ বাসপেশীর কাঁচাটির পোলযোগ সম্বন্ধে আরও ২১১ কথা বলা

প্রয়োজন মনে করি : মহনীর পদার্থ না
 পাইলে, অগ্নি বেক্রপ তেজহীন হইয়া পরি কতবার আহার করা
 শেষে, নির্ক্ষাণ প্রাপ্ত হয়. সেইরূপ আমরা প্রয়োজন
 যদি পাকাশয়ে আহাৰ্য্য বস্তু প্রদান না
 করি, তাহা হইলে তরিহিত পাচকারিও ক্রমশঃ তেজশূন্য হইয়া,
 এমন কি আমাদিগের জীবনদীপ পর্য্যন্ত নির্ক্ষাণ করিয়া দিতে
 পারে। আমাদের জীবন ধারণের অল্প আহার যে একান্ত
 প্রয়োজনীয় তাহা অবশ্য সকলেই জানেন, কিন্তু কত বার
 আহার করা প্রয়োজন এবং কি পরিমাণ অতরল ও তরল
 পদার্থ ভোজন করা প্রয়োজন তাহাও অবগত হওয়া

কর্তব্য। সুস্থ শরীরেও পাকাশয়ের পেশীর কার্য্য অনাবশ্য-
 কীরভাবে বারম্বারে উত্যক্ত হইলে বিকৃত হইবার সম্ভব।
 অনবধান প্রযুক্ত অনেকেই বহুবার, না হয় বহু পরি-
 মাণে, অথবা বহু সময় অন্তর, আহার করিয়া থাকেন দেখা যায় ;
 আমরা যখন সাদাসিধে সহজ পাচ্য দ্রব্য আহার করি, তখন
 দুই ঘণ্টা হইতে চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত সময় জীর্ণ কার্য্যে আবশ্যক
 হইয়া থাকে। তরু দ্রব্য ভোজন করিলে আরও অধিক
 সময় জীর্ণক্রিয়ার অভিবাহিত হয় জানিবে। একবার আহা-
 রের পর, উহা জীর্ণ ; করিবার অল্প পাকাশরকে নির্দিষ্ট বিশ্রা-
 মের অল্প সময় ও সুযোগ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য, নতুবা উহা
 পরবর্তী আহারীয় দ্রব্যাদিকে জীর্ণ করিবার শক্তি হারাইয়া
 বসিবে। পাকাশর যখনই শূন্য থাকিতে পার তখনই মাত্র
 যে উহা বিশ্রাম ভোগ করিয়া থাকে তাহা সকলে জানা থাকা

আবশ্যক। আহার দ্বারা শ্রীতি, সম্ভব বল-
সকার, দেহরক্ষা, শরীরশক্তি প্রভৃতির
কার্য সাধিত হইয়া থাকে, অতএব দিবসে
আহারের সময় নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন।

ও রাত্রিতে উপযুক্ত আহার করা প্রয়োজন। ইউরোপীয়েরা
এবং তৎপ্রথাপ্রণোদিত বিলাতপ্রভাগত আমানিগের বাকালী
সাংস্বেদরা, সর্ব সময়ে দিব্যরাত্রিতে ৫.৩ বার আহার করিয়া
থাকেন। আনানের পক্ষে দুইবার আহারই (ও দুইবার
কিঞ্চিৎ জলযোগ—টহাও সাধারণের জ্ঞাত নহে) যথেষ্ট জানিবে ;
কিন্তু এইরূপ আহার ও জলযোগের একটি নির্দিষ্ট সময়
স্থির থাকা প্রয়োজন, যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিয়া সেই সম-
য়ের মধ্যেই আহার করা প্রয়োজন, নতুবা ভোজ্য পদার্থাদি
প্রস্তুত হইয়া অধিকক্ষণ যাবৎ রক্ষিত হইলে ঠাণ্ডা হওয়ার, অথবা
গরম অবস্থার রাখার জন্ত, কঠিন ও শুষ্ক হওয়ার, সহজে
পরিপাক হইতে পারে না। অতীক্ষ অন্ন ভোজন করিলে
বলনাশ হইয়া থাকে এবং শীতল ও শুষ্ক অন্ন সহজে জীর্ণ
হয় না। যদি প্রাতে জলযোগ করা প্রয়োজন বলিয়া বোধ
হয়, তাহা হইলে উহার সময় এরূপ ভাবে নির্দিষ্ট হওয়া
প্রয়োজন যে, স্নানাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে মধ্যাহ্নিক আহারের
জন্ত প্রস্তুত হইবার পক্ষে, পাকশয়কে কিঞ্চিৎ সময় দিতে
পারা যায়। একারণ এই জলযোগ কার্য প্রাতে ৮.১২টার
মধ্যে হইলেই ভাল হয় এবং তাহাতে মধ্যাহ্নিক আহারের
জন্ত প্রস্তুত হইবারও বেশ সময় থাকে। সাত্বিক ভাবাপন্ন
হিন্দু স্নানাহ্নিক সমাপন না করিয়া, অপনার ইষ্ট দেবের আরা-
ধনা না করিয়া, কখনই জলপান করেন না। সুতরাং তাঁহাদের

পক্ষে প্রাতঃকালীন আহারের কোন প্রয়ো-

জনীয়তা বোধ হয় না । কিন্তু হৃদয় ও অবি- প্রাতঃভোজন

রাম জীবনগতি, বৈবরিক উদ্যম উদ্ভেজনা

এবং গোলমাল, বশঃ, অৰ্ধ ও ক্ষমতাপ্রাপ্তির জন্ত আজকাল

আমরা বেরূপ অতৃপ্ত আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, জীবন

সংঘর্ষে প্রতিনিয়তই অগ্রসর হইতে থাকি, তাহাতে অনেক

সময় বাধ্য হইয়া, নির্দিষ্ট মধ্যাহ্নিক আহার সময়ে করিতে

পারি না, সুতরাং স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্ত তৎপূর্বে বাহা

হয় কিছু আহার করা প্রয়োজন । বাহার ১০টার মধ্যেই আহা-

রাদি সমাধা করিয়া অফিসাদি যাইয়া থাকেন, নিতান্ত ক্ষুধার

আগ্রহ না হইলে, ভাহাদিগের পক্ষে আহারের পূর্বে জল-

যোগের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না । (প্রাতর্ভোজন বা

মধ্যাহ্ন ভোজনাদি সময়, কি কি আহার করা প্রয়োজন তাহা

অন্ত অধ্যায়ে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা না থাকায়, এখানে তাহার

অবতারণা করা গেল না ।)

প্রাতর্ভোজনের পূর্বে শয্যা পরি-

ভ্রমণ না করিয়াই, কিছু সেবন করা

শয্যা ভাগের পূর্বে

অর্ধাৎ এক বাটি চা সেবন করা প্রয়ো-

চা খাওয়া

জন কিনা, অথবা শয্যায় থাকি কালী-

নই, প্রাতরাশ সমাধা করা কর্তব্য কিনা, তাহা নিরূপণ করা

প্রয়োজন বলিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ মনে করেন । আমরা

যখন আহারাদি ও তাহার জীর্ণাজীর্ণ ইত্যাদি সম্বন্ধেই পুস্তক

লিখিতে বসিয়াছি, তখন উহার অল্পকূলে বা প্রতিকূলে

কত বর্তামত আছে, সমুদয়ই বর্ণনা করিতে বাধ্য । পরে

আমাদের মতে উহা অসুস্থোদনীয় কিনা তাহাই বলিব।
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে পাকযন্ত্রাদি দ্বারা জীর্ণক্রিয়া
উত্তমরূপে সম্পাদন করাইতে হইলে, শরীর বেশ সবল থাকে
প্রয়োজন। এই সবলতাব ব্যক্তি বিশেষের শরীর প্রকৃতির
উপর নির্ভর করে জানিবে। মোট কথায় ইহা সত্য মনে
রাখিতে হইবে, যে দুর্বল অথবা ক্লান্ত শরীরে ভোজনাদি করা
কর্তব্য নহে। এমন অনেক সময় দেখা যায় যে, কি পুরুষ
কি জীলোক, দুর্বলতা বশতঃ শয্যাভ্যাগের পর, শৌচাদি সমা-
পন ও বস্ত্রাদি পরিবর্তন কার্য্য সারিয়া, প্রাতর্ভোজনের সময়
অতিশয় শ্রান্তি অনুভব করিয়া থাকেন ; হয়ত বা পূর্বরাত্রি
অনাহারে কাটাইতে বাধ্য হইয়াছেন, এমন হলে আরও অধিক
দুর্বলতা ও ক্লান্তি অনুভব করিতেছেন ! এখন জল-
যোগে প্রবৃত্ত হইলে ভাল করিয়া খাইতে ও পাবেন না, অথবা
যদি বা ভোজন করেন, তাহা হইলে সর্ব শরীরের ক্ষয়, সেই
শরীরেরই অংশ বিশেষ পাকায়ন্ত্রটি অতি শ্রান্ত থাকায়, দ্রব্য
পরিপাক করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হয় ; সুতরাং তাহার কলে বেদনা
বমন অথবা উদরে বায়ুজমা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায় ।

সুস্থ ও স্বচ্ছন্দতাহীন শরীরবিশিষ্ট মরনারীর পক্ষে প্রাতঃ
ভোজনের পূর্বে, শয্যা ত্যাগ না করিয়াই,
এক পেয়ালা চা সেবন করা কর্তব্য ; আবার অনুগ্রহ ৫
এই চা, যেমন তেমন হইলে হইবে না !
পরম জলে চায়ের পাতা ২মিনিটের অধিক না রাখিয়া এবং
তাহাতে সামান্য চিনি ও পর্য্যাপ্ত পুষ্টিমাণ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া,
সেই চা সেবন করিতে দিবে। ইহার সহ সামান্য দুই এক খানি

বিচ্ছুট ও মাখন হইলেও চলিতে পারে। পাক্ত্য লেখকগণ বলেন যে, ইহা করিলে অন্ন শোচাদি সমাপন ও বম্বাদি পরিবর্তন পূৰ্ব্বক, প্রাতঃভোজনের সময় দুৰ্ব্বলতা বা শ্রান্তি অনুভূত হইবে না ; সুতরাং দৃষ্টান্তে ভোজন ও তাহা সহজেই

জীর্ণ করিতে সক্ষম হইবে। অনেক চা পরিবর্তে অল্প সময় চা এর পরিবর্তে, অল্প কোন প্রকার ব্যবস্থা

ব্যবস্থা করাও প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে ; সেই স্থলে উহার পরিবর্তে এক গ্রাস দুগ্ধ ও গরম জল, সমান অর্ধাংশে মিশ্রিত করিয়া, অথবা শুষ্ক গরম জল এক পেয়ালা, কিংবা কোন প্রকার নিকর (Spring) নিঃসৃত জল (সীতাকুণ্ড জল অথবা ঘাটশিলার জলই প্রশস্ত) পান করিলেও চলিতে পারে।

এক পেয়ালা মেলিন্স ফুড অথবা বেঞ্জার্স ফুড সেবন করিতে দিলেও ভাল হয়। এই সকল বিষয় পারিবারিক চিকিৎসক দ্বারা নিরূপণ করিয়া লওয়া প্রয়োজন। এখানে আমাদের এসব উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ভোজনের পূর্বে, যখন-কার নির্দিষ্ট ভোজনকার্য্য হউক না কেন, শরীর যেন ক্ষুধিগুস্ত ও বলবান থাকে। শরীরগতিকে যদি উহার কোন বিপরীত ভাব ধুকিতে পার্ তবে, তাহার প্রতিকার কল্পে যে যে বিধান ব্যবস্থা করা হইল, তাহার যেটি পছন্দমত হয় তাহাই করিতে পার। প্রত্যহ প্রাতেই যে ইহা করিতে

হইবে তাহাও মনে করিওনা। যদি অন্যথাকে খাইও না

নিত্যান্ত আবশ্যক বোধ না কর, তাহা

হইলে প্রাতঃভোজনের পূর্বে কোন প্রকার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ এমনও হইতে পারে যে, প্রাতে

তুমি কোন প্রকার দুর্বলতা বোধই করিলেনা, অথবা ক্রমশঃ শরীরে বলাধান সহ যখন দেখিবে যে, মোটেই তুমি ক্রমশঃ বোধ করিতেছ না তখন উহা একেবারে পরিবর্তন করিবে। অবস্থা বুঝিয়া যাহা উত্তম ব্যবস্থা হইবে তাহাই করিবে, অথবা কোন নিয়মেরই বশীভূত হওয়া উচিত নহে। হিন্দুমাঝেই প্রাতঃকালে শৌচাদি ক্রিয়া সমাপন এবং বস্ত্রাদি পরিবর্তন না করিয়া, (স্নানাত্মিক ছাড়িয়া দিলেও) কোন প্রকার আহাৰাদি করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না, সুতরাং

তাহাদিগের পক্ষে উপরি উক্ত ব্যবস্থা হিন্দু আহার নিরতিশয় বিসদৃশ বোধ হইবে সন্দেহ নাই। হিন্দুর দিনচর্যা ও রাত্রিচর্যা, সমুদয়ই ধর্ম সহ সংশ্লিষ্ট। ধর্মের সহিত উহা যে কেন বশীভূত সম্বন্ধীভূত তাহা আমরা পরে বুঝাইয়া দিব। এখানে কেবলমাত্র এই বলিতেছি যে, পাশ্চাত্য হিসাবে আমাদের আহার বিহারাদি করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, কিন্তু আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সকলেই তৎ প্রথা প্রণোদিত ভাবে চালিত হইয়াই যত উৎকট ব্যাধির সৃজন করিতেছেন। সহজ শরীরে শয্যাতেই ভোজন ক্রিয়া, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনের পূর্বেই, করা যে অকর্তব্য তাহা পাশ্চাত্য লেখকগণও বলিয়াছেন দেখিতে পাইবেন।

যাহাদিগের হৃৎপিণ্ড দুর্বল, অথবা কোন প্রকার পীড়াগ্রস্থ, কিংবা যাহারা স্বভাবতঃই দুর্বল, কোন প্রকার রোগাক্রান্তির পর তাহাদিগের কর্তব্য যে, নিদ্রা হইতে উঠিয়াই হাত মুখ ধোত করতঃ, বস্ত্রাদি পরিবর্তনের পর, শয্যা ত্যাগকালীনই কিঞ্চিৎ জসযোগ করা; নহুবা অতিরিক্ত দুর্বলতা প্রযুক্ত ক্লান্তি

জন্মাইয়া, বিলম্বে জলযোগ কার্য সমা-
ধার কলে, সঘর ক্ষুধালোপ এবং জীর্ণ-
কার্য ব্যাঘাতযুক্ত হইতে পারে। শয্যা

পরিভ্রাণের পূর্বেই জলযোগ করিতে বাধ্য হইলে, ইহা মনে
রাখিতেই হইবে যে, ঐ আহারের পরই আরও কিছু-
ক্ষণ সেই শয্যাতেই থাকিয়া বিশ্রাম করা প্রয়োজন। কোন
প্রকার কার্য করিবার সামর্থ্য থাকিলে, ইহার ঠিক অব্যবহিত
পরেই করা কর্তব্য নহে।

দিবস অথবা রাত্রি, যে কোন সম-
য়েই হউক না কেন, অতিশয় শ্রান্তি বা
শ্রান্তি অনুভব করিলে, তাহা দূরীকরণ

না করিয়া কখনই আহারে প্রমত্ত হইবেনা। অন্ততঃ পক্ষে
১০।১৫ মিনিট অপেক্ষা করিয়া, হস্তপদ ও মুখ প্রক্ষা-
লন করিবে, পরে আবশ্যক বোধ করিলে একটু শীতল জল
পানান্তে তবে আহারে বসিবে। ইহার আর একটি উপকা-
রীতা এই যে, শরীরের রক্ত মধ্যে সন্মপূর্বেই কিয়ৎ পরি-
মাণে তরল পদার্থ গৃহীত হওয়ার, আহার কালে বিশেষ তৃষ্ণা
পাইবে না ; সুতরাং ভক্ষিত পদার্থ সহ তরল পদার্থ অধিক পরি-
মাণে মিশ্রিত হইতে না পারায়, জীর্ণক্রিয়ার কোন প্রকার
ব্যাঘাত জন্মিতে পারিবে না। বাহাদিগের জীর্ণশক্তি স্বল্প
তাহাদিগের পক্ষে অন্ততঃ এই নিয়মাবলী হওয়া বিশেষ
আবশ্যক ।

শাস্তিকভাবে পন্ন হিন্দু, ব্রাহ্মণাদি না করিয়া আহারাদি দূরের

কথা জনযোগ করাও অকর্তব্য মনে করেন। আমরা পূর্বেই একস্থানে বলিয়াছি যে, হিন্দুর আচার বিচার, আহার বিহার, সমুদয়ই ধর্মের সহিত সূত্রাকারে গ্রথিত। উহা যে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহা আমরা এখন দেখাইব। আজকাল যেমন কাহাকেও স্বাস্থ্যতত্ত্বের সম্বন্ধে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি “সব জাভা” ভাব দেখাইয়া উহা তাজিলের সহ উড়াইয়া দেন, এবং তাহা প্রতিপালন করিতে চাহেন না, সেইরূপ পাছে সে কালের লোকেরাও স্বাস্থ্য-তত্ত্ব সমুদয় পালনে অবহেলা করে, তাই ধর্মপ্রাণ হিন্দুকে বাধ্য করিবার জন্য, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ কর্তৃক উহা ধর্মাচরণের মধ্যে গ্রথিত হইয়া নৈমিত্তিক করণীয় বলিয়া ধার্য হইয়াছিল। এতকাল উহা অল্পভাবে প্রতিপালিত হইত বলিয়াই ৫০ বৎসর পূর্বেও আমাদের দেশে স্বাস্থ্য-বান ও বলবান লোকের অভাব ছিল না! আজকাল আমরা ধর্মে যতই শৈথিল্য দেখাইতেছি এবং হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক অবশ্য প্রতিপাল্য কার্যানুষ্ঠানে বিরত হইতেছি, ততই স্বাস্থ্য হারাইয়া, তৎসহ সুখসম্পদ সকলই নষ্ট করিতে বলিয়াছি! এই ধর্ম শিথিলতাই যে আমাদের একমাত্র অধঃপতন কারণ তাহা আমরা বলি না, তবে উহা যে একটি প্রধানতম কারণ তাহার সন্দেহ নাই! হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্মানুষ্ঠান স্বাস্থ্যের সহিত কত-
স্বাস্থ্যকর ক্রিয়া
 দূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত তাহা আমরা এই-
 বার দেখাইব। আহাৰাদি বর্ণনাকালে অল্প বিষয় বিচারের

কথার অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া উহাতে বিরত থাকিয়া এই স্থান হইতেই আমাদের সূত্র ধরা যাউক । স্নানাত্মিক না করিয়া ভোজন অকর্তব্য হিন্দু কেন বলেন দেখা যাউক :— স্নান দ্বারা অগ্নির দীপ্তি, তেজোরূদ্ধি, আয়ু প্রতিপালন, বলোৎপত্তি এবং কক্ষুরোগ, মল, শ্রান্তি, শ্বেদ, তন্দ্রা, তৃষ্ণা ও দাহ নিবারিত হইয়া থাকে । শীতল জলাদি দ্বারা শরীরের বাহ্যভাগ সিক্ত হইলে, শরীরজাত উত্তাপ প্রতিহত হইয়া, দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত করে । এই কারণেই স্নানের অব্যবহিত

পরেই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে । সুস্থ ও

বলবান ব্যক্তির পক্ষে নিত্যস্নান বিধেয় স্নান ও ক্ষুধা

জানিবে । স্নানের অব্যবহিত পরেই

যে ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয় অনেকেই অনুভব করিয়াছেন—স্নানের কিঞ্চিৎ পূর্বেও উদর ভারযুক্ত থাকিলে তুমি স্নানের পরই দেখিবে যে তোমার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে । তবেই দেখ উহার সহ স্বাস্থ্যের কত অধিক সম্বন্ধ !! এইবার দেখা যাউক আহারের পূর্বে আহারের আবশ্যকতা আছে কি না ? সকল চিকিৎসা শাস্ত্রেই কথিত আছে যে, আহার কালে শাস্তিচিন্তে সুষোপবিষ্ট হইয়া উপবেশন করা প্রয়োজন । নিজ ইষ্টদেব ও ভগবানকে ডাকিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করায়,

চিন্তে ধৈর্য্য ও শাস্তি আসিয়া থাকে কিনা তাহাও কি আবার

জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ? সুতরাং সাত্বিক হিন্দুর জন্ত ঋষিগণ

যে ব্যবস্থা প্রণোদন করিয়া গিয়াছেন তাহা সর্বথা পালনীয় জানিবে ।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে আশা-
দিগের দুটি প্রধান আহারই যথেষ্ট, মধ্যাহ্ন ভোজন
একটি দিবসে ও অল্পটি রাত্রিকালে।

অবস্থাবিশেষে যে কিঞ্চিৎ ২ জলযোগের ব্যবস্থাও হওয়া কর্তব্য
তাহা পূর্বেও বলিয়াছি—তবে উহা দরিদ্রের জ্ঞাত নহে। আব-
শ্যক স্থলে স্বল্পব্যয়ে, অথবা দৃষ্টান্তঃ কোন ব্যয় না করিয়াও যে,
সাধারণে তাহার সুব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা আমরা উপযুক্ত
স্থলে পরে দেখাইয়া দিব। এখন শুদ্ধ ভোজনের সময় ওলিই
দেখাইয়া যাইব। মধ্যাহ্ন ভোজন, বেলা এক প্রহরের মধ্যে
ও দুই প্রহর অতীত হইলে পর, করা কর্তব্য নহে অর্থাৎ প্রত্যহ
নিয়মিত ভাবে ১০।১১ টার মধ্যেই উহা সমাধা করা প্রয়োজন।

এক প্রহরের মধ্যে আহারে রসের উৎপত্তি ও দুই প্রহরের পরে
করিলে বলক্ষয় হয় জানিবে। আহার সম্বন্ধে সাধারণ একটি নিয়ম
মানিয়া চলিলেও যথেষ্ট হয় যথা :—সুস্থাবস্থায় যখনই ক্ষুধার
উদয় হইবে, তখনই আহার কাল জানিয়া তাহার ব্যবস্থা করা
প্রয়োজন। অনুপযুক্ত সময়ে এবং স্বল্প বা অধিক মাত্রায় ভোজন
করা অকর্তব্য। ক্ষুধা না হইতেই আহার করিলে, দেহের অসামর্থ্য

শিরোবেদনা, অজীর্ণ, পেটবেদনা প্রভৃতি

পীড়া উপস্থিত হইতে পারে। সময় স্বল্প বা অধিক ভোজন
অতীত হইয়া যাওয়ার পর, ভোজনে বাধু-

দ্বারা পাচকান্নি উপহত হওয়াতে ভুক্তদ্রব্য অতিকষ্টে জীর্ণ হয়
এবং পুনর্বার ভোজনে প্ররুতি হয় না। ন্যূন পরিমাণে আহারে
গ্নানি ও বলক্ষয় হয় এবং অতিমাত্রায় ভোজনে আলস্য, শরীর

ভার ও উদরে গড়্, গড়্, শব্দ ও অবসন্নতা উপস্থিত হয়। অত-
এব উক্ত দোষ সমস্ত রহিত, সুসংকৃত ও উপযুক্ত গুণ সম্পন্ন
আহার করা প্রয়োজন।

অনেকেই দিবসে ও রাত্রিতে দুই বার মাত্র আহার করিয়া
 থাকেন এবং তাহাতে কোন প্রকারই
 ক্লেশ বা শ্রানি অনুভব করেন না দেখা বৈকালিক খাবার
 পিয়াছে ; কিন্তু যত বয়স অধিক হইতে
 থাকিবে এবং বার্দ্ধক্য আসিয়া পড়িবে, অথবা কোন প্রকার
 পীড়া হইতে আরোগ্যের পর, তাঁহারাও উহার অতিরিক্ত ২।১
 বার আহারের অভাবমুচক ক্লেশ ক্রমশঃ বোধ করিয়া থাকেন।
 পাকাশয়কে অথবা অধিকক্ষণ যাবৎ নিষ্ক্রিয় ভাবে রাখিতে নাই।
 এই জলযোগ কার্য—পাঠাধ্যায়ী ছাত্রদের ক্ষুদ্র বেলা ৪।৫ টার
 মধ্যে এবং অফিসাদি কার্যরত বান্ধুদের ক্ষুদ্র ৫।৬ টার মধ্যে হওয়া
 কর্তব্য। এ সময় কিরূপ আহারাদি করা প্রয়োজন তাহাও পরে
 বর্ণনা করিব। এখানে পুনরায় আর একটা কথা উল্লেখ করা
 আবশ্যক মনে করি। আজকাল চা খাওয়া
 আবালবৃদ্ধবনিতার সখের সামগ্রী হইয়া বৈকালিক অথবা
 পড়িয়াছে ! অনেকে প্রাতে ও বৈকালে চা সাধ্য চা সেবন
 সেবনে এতই অত্যন্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে,
 না হইলে আর চলেনা ! উহাও অজ্ঞাত মেশার দ্বার নির্দিষ্ট
 সময়ে সেবিত না হইলে, অতি দুর্বলতা, হাত পা আড়ামোড়া
 করা, হাইতোলা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিয়া উহার অভাব
 জ্ঞাপন করিয়া থাকে। বাঁহাদের আদেশে আমরা চা খাইতে
 শিখিয়াছি, তাঁহারা ই বলিয়া থাকেন যে উহা সেবন করিতে

হইলে অধিক মাত্রার চুই এবং স্বল্পমাত্রার চিনি দিয়া অল্প (Weak) চা, অর্থাৎ—২ মিনিটের অধিক ঐ পত্র গরম জলে সিদ্ধ না করিয়া, সেবন করিবে। কিন্তু তাহার স্থলে আমরা করিয়া থাকি কি? ঠিক উহার বিপরীত, অতি উগ্র চা (হয়ত বা চুইবার সিদ্ধ করা) চুইয়ের অংশ নাম মাত্র দিয়া অথবা অনেক সময় উহা না দিয়াও, অত্যধিক চিনির সহ সেবন করাই আমরা বিলাসপ্রিয়তা মনে করিয়া থাকি! এই প্রকার চা সেবন করায় যে, কত অপকার সাধিত হয় তাহা সকলে জানেন না—ইহা পাকাশয় এবং শারবিক বিধানের বিশেষ অনিষ্টকারী জানিবে। অতি-

রিক্ত চিনি অথবা মিষ্টি সংযোগে চা প্রস্তুত হইলে, উহা পরিপাকের পক্ষে বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। (চা সেবনের অপকারীতা আমরা অল্প স্থলে দেখাইব ইচ্ছা আছে এখানে কেবল অবতারণা মাত্র করা গেল।) অনেকে অল্প কোন প্রকার জলযোগ না করিয়া, শুধুই চা সেবন করিয়া থাকেন—তা শরীরের অল্প আবশ্যক উহা হউক বা না হউক! ইহা ফ্যাসনের Fashion দোহাই দিয়া অথবা বহুদৈনিক খাতিরে কিংবা নেশার

বশে অত্যাশ করা কর্তব্য নহে। চা এর পরিবর্তে অনেকে কাকি

পান করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে কোন্টি ভাল কোন্টি মন্দ তাহা ব্যক্তি বিশেষের শরীরপ্রকৃ-

তির উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই চা ও কাকি

এক কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, চা

পাকা কাকিসেবনে শারবিক বিধান অধিক গোলযোগবৃত্ত

হইয়া থাকে। কাফি আদি সেবন করিতে হয় তবে, অর্ধেক পরিমাণে গরম দুগ্ধ ও অর্ধেক পরিমাণ কাফি এই অনুপাতে সেবন করা প্রয়োজন।

আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, ঠিক সন্ধ্যার সময় আহার, মৈথুন, নিদ্রা, অধ্যয়ন ও পথ পর্যাটন এই পাঁচটি কর্তব্য নিষিদ্ধ। নৈশ ভোজন

সেই সময়ে শুদ্ধাস্তঃকরণে ভক্তিপরায়ণ চিন্তে ভগবৎ চিন্তায় নিযুক্ত থাকা কর্তব্য। রাত্রি ১ প্রহর অতীত হইবার অব্যবহিত পরেই আহার করা প্রয়োজন। ৮।৯

টার পরে আহার করা কর্তব্য নহে, কারণ ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইতে ৪।৫ ঘণ্টা সময় লাগিয়া থাকে। খালি পেটে নিদ্রা যাওয়াও যেমন উচিত নহে, সেইরূপ আহারের ঠিক পরেও

আবার নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে। আহারের পরই নিদ্রা বাইলে খাণ্ডবস্ত্র সহজে হজম হয় না, এ কারণ আহারের পর এবং নিদ্রা যাওয়ার মধ্যে, একরূপ সময়ের ব্যবধান থাকা প্রয়োজন যাহাতে নিদ্রার জন্ত পরিপাক ক্রিয়ায় কোন ব্যাঘাত না ঘটে। দেহ ও মন সুস্থ রাখি- অনিদ্রা

বার জন্ত প্রকৃতি রাত্রিতেই নিদ্রার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। নিদ্রা আমাদের প্রকৃতই আরাধনারিনী! যদি রাত্রিতে সুস্থভাবে ইহা ভোগ করিতে হয়, তাহা, হইলে শরীর যাহাতে নিদ্রা বাইবার পূর্বেই বেশ পঠরপুটে হইতে পারে তাহা করা প্রয়োজন এবং তাহা করিতে হইলেই এমন "সময়" নৈশ আহার করা কর্তব্য যে নিদ্রার সময় উহা জী-

হইতে ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হইয়া, স্নানিয়ার ঠাণ্ডে গোলযোগ ঘটাইতে না পারে। এই জন্ত ৯৯ টার মধ্যে আহার সম্পন্ন করিয়া ১১টার মধ্যেই নিদ্রা যাওয়া কর্তব্য। বাল্যকালে আমরা পাঠ্য পুস্তকেও পাঠ করিয়াছি যে, রাত্রি ৯টার সময় নিদ্রা যাইবে ও ৫টার সময় গাত্ৰোত্থান করিবে। এখন কিন্তু কার্য্যানুরোধে প্রায় সকলকেই উহার বিরুদ্ধ আচরণ করিতে হয়, তাই আমরা রাত্রিতে নিদ্রার সময় ১১টাই সাব্যস্ত করিলাম। (রাত্রিতে ভোজনাদি কি প্রকারে হওয়া কর্তব্য তাহা পরে বিবৃত হইবে।)

বর্তমান অধ্যায় সমাপনের পূর্বেই

আমাদের আর একটি বিষয়ের আলো-

অতরল খাদ্য

চনা করা প্রয়োজন হইতেছে। কি

পরিমাণ

পরিমাণে অতরল (Solid) পদার্থ ও

তরল পদার্থ আমাদের ভোজন করা উচিত, এ অধ্যায়ে তাহা দেখাইয়া পরে কোন্ কোন্ দ্রব্য খাওয়া আবশ্যক তাহা দেখাইয়া দেওয়া যাইবে। আমরা পূর্বাপর বরাবর শ্রবণ করিয়া আসিতেছি যে কিঞ্চিৎ ক্ষুধা রাখিয়া ভোজন করা কর্তব্য। ইহা হইতে যেন কেহ মনে না করেন যে, ক্ষুধার নিবৃত্তি না করিয়াই আহার শেষ করিতে হইবে! শরীরের পক্ষে যে পরিমাণ তোমার আবশ্যক বলিয়া বোধ হইবে, যাহা তুমি সহজে পরিপাক করিতে পারিবে, তাহাই তুমি ভোজন করিবে; মোট কথা এইটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন, আহারের পর উহার গুরুত্ব হেতু অন্থব বোধ, পেট ফাঁপা ইত্যাদি অন্ততঃ করিতে না হয়। পাকায়িত্যন্তর চারি প্রকোষ্ঠে যদি বিভাগ করা যায় তাহা হইলে, উহার

ছই প্রকোষ্ঠ দ্রব্যাদি দ্বারা এবং এক প্রকোষ্ঠ জলীয় পদার্থ দ্বারা পরিপূরণ করা কর্তব্য। অল্প যে আর একটি প্রকোষ্ঠ শূন্য থাকিবে উহা বায়ুহীন বলিয়া অপূর্ণ রাখিতে হয়। এই পরিমাণে আহার করিলে, ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীর গহ্বর মধ্যে জীর্ণ জন্ত, যখন যখন প্রক্রিয়ায় পেশিত হইতে থাকে তখন আর স্থানাতাব ঘটিতে পারে না। সুতরাং সহজেই ঐ প্রক্রিয়া সাধিত হইতে পারায় জীর্ণ হইতে ব্যাঘাত পায় না। অযথা অধিক পরিমাণে আহার করিলে, উহা বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় অজীর্ণ জনিত নানা ক্লেশ উৎপাদন করিয়া থাকে। অতিরিক্ত মাত্রায় আহার বা পান করিতে থাকিলে, শরীরের চৰ্ম্ম শুকতর হইয়া যায়, -- স্বপ্ন (পর্যাপ্ত) আহারে গাত্র বর্ণ এবং চক্ষু উজ্জ্বলতর হয় জানিবে। অবশ্য প্রয়োজনমত পূর্ণ মাত্রাতেই খাইবে, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় কদাচ খাইবে না। স্বল্পাহার জনিত কখনও অজীর্ণতা উৎপন্ন হইতে শুনা যায় নাই, কিন্তু অতিরিক্ত ভোজন জন্ত যে উহা উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার প্রমাণ বোধ হয় সকলেই নিজে নিজে অনুভব করিয়াছেন। মাংসাদি অধিক মাত্রায় সেবন করিলেই যে, অপরিপাক হইবে তাহা যেন কেহ মনে না করেন; কুটি, আলু, ও অল্পাংশ টার্চি দ্রব্য অধিক মাত্রায় ভোজনেও উহা অনেক সময় দৃষ্ট হইতে পারে; কারণ অতিরিক্ত মাত্রায় উহা সেবন করিলে উদর মধ্যে সহজেই উহা গাঁজলাইয়া (Fermented) উঠে ও অজীর্ণতা উৎপাদন করিয়া থাকে।

যদি ভূমি সুস্থদেহী হও, তাহা হইলে তোমার তৃপ্তি হওয়া পর্যন্ত অনায়াসে উত্তম বলকারক খাদ্যাদি খাইতে পার, কিংবা

যদি অতিরিক্ত শ্রমজনক কার্যাদি ভ্রোমায় সম্পাদন করিতে হয়, তাহা হইলে ভুক্তদ্রব্যের পরিমাণ একটু অধিক করিয়া লইতে পার। স্বাস্থ্যকর স্থানে জলবায়ুর ওণে স্বভাবতঃ একটু অধিক ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে, সুতরাং অল্প সময়পক্ষে খাওয়ার যাত্রাও বেশী হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় যদি কোন-রূপ ব্যায়ামাদি করা অভ্যাস না থাকে, যেমন বেড়ান ইত্যাদি, তাহা হইলে উহা ভালরূপে জীর্ণ না হওয়ায়, যকৃত ও পাক-শয়ের রক্তাধিক্যতা উৎপাদন করে ও তাহা হইতেই নানা প্রকার অসুখ উৎপন্ন হইয়া পড়ে।

মানসিক পরিশ্রমও যদি অতিশয় করা বৈহিক ও মানসিক
অভ্যাস থাকে, তাহা হইলেও অধিক আহার
খাওয়া একটু সাধারণাপেক্ষা অধিক
ভোজন করা প্রয়োজন। যাহারা অজীর্ণজনিত ক্লেশ ভোগ
করিয়া থাকে, তাহাদের জীর্ণশক্তি অসুযোগী আহার্যের পরিমাণ
নির্দিষ্ট হওয়া কর্তব্য এবং ধীরে ধীরে ভোজন করা কর্তব্য।
ভোজন সময় তাহারা যেন বৈবয়িক অথবা অন্য কোন প্রকার
আলোচনায় মগ্ন থাকিয়া, যাত্রায় অধিক আহার না করেন।
যাত্রায় অধিক বা অল্প চুইই তাহাদের পক্ষে দোষাবহ।

যে দিবস স্কুলে বাইতে না হয় সেই

দিবস বালকবালিকাগণ একটু অধিক বালা বয়সের
আহার করিয়া থাকে, নতুবা প্রায়ই আহার

স্কুলে বাইবার ব্যগ্রতার তাহারা অল্প-

হার করিয়া থাকে; এই সময়ে তাহাদের আহারের উপর পিতা-
মাতার দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। এই শিশুবয়সে তাহাদের খাওয়া

বিশেষ পুষ্টিকর এবং উপযুক্ত পরিমাণে হওয়া-কর্তব্য, কারণ
পাঠাদি ও ব্যায়ামাদি জন্য যে টুকু পরিপোষণের প্রয়োজন,
তাহা বাতীতও অস্থি, পেশী ও মস্তিষ্ক পরিবর্দ্ধন জন্য আরও
পুষ্টিকর পদার্থ তাহাদের শরীরাত্মকত্রে প্রবেশ করান আবশ্যক ।

অতরল Solid পদার্থের পরিমাণ

নিরূপণ সহ, জলীয় পদার্থের পরিমাণ	জলীয় পদার্থের
স্থির করা বিশেষ প্রয়োজন জানিবে ।	পরিমাণ

জলীয় পদার্থের প্রকার ও পরিমাণ সহ,
 কখন কখন উহা সেবন করা প্রয়োজন, তাহাও অবগত থাক।
 কর্তব্য । সুস্থ শরীরে জলীয় পদার্থ সেবনের সম্বন্ধে যে একটা বাধা-
বাধি করা আবশ্যক তাহা মনে করি না , সুতরাং তুম্বার শাস্তি
না হওয়া পর্য্যন্ত, অথবা যখনই কেন হউক না, পরিমাণের বিচার
না করিয়াই, উহা পান করিয়া থাকি । এই জলীয় পদার্থ এত
সহজে আমাদের গলাধঃকরণ হইতে থাকে যে, সে সময়ে উহার
পরিমাণ বা পাকায় যে, কতটা স্থান অধিকার করিবে, তাহা
স্থিরীকৃত করিতে পারা যায় না । পূর্ব মাত্রায় আহারের পর, অধিক
পরিমাণে জলীয় পদার্থ, যাহাই কেন হউক না, পান করা উচিত
নহে । উহাতে পাকায় অথবা আয়তনে বড় হইয়া পড়ে এবং
তাহারই কলে, দুর্বল জংপিও চাপ প্রাপ্ত হওয়ায়, জংস্পন্দন
হইতে দেখা যায় । আবার এই বৃহদায়তন পাকায় তুচ্ছদ্রব্যও
ভালরূপে গুত ও মণ্ডিত করিতে সমর্থ হয় না । জলীয়
পদার্থ অধিক সেবন করিলে, গ্যাষ্ট্রিক রস অস্বাভাবিক রূপে
উহার সহ মিশ্রিত হইয়া, শক্তিহীন হইয়া পড়ে , সুতরাং উহার

রাসায়নিক নির্দিষ্ট কার্য সম্পূর্ণভাবে সাধিত হইয়া থাকে।
 যাহারা অজীর্ণ পীড়ার ক্লেশ ভোগ করিতেছে, তাহাদের কর্তব্য
 যে কি পরিমাণে এবং কখন কখন জলীয় পদার্থ সেবন করা
 প্রয়োজন, তাহা জানিয়া রাখা ! এই জল পান করা, আমাদের
 শরীর পোষণের জন্য নিত্য আবশ্যিক, সুতরাং উহা প্রায় একে
 বারে বর্জন করা অথবা স্বল্পমাত্রায় থাকায় পরিপোষণের ব্যাঘাত
 হইয়া থাকে। ডাঃ আই, এন, লোই (Dr. I. N. Lowe) বলেন
 যে ক্রুশ ব্যক্তিরাই স্বল্প পরিমাণে জল পান করিয়া থাকে এবং
 ঐ অভ্যাস পরিবর্তনে, তাহাদের শরীরেও পরিবর্তন সাধিত
 হইতে দেখা গিয়াছে। মোটা এবং ছোটপুট লোকেরাই সহজ-
 ভাবে নিম্নমিত জল পান করে দেখিবে। জলীয় পদার্থের
 মধ্যে কি কি সেবন করা আবশ্যিক তাহা আমরা পরে বলিব।
 আমাদের সমুদয় অঙ্গপদ এবং কিড্‌নী অর্থাৎ মূত্রোৎপাদক
 যন্ত্র যে, জলীয় পদার্থ সেবন দ্বারা সুপরিষ্কৃত (flushed) ও
 বিশোধিত হইয়া যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অজীর্ণ রোগী,
আহারাদি সময়ে সম্পূর্ণ নিরম্যধীন হইয়া, পরিমিত পরিমাণে
জলীয় পদার্থ খেন সেবন করেন।

স্বভাবতঃই দেখা যায় যে, কোন
 কোন ব্যক্তি, পুরুষ বা স্ত্রীলোক, অপে-
 ক্ষাকৃত স্বল্প পরিমাণে জলীয় পদার্থ
 আহার করিয়া থাকেন। আমরা ইতি-

আহারের সময়
 পানীয় সেবন

পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, আহার কালে পানীয় অধিক পরিমাণে
সেবিত হইলে, তাহা জীর্ণক্রিয়ার পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

এই অন্তরায় দূরীকরণ চেষ্টা সকলেরই করা কর্তব্য। আমরা

এমনও অনেক দেখিয়াছি যে, কেহ কেহ আহার কালে প্রায়ই জলপান করিয়া থাকেন, এই অভ্যাস বড়ই দোষ-বহ। বিশেষ চেষ্টা করিয়া উহা পরিত্যাগ করা কর্তব্য। আহার কালে বাহ্যতে তৃষ্ণাবোধ না হয়, তাহার প্রতি-কারের জন্য, ভোজনের ২০।২৫ মিনিট পূর্বে, অর্ধ গ্লাস শীতল জল, অথবা সম পরিমাণে দুগ্ধ সহ মিশ্রিত করিয়া, সেবন করা অভ্যাস কর, দেখিবে যে ভোজনের সময় ভূমি পূর্বের জ্বর আর তৃষ্ণাবোধ করিবে না। সুতরাং জলীয় পদার্থও অধিক আর সেবন করিতে হইবে না। আমর আহারের পর পূর্ণ এক গ্লাস জলপান করিয়া থাকি, ইহার

উপকারিতা এই বৃষ্টি যে, আহার কালে ত জল তৃষ্ণা বোধ করিই না, উপরন্তু সারাদিনের মধ্যে (গ্রীষ্মকালেও) উহা বৃষ্টিতে তেমন পারি না, অথচ জীর্ণক্রিয়ার অন্তরায় না হইয়া উহার সাপেক্ষেই কার্য্য করিয়া থাকে। এই কারণেই আমরা আহারের পরই জলপান প্রবৃত্ত মনে

করি। অনেক আবার ব্যবস্থা নেন

আহারের পর

যে, আহারের ১।২ ঘণ্টা পর উহা পান

জলপান কর্তব্য

করা কর্তব্য; আমরা তাহা মনে

করি না। এইভাবে আহারের পরই সকলের জলপানা করা কর্তব্য, আহারকালীন জলপানে অভ্যস্ত থাকিলে, উহা পরিবর্তন করিতে কয়েক দিবস সময় লাগিবে অবশ্য, কিন্তু পরে এমনি অভ্যাস হইয়া যাইবে যে, আর জলপান করিতে ইচ্ছাই হইবেনা। হুই বেলাই আহারের পর জলপান

করা কর্তব্য । পাশ্চাত্য লেখকগণ মত্তপানের বড়ই পক্ষপাতী, কারণ তাঁহাদের আচার, ব্যবহার, আহার, বিহার আয়োজ্য প্রমোদ, সমুদয়ই উহার সহ ঘনিষ্ট সম্বন্ধযুক্তক । সুতরাং উহার বলিয়া থাকেন যে, আহারের পর রাত্রিতে একটু মত্ত জলের সহ মিশ্রিত করিয়া, পান করিলে সহজে ভুক্তদ্রব্য ভীর্ণ হইয়া যায় ও স্বাস্থ্যও ভাল থাকে । বয়োবৃদ্ধ, অনিদ্রা-জনিত ক্লেশভাজন ও ধীর অলস রক্তাবর্তনযুক্ত ব্যক্তিগণেই উহা অধিক কার্যকারক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । ইহার পরি-বর্তে অন্য ব্যবস্থামতেও যে, উক্ত প্রকার স্বাস্থ্যলাভ ঘটিতে পারে তাহা রাত্রিতে মত্তপান আমরা উপযুক্ত স্থলে দেখাইয়া দিব , এবং আরও দেখাইব যে, মত্তপান যেসকল রোগের মূলীভূত কারণ আমাদের প্রদর্শিত ব্যবস্থা তাহা নহে ! সুতরাং আমাদের ব্যবস্থাই সর্বধা আচরনীয় ।

এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্বেই পাকাশয়ের রাসায়নিক কার্য অর্থাৎ গ্যাষ্ট্রিক রস সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি । পাকাশয়ে অজীর্ণতা, এই গ্যাষ্ট্রিক রসের পরিমাণ অথবা Quality গুণবত্তার উপযুক্ততার অভাবেই উৎপন্ন হয় জানিব, তোমার অজীর্ণতা এই কারণেই পাকাশয় ও গ্যাষ্ট্রিক উদ্ভূত কিনা, তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য পারিবারিক চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, তাঁহার আদেশমত ঔষধ সেবন ও নিয়মাদি প্রতিপালন করা কর্তব্য । মোটের উপর তোমার ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, এনিমিয়া অর্থাৎ রক্তক্ষীণতা হইলে

অথবা কোন প্রকার কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিলে, কিংবা সাধারণ শরীরপ্রকৃতি সুস্থ না থাকিলে, ও স্বাস্থ্যের নিয়মাদি প্রতিপালন করিয়া না চলিলে, তুমি কখনই আশা করিতে পার না যে, পাকাশয়ের গ্যাস্ট্রিক গণ্ড সমুদয় সবল ও সুস্থভাবে কার্য্য সম্পাদন করিবে এবং পরিমাণে ও প্রকারে উত্তম রস নিঃস্রব করিতে থাকিবে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অজীর্ণতাই শরীরের স্বাস্থ্যহানির প্রথম লক্ষণ সূচীত করে—হয়ত বা ইহা কোন সংঘাতিক পীড়ার আগমন সম্ভাবনা জানাইয়া সতর্ক করিয়া দিতেছে মনে করিয়া প্রথম হইতেই সাবধান হওয়া কর্তব্য। অথবা স্বাস্থ্যহানি কদাচ করিওনা। যখনই দেখিবে যে পাকাশয় কিংবা অল্প কোন শরীরযন্ত্র বিকৃতি লক্ষণ দেখাইতেছে, তখনই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইয়া, তাহার প্রতিবিধানে যত্নবান হইবে। পেটেন্ট ঔষধ

পাকাশয়িক বিকৃতি লক্ষণ যেমন, বেদনা, পেট কাঁপা ইত্যাদি দেখা দিলেই, আত্মবুদ্ধির প্ররোচনায় সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন দেখিয়া, বিজ্ঞাপন—দাতার প্রলোভনে আত্মহার্য্য হইও না !! চিকিৎসকের উপদেশ ব্যতিরেকে কোন ঔষধই সেবন করা কর্তব্য নহে। বিজ্ঞা-

পনের কুহকে মজিলে দেখিবে যে, তোমার অর্থ ও স্বাস্থ্য, দুইই লইয়া টানাটানি পড়িবে, কিন্তু সূচিকিৎসকের নিকট যাইলে অর্থ বধোচিত ধরত হইবে বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য—বাহ্য অর্থেরও মূল—কিরিয়া পাইবে !!! পূর্বেও বলিয়াছি আবার এখনও বলিতেছি যে, চিকিৎসকের প্রদত্ত ঔষধ সহ

ডাক্তার উপদেশানুযায়ী নিয়মাদি সম্পূর্ণ পালন করা অবশ্য কৰ্ত্তব্য, নতুবা আশানুরূপ ফল পাইবেনা। এই পুস্তক মধ্যে যাঁহা যাঁহা বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহা সকল দেশের চিকিৎসকগণ কর্তৃক অনুমোদিত, সুতরাং ইহা ভালরূপে অধীত করিলে এবং এই মতে চলিলেই দেখিবে যে, অনেক সময় ঔষধের ব্যবহার না করিয়াও—তোমার রোগ উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে! তবে রোগ একবার ভাল করিয়া দেখা দিলে, পূৰ্ব্বোক্ত নিয়মাদি পালনের সহিত চিকিৎসক নির্দেশিত ঔষধ সেবন করা বিশেষ আবশ্যক। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের শেষ ভাগেই এ সমুদয় কথা উক্ত হইয়াছে, তথাপি গুরুত্ববোধে ইহার পুনরুল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

অল্পমধ্যে পরিপাক ক্রিয়ার সমাধা এবং

য়কৃত ও পিণ্ডের কার্য্য ।

পাকাশয় পরিভ্যাগ করিয়া অল্পমধ্যে জীর্ণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করিবার পূর্বেই, কেমন করিয়া পাকাশয় ও ত্রিহনা পাকাশয় পরিকৃতভাবে রাখিতে হয়, বলা প্রয়োজন বোধ করি। যে সকল নরনারী বহুদিবস ধরিয়া অজীর্ণ পীড়ার কষ্ট পাই-

ভেছেন, তাঁহারা নিদ্রা হইতে প্রাতে উঠিয়াই, কেমন এক প্রকার শরীর অনস্থ অস্থব করিয়া থাকেন—স্বাধা বোধ হয় না, মুখগহ্বর চট্‌চটে, প্রায়ই বিষাদবৃত্ত আবাদ, দর্পণে জিহ্বা দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, উহা বড়ই লেপাবৃত, হয় পুরু ধূসরাত সাদা অথবা বাদামী বর্ণের কাটা কাটা চিহ্ন, এবং ধন্থলে ও উত্তর পার্শ্বে দন্তের ছাপবৃত্ত রহিয়াছে। অজীর্ণরোগী যাত্রেরই এতাদৃশ জিহ্বা প্রতিকৃতি দৃষ্ট হওয়া আশ্চর্যজনক নহে, তবে কখনও কম কখনও অধিক ভাবে দেখা যায় ; কিন্তু যখনই উহা লক্ষ্যে পড়িবে তখনই প্রতিকার করিতে চেষ্টিত হওয়া কর্তব্য। কেহ কেহ হয়ত ইহা দেখিয়াও দেখেন না, আবার কেহ বা কৃত্রিম উপায়ে জিবছোলা দিয়া পূৰ্ব্বোক্ত লেপ উঠাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করেন, এবং সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে না পারিয়া হুঃখিত হয়েন ! কিন্তু তাহারও অধিক যে চেষ্টা করা কর্তব্য, তাহা মনে ভাবেন না, স্মরণ্য এক প্রকার অঙ্গুধার উপরই আবার দৈনিক নিয়মিত আহাৰাদি করিয়া থাকেন। এ অভ্যাস বড়ই মন্দ, তোমার জিহ্বার অবস্থা চিকিৎসককে দেখাইয়া ব্যবস্থা করান প্রয়োজন এবং কেন যে জিহ্বা ঐ প্রকার লেপাবৃত হয়, তাহাও অবগত হওয়া কর্তব্য। জিহ্বাতেও যেমন বিদীর্ণতা ও লেপ দেখিতে পাইলে জানিও যে, তোমার পাকশয়ও উহার ছাপ অঙ্কিত হইয়াছে !! আসল কথা, পাকশয়ের অবস্থারই প্রতিকৃতি জিহ্বার প্রতিকলিত হইয়াছে জানিবে, স্মরণ্য শুধু জিহ্বা টাচিলে চলিবে না, পাকশয়টি আগে পরীক্ষা কর, দেখিবে যে জিহ্বার আর দাগ নাই।

আমরা দেখিতে পাই যে, প্রায় সকলেই •

প্রাতে উঠিয়া হস্ত মুখ ধৌত করেন, মল-
মূত্রাদি পরিত্যাগান্তে শৌচাদি, স্নান, এবং
দস্ত ধাবনাদি দ্বারা সমুদয় শরীর পরিস্কৃত
করিয়া থাকেন। এমন কি জিহ্বা অপরিষ্কৃত দেখিয়া তাহাও
টাচিয়া ছুলিয়া পরিস্কার করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু উহা
যে দৰ্পণবৎ অন্তের ছায়া প্রতিফলিত করিতেছে তাহা জ্ঞাত
না থাকায়, প্রকৃত স্থান পরিস্কার করিতে সমর্থ হন না ! সুতরাং
পাকাশয়—প্রকৃত লেপাবৃত স্থান—অপরিষ্কৃত থাকিয়া, সমু-

পাকাশয় পরিস্ফুটি
করণ কর্তব্য

দয়ই বিফল করিয়া দেয়। জিহ্বা ময়লা হইলেই যখন পাকা-
শয়ও ময়লা হইয়াছে বুঝিতে হইবে, তখন জিহ্বার জ্বায় উহাও
যে প্রত্যহ পরিস্কার করা কর্তব্য তাহা এখন বোধ হয় সকলেই
স্বীকার করিবেন। কিন্তু কি উপায়ে উহা সম্পাদিত হইতে পারে ?
এক গ্লাস শীতল অথবা গরম জল, প্রাতে উঠিয়াই

(যখন পাকাশয় শুষ্ক থাকে), সেবন পরিকরণ গহা
করিলে অতি সহজেই ঐ কার্য সম্পন্ন

হইতে পারে জানিবে। এই এক গেলাস জল একেবারে ঢুক্
ঢুক্ করিয়া পান না করিয়া ২৩ বারে পান করায় বিশেষ ফল
হইয়া থাকে। এলোপাথিক মতে অনেকে ইহার সহ, বাই-
কার্বনেট অফ সোডা Bicarbonate of Soda (সামান্য ম্যাগ-
নেশিয়া কার্বোনের সহিত অথবা উহা না দিয়া) স্বল্প লবণ
সংযোগ করিয়া সেবন করিতে বলেন। কিন্তু আমরা তাহার
কোন বিশেষ উপকারীতা দেখি না ; বরং প্রত্যহ ম্যাগ্নি-

শিয়াদি সেবন করিতে থাকিলে, উহা ব্যতীত আর কোষ্ট
পরিষ্কার হইবার উপায়ই থাকিবে না। সোডা কিংবা ম্যাগনেশিয়া
কদাচ অভ্যাসমত প্রত্যহ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। আয়ুর্বেদ

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, সূর্য্যোদয়ের পূর্বে অতি প্রত্যাষে অর্দ্ধ-
সের বাসি জল পান করিলে—বায়ু, পিত্ত ও কফের শান্তি হইয়া
আয়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই প্রকার জলপান ক্রিয়া নাসিকা
দ্বারাও সাধিত হইবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়; আমাদের পূর্বতন
যোগী ঋষিগণ এই প্রকারে—নাসা ও মুখ দিয়া জলপান করিয়া
(জ্বাস লইয়া) মলবার দিয়া বাহির করিয়া দিতেন। এইরূপে
দেহের সমুদয় অভ্যন্তর ভাগ যে পরিশোধিত

করিতে পারা যায়, তাহা একমাত্র হিন্দুর যোগ ও শরীর
পূজনীর দেবকল্প ঋষিগণই বিজ্ঞাত ছিলেন !!! সাধন

দেহ শুদ্ধ থাকিলেই চিত্তশুদ্ধি থাকিবে এবং

তাহা হইলেই ভগবৎ সাধনায় আত্মমুক্তির পথ প্রশস্ত হইতে
পারিবে, বলিয়াই তাঁহারা যাহাতে শরীর সুস্থ থাকিতে পারে,
তাহার সচুপায় স্থির করিয়া ধর্ম্মের আবরণ দিয়া পালনীয়
বলিয়া গিয়াছেন। আমরা বতই “যরের জিনিষ” অহুস্বেদান
করিতেছি, ততই উহার মহত্ব ও প্রয়োজনীয়তা দেখিয়া আশ্চর্য্য
হইতেছি! কিন্তু হায়! কলকাতা আমরা শিক্ষিত হইয়া উহা
পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়া থাকি! এখন বাহা কিছু পান্ধাত্য
তাহাই আমরা আদর করিয়া লইতেছি,

কিন্তু প্রাচ্যভূমি—পান্ধাত্য সত্যতত্ত্ব বহু- এচা ও পান্ধাত্য
পূর্বসম্রাজ্য—ভারতের নিজস্ব বাহা ছিল

তাহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া যাইতেছি। জলের

ভ্রাস হইয়া শরীর শোধনের ব্যবহার প্রয়োজনীয়তা আমরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতামতাবলী পাশ্চাত্য মনীষিগণের উপদেশাদি হইতেও নিরে দেখাইয়া দিতেছি।

প্রাত্যহিক স্নানের দ্বারা চর্মের পরিষ্কৃতি ও শরীর সুস্থ হওয়ার ভ্রাস, “খালি পেটে” এক গেলাস জলপানেও পাকায় পরিশোধিত ও সুস্থ হয় জানিবে ; কারণ ঐ পানীয় জল পাকায় উপনীত হইয়া, মাংসপেশীর কার্যাবলী দ্বারা তত্রস্থ সমুদয় স্থানে আলোড়িত হইতে থাকে। এই আলোড়নের ফলে, উহার গাত্র পরিষ্কৃত ও গ্যাষ্ট্রিক গুণ সমূহের স্বাস্থ্য প্রাপ্ত সকল বন্ধাবস্থা হইতে উদ্ধৃত হইয়া পড়ে, সুতরাং উহা হইতে উদ্ধৃত রস অবাধে নিঃসৃত হইতে পারে। ইহা ব্যতীত পাকায়ের স্নায়ু সকলকে তীক্ষ্ণ এবং তেজবন্ত করিয়া, উহার স্বকর্তব্য পালনেও উত্তেজিত করা ইহার দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে জানিবে। পাকায়ের দ্বারা অবস্থাতেই জল আংশিক পরিমাণে শরীরবিধান মধ্যে অবচুষিত (absorbed)

হইয়া যায়, কিন্তু বেশীর ভাগই অন্ত্রমধ্যে সেবিত জলের কার্য পরিচালিত হইয়া পড়ে এবং নিম্ন অঙ্গে অবস্থিত বস্তু সকলকে অধিকতর তরল প্রকৃতিবিশিষ্ট ও অঙ্গের গাত্রসংলগ্ন মাংসপেশী উত্তেজিত করিয়া, স্বভাবকে (nature) সাহায্য করিতে থাকে। এই সাহায্য কার্যের জন্তই কোষ্ঠবদ্ধ প্রকৃতি দূরীভূত হইয়া যায়।

প্রাতে উঠিয়া সর্ব প্রথমেই পূর্ণ এক গ্লাস, শুদ্ধ জল পান

দ্বারা পাকাশয় পরিস্ফুটিকরণে যে এত অধিক উপকারীতা বর্তমান আছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত নহেন । তোমাদের মধ্যে হয়ত অনেকেই এই সমান বিষয় পালন করিবার জ্ঞান, নিজ নিজ চিকিৎসক কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তোমরা তাহা পালন কর। আবশ্যক বলিয়া মনে কর নাই, অথবা হয়ত অকর্তব্যকরণে ২১ সপ্তাহ মাত্র সন্দের খাতিরে পালন করিয়া অকর্তব্য বোধে পরিত্যাগ করিয়াছ !

এই স্থানে সহজ ভাষায়, উহার যুক্তিপূর্ণ ঔষধের সহকারিতা প্রয়োজনীয়তা সহ ব্যবস্থাপ্রণালী মুদ্রিত দেখিতে পাইবে ; নিয়মিত ভাবে সর্কাস্টিকরণে ইহা মানিয়া চলিতে থাক, তাহা হইলেই দেখিবে যে তোমার চিকিৎসক ব্যবস্থিত ঔষধ ব্যবহারে পূর্ণাপেক্ষা অধিক ফল পাইতেছ ও যখন তখন আর উহা ব্যবহারেরও আবশ্যক হইবে না । উক্ত ব্যবস্থায় তোমার পাকাশয় পরিস্ফুট হইয়া ময়লা বর্জিত থাকিবে এবং তাহার ফলস্বরূপ তুমি ও তোমার চিকিৎসক উভয়েই আনন্দিত হইবে । তাই বলি যে, ডিম্বেপটিক অর্থাৎ অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যেন কদাচ এই প্রথা অবলম্বনে বিন্দিত না হয়েন ; নিত্য নৈমিত্তিক দস্তধাবণ, হস্তপদাদি প্রক্ষালন ও স্নানাদি যেমন অবশ্য কর্তব্য বলিয়া জ্ঞাত আছে, সেইরূপ ইহাও তোমার প্রাত্যহিক কর্তব্য বোধে পালন করিয়া যাইবে ।

সকলেই প্রায় বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, অজীর্ণতা ও পাকাশয়েরই কোন প্রকার দোষাদি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক তাহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি । ঐ দোষ যে মুখগহ্বরেরও হইতে পারে এবং পরি-

পাক যন্ত্রাদির সুস্থকার্য্য নির্বাহ করে, শরীরবিদ্যানের সাধারণ স্বাস্থ্যও যে সমধিক প্রয়োজনে আসিয়া থাকে তাহা আমরা দেখিয়াছি। জীর্ণক্রিয়া মুখগহ্বরে আরম্ভিত হইয়া পাকাশয়ে বিশেষরূপে অগ্রগামী হয়, কিন্তু তথায় উহা সম্পূর্ণ হয় না ;

যকৃত হইতে নিঃসৃত পিত্তরস, ক্রোম্

(pancreas) হইতে স্রাবিত ক্রোম-

রস, এবং অন্ত্রের নিজ গণ্ডাদি glands

জীর্ণক্রিয়া অসমাপ্ত

পিত্তাদির দ্বারা সমাপ্ত

হইতে নিঃসৃত এক প্রকার রস—এই

২য়।

সমুদয় জীর্ণ কারক রস, পাকাশয়

হইতে বহির্গত ভুক্ত পদার্থের সহ, অন্ত্রপথে মিলিত হইয়া পড়ে

এবং তথায় সকলের একত্র মিলিত শক্তি দ্বারা, জীর্ণকার্য্য সম্পন্ন

করে। যখনই উক্ত রসের কোন একটি, পরিমাণে অথবা গুণ-

বত্তায় (Quality), পর্য্যাপ্তহীন হইয়া পড়ে, তখনই চিকিৎসকের

সাহায্য লইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রতিপালনে সেই সেই যন্ত্র

গুলি পুনরায় সুস্থাবস্থায় আনয়ন চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য।

পুস্তকের ভূমিকায় আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, ইহা জীর্ণ

যন্ত্রাদির স্বচ্ছলতাবলম্বনের উপায় প্রদর্শক মাত্র ; ইহার প্রদর্শিত

পাথে যদি কেহ অবহিতচিত্তে চলিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা

নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, ঐ যন্ত্রাদি বিপথগামী হইবার সম্ভা-

বনা মোটেই পাইবে না।

আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, পাকাশয়টি সম্পূর্ণ

আমাদের আয়ত্বাধীন—দেহের অনান্ত যন্ত্রাদি যথা—যকৃত, ক্রোম্

(Pancreas), অন্ত্র প্রভৃতি কোনটিই উহার মত অন্ত্রগত নহে ;

ইহাদের কার্যাবলী একটু জটিল। “পাকাশয়ে অজীর্ণতা” প্রস্তাবে পূর্বে বাহা বর্ণিত হইয়াছে, যদি তাহা সঠিকরূপে প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে ভুক্ত পদার্থ অল্পমধ্যে সুজীর্ণাবস্থায় প্রবেশ করিয়া, তথায় উহার কার্য সম্পূর্ণরূপে সমাধা করিতে পারিবে ; সুতরাং অজীর্ণজনিত আর

কোন প্রকার ক্লেশই পাইতে হইবে

পাকাশয় সহ বন্ধ-

না। পাকাশয়ের সুস্থ কার্যাদি সম্পা-

তাদির সম্বন্ধ

দন উদ্দেশ্যে যে যে নিয়মাদি প্রতিপালন

করিতে উপদেশাদি দেওয়া হইয়াছে, তাহা সমুদয়ই বন্ধ ও

অস্ত্রের ও পরিপোষক বলিয়া জানিবে। এজন্ত পাকাশয়ে

জীর্ণকার্যের সুফল উৎপাদন জন্ত নিয়মাদি প্রতিপালনে, অল্পমধ্যে জীর্ণকার্যেরও সহায়তা সাধিত হইতেছে দেখিতে পাইবে।

তবেই দেখা যাইতেছে একের কার্য অস্ত্রের উপর সমধিক

ভাবে নির্ভর করিতেছে, সুতরাং একটির সুব্যবস্থা করিলেই অস্ত্র-

টির সুব্যবস্থা আপনা হইতেই হইবে। অজীর্ণ রোগীর সংখ্যা

আজকাল অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, বিশেষতঃ সহরে

(শতকরা ৮০।২০ জন বলিলেও চলিতে পারে) সুতরাং এই বিষ-

য়ের গুরুত্ববিধায় প্রতিবিধানকল্পে আমরা আবারও বলিতে বাধ্য

হইতেছি যে, এই পুস্তক লিখিত পূর্ববর্ণিত উপদেশাদি প্রতি-

পালন করা এবং পরে যে সমুদয় বিষয় বর্ণিত হইবে অর্থাৎ কোন্

২ আহারীয় বস্তু সহজ পরিপাচ্য এবং কোন্ গুলিই বা হৃস্পাচ্য,

কোন্ জিনিস আহার করা আদর্শেই উচিত নহে, কোন্ দ্রব্য

বা সুবিচার পূর্বক (With discretion) আহার করা কর্তব্য

(অবশ্য সকল প্রকার খাদ্য এবং পানীয়ই discretion সহ ভোজন

করা উচিত) ইত্যাদি বিষয় সম্যকরূপে অবগত থাকিয়া, তরুণ কার্য করিলে নিশ্চয়ই ক্রোম (Pancreas) এবং অন্ত্রের গতাদি হইতে রসাদি সুভাবে নিঃসৃত হইতে থাকিয়া, সমুদয় জীর্ণ-কার্য সুসাধিত হইতে থাকিবে এবং শরীরের সাধারণ স্বাস্থ্যও উত্তম থাকিবে।

জীর্ণকার্যে পিত্তের অর্থাৎ যকৃত হইতে নিঃসৃত—একটি ক্ষুদ্র

নলি দিয়া উহা অন্ত্রমধ্যে পতিত হয়—

রসের প্রাধান্ত বিশেষ রূপে দৃষ্ট হয় ;

জীর্ণকার্যে পিত্তের

অন্ত্রমধ্যে ভুক্ত পদার্থের সম্পূর্ণ পরি-

কার্য

পাক ও পরিপোষণ (assimilation)

কার্য ইহার উপর সমধিক নির্ভর করিয়া থাকে জানিবে। সে জন্ত যকৃতের কার্য বাহ্যতে সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহা বিশেষ ভাবে অবগত থাকা প্রয়োজন ; উহা হইলেই পিত্তেরও অনির্দিষ্ট কার্য আপনিই সুভাবে চলিবে। সুতরাং যে প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে যকৃত গোলমালযুক্ত হইতে না পারে তাহাই

এখানে বিবৃত হইতেছে। (১) আহায়ে

যকৃতকে গোলমাল-

বসিবার সময় উত্তেজিত অথবা রাগা-

যুক্ত না হইতে ...

বিত অবস্থায় থাকিলে যকৃত গোলমাল-

নিবারণ উপায়

যুক্ত হইয়া মন্দ ফল উৎপাদন করিতে

পারে ; (২) draught অর্থাৎ ঠাণ্ডা ঝাপটা বাতাসে অধিক-

ক্ষণ বসিয়া থাকার জন্ত বিশেষ ভাবে পারে ঠাণ্ডা লাগিলে, রক্ত

যকৃত মধ্যে প্রাণিত হইয়া উহাকে রক্তাধিকায়ুক্ত করিয়া দেয়,

এবং পিত্ত নিঃসরণ বিষয়ে বাধা উৎপাদন করে ; (৩) আহা-

রের সময় কোন প্রকার উত্তেজক পানীয় (Stimulants) সেবন করা কর্তব্য নহে ; দুর্বলতা অথবা বার্কক্য কিংবা কঠিন পরিশ্রম বা রক্তাবর্তনের (circulation) যে কোন প্রকার গোলযোগ উদ্ভবের কারণ জনিতই হউক না কেন, যদি তুমি উহা সেবন করিতে আবশ্যক বোধ কর, তাহা হইলেই যত্নত রক্তাধিক্যযুক্ত হইয়া পিত্তের কার্যে গোলযোগ উৎপাদন করিবে। মত্তাদি অতিরিক্ত পান করি-

লেই—যে কোন সময়েই হউক না কেন মদের গুণ !!

—পাকাশয় ও যকৃতের বিশেষ অনিষ্ট

সাধিত হয় জানিবে, এমন কি উহা হইতে জীবনেরও আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। (৪) “পূর্ব এবং উত্তর পূর্ব” বাতাসে অনেক লোকের যকৃত গোলযোগাক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে ; যখন এই বাতাস তীব্রভাবে বহিতে থাকে, তখন বাহিন্দ্রমণ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। শীতকালে সম্ভবমত গরম বস্ত্রাদিতে আবৃত থাকিয়া, অধিক সময় গৃহমধ্যেই কাটান আবশ্যক।

হস্ত পদাদি শীতল রহিয়াছে দেখিলেই বুঝিবে যে, শরীরের ঐ অঙ্গে রক্ত চলাচল ভালরূপে হইতেছে না। চর্মের মধ্যে রক্ত সদাই সমধিক পরিমাণে সঞ্চিত থাকে ; উহাতে কাঁটা কাঁটা ভাব দেখা যাইলেই বুঝিবে যে, হয় শীত অথবা ভয় হইতে উহা উৎপন্ন হইয়াছে। যদি সমুদয় শরীরই উষ্ণ না থাকে, তাহা হস্ত পদাদি শীতল হইলেই হইলে নিশ্চিত জানিবে যে শীতল স্থানে জানিবে যকৃত অধিক্য রীতিমত রক্ত চলাচল হইতেছে না। হইয়াছে।

সুতরাং শরীরের অন্য কোন অংশে

উহা সঞ্জাত হইয়া রক্তের আধিক্য জন্মাইতেছে । এইরূপে শরীরের অন্ত্রাংশের অচলিত রক্ত ধাবিত হইয়া, শতকরা ২০ স্থলে যকৃতেরই সঞ্জাত হইয়া থাকে এবং ইহারই ফলস্বরূপ যকৃত রক্তাধিক্য যুক্ত, পিত্তের স্বাভাবিক নিঃসরণ বাধা প্রাপ্ত ও পিত্তিয়ত্তাব (biliousness) এবং অজীর্ণতা দেখা যায় । মুখ—গহ্বর ও পাকযন্ত্রের পরিপাকক্রিয়ার স্থায়, এই অল্পপথের পরিপাক কার্যও, অংশত রাসায়নিক ও অংশত মেকানিক্যাল উপায়ে বিভক্ত জানিবে । পিত্ত, ক্রোম এবং অস্ত্রের নিজ গাত্র নিঃসৃত রসাদির মিলিতশক্তি দ্বারা ভুক্তদ্রব্য পরিপাচিত এবং এরূপ পরিবর্তিত হয় যে, সহজেই শরীরে অবচুষিত (absorbed) হইয়া পরিপোষণ যোগা হইয়া থাকে । যে প্রক্রিয়ার দ্বারা ইহা সাধিত হয়, তাহাই **অত্রমধ্যে পরিপাকের**
অস্ত্রের রাসায়নিক পরিপাক উপায় **রাসায়নিক কার্য**
বলিয়া জানিবে ।

পিত্তের নিঃসরণ ক্রিয়া, পরিমাণে—অতি স্বল্পও নহে অথবা অতি অধিকও নহে—ও গুণবত্তায় পর্যাপ্ত করাইতে হইলে, উপরে যে উপদেশাদি দেওয়া হইয়াছে, (অর্থাৎ কোন ক্রমেই যকৃতের কার্যে বাধা প্রাপ্ত হইতে না দেওয়া) তাহা অবশ্যই পালন করিতে হইবে ; ইহা করিলেই দেখিবে যে যকৃতের কোন প্রকার গোলযোগ হেতু আর অপরিপাক জন্মিতে পারিবে না । ক্রোম ও অস্ত্রের নিঃসৃত রস পর্যাপ্ত পরিমাণে ও উত্তম প্রকৃতির (Quality) বজায় রাখিতে হইলে, মুখগহ্বর ও পাকায়ন্ত্রের পরিপাক ক্রিয়া ভালরূপে বাহাতে সুস্পন্ন হইতে পারে তাহা করিলেই চলিবে ।

অল্পমধ্যে পরিপাক কার্যের যেকোনিক্যাল উপায় দ্বারা ভুক্ত পদার্থ ধীরে ধীরে, নিয়মিত ভাবে এবং নিঃশব্দে ২৫ পঁচিশ ফিট লম্বা অন্ত্রপথ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ঐ ভুক্ত পদার্থ যদি অতি সহজে পরিচালিত

হইয়া যায়, তাহা হইলে উপযুক্ত রূপে অল্পমধ্যে পরিপাকের
পরিপাচিত এবং পরিপোষিত হইবার যেকোনিক্যাল
পূর্বেই, উহার কতক অংশ শরীর হইতে উপায়
বাহির হইয়া পড়ে ; সুতরাং উহার পরি-
ণাম স্বরূপ ঐ ব্যক্তি পাতলা (thin) এবং মন্দরূপে পরিপুষ্ট
(Mal-nutrition) হইতে থাকে। অথবা যদি ঐ ভুক্ত পদার্থ
অল্পমধ্যে অধিকক্ষণ যাবৎ রহিয়া যায়, তাহা হইলে উহা
তথায় পচিয়া (decomp. sed) উঠে ও বিষময় পদার্থ সকল
সৃজন করে। এই প্রকারে উদ্ভূত কোষ্ঠবদ্ধতাই অপরিপাকের
এবং স্বাস্থ্যহানির একটি প্রধান কারণ জানিয়া রাখিবে।

অন্ত্রপথ দিয়া যদি ভুক্ত পদার্থ অতি সহজে অপসারিত হইয়া যায়, তবে কাল বিলম্ব না করিয়া চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন ; সেই সময়ে জল সাগু, জল বালি অথবা উহার সহিত সামান্য পরিমাণে দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করা প্রয়োজন। যে সকল দ্রব্য সহজে হজম হয় না বলিয়া তোমার জানা আছে, তাহা এই সময় পরিবর্জন

করা অবশ্য কর্তব্য ; কারণ উহা অন্ত্রের উদ্রাবস্থা

উপদ্রাব (Irritation)—উদ্রাবস্থ—

উৎপাদন করাইয়া, তদ্বাধ্য হইতে বত সহর সম্ভব বহিঃনিঃসৃত

হইতে থাকে ; যতক্ষণ উহার সহিত সমুদয় ভুক্ত পদার্থ বহির্গত হইয়া না। যায়, ততক্ষণ উহা আপনার কার্য সাধনে বিরত হয় না। তবেই দেখ যে, কোন একটি অপরিপাচ্য বস্তু ভোজন করায় ক্ষত, তুমি অন্য খাওয়া কিছুও খাইয়াছ তৎসমুদয়ই অপরিপাচিত অবস্থায় শরীর হইতে বহির্গত হইয়া গেল। অতএব ঐ প্রকার কোন দ্রব্যই আহার করা উচিত নহে। এখানে একটি কথা

হইতেছে কেমন করিয়া জানিতে পারা যাইবে যে, ইহা হজম হইবে, উহা হইবে না! পাশ্চাত্য গ্রন্থকারগণের এই বিষয়ক পুস্তক পাঠে আমরা বিশেষ লাভবান ইহাতে হইতে পারি না ; কারণ এক পক্ষে চিকিৎসা গ্রন্থ মাত্রেই

শুদ্ধ লিখিত থাকে যে, সহজ পরিপাচ্য আয়ুর্বেদীয় জ্যোতিষ

ও সাদাসিধা আহার করিবে, কিংবা

হয়ত পাশ্চাত্য সুলভ ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির কথা উল্লেখ থাকে। আমাদের দেশের আহার ও ব্যবহার সমুদয়ই পাশ্চাত্য হইতে বিভিন্ন, সুতরাং উহাদের আহার্য্য দ্রব্যাদির গুণাগুণ অবগত হইয়া, আমরা আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য ভোজন দ্রব্যাদি সম্বন্ধে কিছুই অবগত হইতে পারি না। এই সমুদয় বিষয় জানিতে হইলে, আয়ুর্বেদীয় মতে “দ্রব্যগুণ” সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার ; কিন্তু আমরা তাহার দিকে লক্ষ্যও করি না। ! আমাদের প্রতি গৃহেই কিঞ্চিদধিক ২৫ বৎসর পূর্বেও প্রবীণা গৃহিণীগণ এতৎ সম্বন্ধে, অন্ততঃ সাধারণ ভোজ্য বস্তু আদির বিষয়ে, সম্যক জ্ঞানবিশিষ্টা ছিলেন ; কিন্তু এই গৃহিণীগণই “নাটক নভেলাদি” পাঠ অথবা “উল বুনিতে” পারিতেন না বলিয়া, আধুনিক সমাজে অশিক্ষিতা বলিয়া বর্ণিত হইয়া

থাকেন!! আজকাল যেমন আমরা

একদেশীয় (one-sided) শিক্ষা প্রাপ্ত সে কাল ও এক কাল

হইয়া নিজস্ব রূপাদি অবেষণ না করি-

য়াই, উহা যে আমাদের কখনও ছিল না বলিতে শিখিয়াছি—

সেইরূপ আমাদের ছাঁচে ঢালা, আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণও, পূর্বতন

প্রবীণাদের সংসারজ্ঞান লাভে বঞ্চিত হইয়াও, তাঁহারা যে

কিছুই জানিতেন না এইটিই মনে করিয়া থাকেন।!!

আজ যদি আমাদের প্রতি ঘরে পূর্বের জ্ঞান প্রবীণগণের

অস্তিত্ব থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় ঘরে ঘরে এত

রোগ যাতনা সহিতে হইত না!! প্রতি গৃহেই এখন ঐ

প্রাচীণগণের স্থান আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষিত চিকিৎসকগণ

অধিকার করিয়া বসিয়াছেন; চিকিৎসক যাহা বাবুলা করিয়া

দিবেন, তাহাই পথ্যাপথ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে—কিন্তু

করুণ চিকিৎসক এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত আছেন? আমরা

পূর্বেই বলিয়াছি যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রন্থে, একরূপ উহার

বিশেষ উল্লেখ নাই বলিলেও চলে (বর্ত্তমাণে খাজাদি

সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে ও হইতেছে,

কিন্তু তাহা আমাদের দেশোপযোগী নহে, বলিয়া আমাদের

এতকথা বলিবার উত্তোগ জানিবে) সুতরাং আনুর্বেদ গ্রন্থ

হইতে ইহার বিশেষ আলোচনা করা কৰ্ত্তব্য। আমরা স্বতন্ত্র

অধ্যায়ে এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া, নিত্য ব্যবহার্য্য কোন

কোন দ্রব্য আমাদের সহজ পরিপাচ্য অথবা দুশ্পাচ্য তাহা

দেখাইয়া দিব। এখানে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, সকল

রকম শাক সবজী, ফলাদি (বিশেষতঃ কুল, নারিকেল ইত্যাদি).

জাড়িত দ্রব্যাদি, শুড়, চর্কি, মাংস, রুটি প্রভৃতি সাধারণ আহাৰ্য্য দ্রব্যাদি অধিক ভোজন করিলে, মন্দকার্য্যকর পরিপাক ক্রিয়া-
সম্পন্ন লোকের উদরায়র উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অপর পক্ষে

ভুক্ত পদার্থ অল্প মধ্যে অধিকক্ষণ যাবৎ রহিয়া গেলে [অর্থাৎ

যদি তুমি কোষ্ঠবদ্ধতা হেতু ক্লেশ

পাইতে থাক, বাহা অনেকেরই সাধা-

কোষ্ঠবদ্ধতা।

রণ অভিযোগ] উহা দূরীকরণ

জন্ত নানাপ্রকার উপায় আমরা দেখাইতে পারি। এই কোষ্ঠ-
বদ্ধতা অপরিপাকের একটি সাধারণ কারণ এবং লোকসমাজে
এতই সাধারণ ভাবে লক্ষিত হয় যে, আজকাল উহা একটি
প্রধান উপসর্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে চলিয়াছে। সুতরাং
আমরা এই ও বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করায়
এখানে আর উহার কোন প্রতিকার ব্যবস্থা লিখিত হইল না।



চতুর্থ অধ্যায় ।



পরিপাক ক্রিয়া ও অনচুষণের সংক্ষিপ্ত সার ।

যাহা দ্বারা ভক্ষ্যদ্রব্যের অধিকাংশ ভাগ রাসায়নিক, প্রাকৃতিক এবং জৈবনিক কার্যাবলীসারে, নূতন আকৃতিতে অবস্থান্তরিত হইয়া, রক্তের সহিত মিলিত হইয়া যায় এবং শরীরের প্রত্যেক টিস্যুকে সংশোধিত ও নবভাব ধারণ করাইয়া, উহার সংরক্ষণোপযোগী উত্তাপ আনীত হয় তাহাই পরিপাক ক্রিয়া ।

আহার সময়ে খাদ্যবস্তু দন্তদ্বারা চর্কিত ও লালারসের সহিত মিশ্রিত হইয়া, ক্রমশঃ ইসোফেগাস্ (অন্ননলী), পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যে বিচরণ করিবার সময়, এই সমুদয় নলপথের স্নায়িক ঝিল্লীর (mucous-membrane) এপিথেলিয়াম কোষ ও উহাদের স্ব স্ব গ্রন্থি (glands) হইতে নিঃসৃত নানাবিধ রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় । পরিশেষে এই মিশ্রণ পদার্থ সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হইয়া, প্রত্যক্ষভাবে (directly) শিরা দ্বারা চালিত হয় অথবা পরোক্ষভাবে (indirectly) ল্যাক্টিয়াল নলী সমুদয় দ্বারা অবচুষিত হইয়া পড়ে । সর্বশেষে অন্ন অসাদৃশ্যপদার্থ, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা বিভিন্ন নির্গমনের পথ দিয়া বহির্গত হইয়া যায় ।

এই পরিপাক ক্রিয়ার প্রধান কার্য সমুদয় সম্পন্ন করিবার জন্ত, ফারমেন্ট (ferments) নামক এক শ্রেণীর পদার্থ আব-

স্রকে আসিতে দেখা যায় । অন্নবহানলী মন্থ্যে পতিত, প্রায় সমুদয়
প্রকার নিঃস্রবের (Secretion) মধ্যেই একটি করিয়া ফার্মেন্ট
দৃষ্ট হয়, উহা ভক্ষিত খাদ্য পদার্থকে

বিগলিত করিতে বিশেষ প্রকারে ফার্মেন্ট্‌স্

সাহায্য করিয়া থাকে । এই ফার্মেন্ট্‌

সকল, জলে দ্রবণীয় এবং জাস্তব যেষ্ট্রনের ভিতর দিয়া শোষিত
হইয়া যায়—যদিচ সহজে নহে । ৭০ ডিগ্রী সেন্টি (১৬০ ফা)
উত্তাপে ইহার inert অকার্য্যকরী হয় (অর্থাৎ তখন উহাদের
আর কার্য্যকরী ক্ষমতা থাকে না) এবং তীব্র স্রাসারে অধঃস্থ
(precipitate) হইয়া যায় ।

মুখগচ্ছবরে :—খাদ্য পদার্থ চূর্ণীকৃত হইয়া লালারসের
সহিত মিশ্রিতও কোমল আকার প্রাপ্ত হয় ; শ্বেতসারের (starch)
কতকাংশ মল্টোজ (maltose) নামক শর্করায় পরিবর্তিত
এবং ক্ষারধর্ম্মাক্রান্ত (alkaline) হইয়া যায় । চর্কি এবং
প্রোটিন্‌স্ (নাইট্রোজেনস্ পদার্থ) জাতীয় পদার্থের কোম
অবস্থান্তর হয় না ।

পাকস্থলীতে :—ভক্ষাদ্রব্য পতিত হইয়া অন্নযুক্ত হয়,
শ্বেতসারজাতীয় পদার্থের শর্করায় পরিণতি ক্রিয়া লোপ পায়,
চর্কিজাতীয় পদার্থের সংযোজক তন্তু (connective tissue)
গলিয়া যায় এবং প্রকৃত চর্কি সকল পৃথক্ হইয়া পড়ে ।
প্রোটিন্‌স্ বিগলিত হইয়া পেপ্টোন (peptone) গঠন করে ;
আল্‌বুমিনাস্ (albuminous) খাদ্য পদার্থের অধিকাংশ গলিয়া
যায় এবং সমুদয় পেপ্টোন, তরল চর্কি এবং শ্বেতসারীয় পদার্থ

একত্রে মিশ্রিত হইয়া কাইম (chyme) নামে পরিচিত হয় ।
এই কাইম পাইলোরসের (pylorus) মুখ দিয়া অন্ত্রমধ্যে
পতিত হয় ।

অনুসরণো : — পিত্ত, ক্রোম' এবং আন্ত্রিক (intestinal) রসের সহিত কাইন্ মিশ্রিত হইয়া কার্বোহাইড্রেট হয় ;
শ্বেতসারীয় পদার্থের শর্করায় পরিণতি কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হয় ;
চর্বিজাতীয় পদার্থ বিগলিত (emulsifying) হইতে আরম্ভ হয়
এবং অবিগলিত প্রোটিন পদার্থ সমুদয় পেপ্টোনে পরিণত
হইতে থাকে । এক্ষণে এই মিশ্রগঠিত পদার্থকে আর কাইম
না বলিয়া কাইল (chyle) বলা হয় । পেপ্টোন এবং লাব-
ণিক পদার্থের সহজ বায়ু (diffusible) অংশ সমুদয়, পোটাল
শিরায় প্রবেশ করে এবং সূক্ষ্ম বিভাজ্য অবস্থায় চর্বি ল্যাক-
টিয়ান্ (lactial) নদীর ভিতর শোষিত বা সঞ্চালিত হইয়া
যায় । বৃহদন্ত্রে তরল কাইন্ ক্রমশঃ অতরলে পরিণত হয় এবং
বিবিধ ফার্মেন্টেটিভ্ (fermentative) অর্থাৎ ফার্মেন্ট ঘটিত
পরিবর্তনাদি দ্বারা অগ্নয়ুক্ত হয় ও মল পদার্থের গন্ধ প্রাপ্ত হয় ;
পরিশেষে মলকার দিয়া সময়ে বহিঃনিষ্কৃত হইয়া পড়ে ।

পাচক রস ও ফারমেন্ট সমূহের তালিকা।

পাচক রসের নাম	ফারমেন্টস্ এর নাম	ক্রিয়া
লালারস	টায়ালিন অথবা ডায়াষ্টেজ্	বেতসারকে ডেক্ট্রিন ও শর্করায় পরিণত করে।
পাকায় রস	(ক) পেপসিন (খ) ছানাকারক ফারমেন্ট (গ) (রানিন্)	(ক) অন্নরসে প্রোটিনকে এলবুমোজ পেপ্টোন করে। (খ) দুগ্ধের কেসিনকে ছানায়ুক্ত করে
কোমরস	(ক) ট্রিপসিন (খ) ছানাকারক ফারমেন্ট (গ) ডায়াষ্টেজ (ঘ) বিপলন কারক ফার্মেন্ট	(ক) ক্যাবরসে প্রোটিনকে পেপ্টোন করে। (খ) দুগ্ধের কেসিনকে ছানা করে। (গ) বেতসারকে শর্করা করে। (ঘ) চর্ষিকে বিপলন ও অংশত ছানায়ুক্ত করে।
আম্লিক রস	ইন্ডোত্রিনি	“কেন” নামক শর্করাকে ইন্ডো- ট্রাই-নামক শর্করায় পরিণত করে।

ল্যাক্টিয়াল দ্বারা অবচুচিত	চর্বি	(অধিকার)
	সাবান	• (দ্রব)
	পেপ্টোন	"
	শর্করা	(অতি দ্রব)
	লাবণিক পদার্থ	"
	জল	(দ্রব)

পঞ্চম অধ্যায়

খাদ্য ও পানীয় পদার্থ বিচার।

শস্ত্রাদি, শাকসব্জী এবং ফল মূল।

(GRAINS AND GREENS)

যে দ্রব্য আহাৰ করিলে সৰ্ব্ব জীৰ্ণ হইয়া যায়, তাহাই অজীর্ণ রোগীর পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য ; সুতরাং কোন্ কোন্ আহাৰ্য্য দ্রব্য—পানীয় অথবা ভোজ্য—সহজ পরিপাচ্য তাহা নির্দেশ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই জন্ত মধ্যাহ্ন ও রাত্রিকালীন ভোজন এবং প্রাতঃকালীন ও বৈকালিক জলযোগের সময়, কি কি দ্রব্য আহাৰ করা প্রয়োজন তাহা বর্ণনা করিবার পূর্বেই, আমাদের নিত্য আহাৰ্য্য দ্রব্যাদির পরিপাক সম্বন্ধীয় তথ্যসমূহ সৰ্ব্বদা কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে

করি। এই সমুদয় দ্রব্যাদির আলো-
চনায় সর্ব প্রথমেই ছন্ধের কথা আমা- নিতা আহাৰ্য্য দ্রব্যাদির
দের মনে পড়ে; ইহা পরিপোষণ গণ্যগণ।

(nutrition) পক্ষে পূর্ণ খাণ্ডের সমগুণ

বিশিষ্ট অথবা, কোন কোন স্থলে, তাহারও অধিক বল-
কারক ও পরিপোষক বলিয়া গণ্য হইলেও, উহা পানী-
য়ের অন্তর্গত হওয়ায় আমরা তাহার সহিতই উহার
আলোচনা করিব। ছন্ধের নিম্নেই আমাদের পক্ষে চাউল
(অন্ন) বিশেষ বলকারক এবং সর্বাপেক্ষা

সহজে ও অতি অল্প সময়ে পরিপোষিত অন্ন ও চাউল

হইয়া যায় বলিয়া কথিত। পৃথিবীর যাব-

তীয় অধিবাসীর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ প্রাণীর ইহাই প্রধান
আহার; “অন্নং বৈ প্রাণীণাং প্রাণা ইতি শ্রুতি নিদেশতঃ”

অর্থাৎ - অন্নই প্রাণীগণের প্রাণ, ইহা বেদে কথিত হই-
য়াছে; সুতরাং বিশিষ্টক—দোষবর্জিত ও বলবর্ধক অন্ন
ভোজন করা কর্তব্য। অন্ন হইতেই রস, রক্ত, মাংস, মেদ,

মজ্জা, অস্থি, ও শুক্র উৎপন্ন হইয়া থাকে; অন্নই বল, অন্নই

ওজঃ এবং অন্নই মন জানিবে। চাউলের মধ্যে খেতসারের

(starch) অংশই অধিক; ছানাঙ্গাতীয়, মাখনজাতীয়, এবং
লবণজাতীয় উপাদান অল্প পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। খেত-
সারের অংশ অধিক পরিমাণে থাকায়, ইহাতে শর্করাজাতীয়
উপাদানই খুব বেশী পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

আমাদের দেশে এই চাউল প্রধানতঃ দুই প্রকারে ব্যবহার

হইয়া থাকে (১) আতপ (২) সিদ্ধ ; খাণ্ড হইতে চাউল বাহির
করিবার সময়, যাহা সিদ্ধ করিয়া লইয়া বাহির করিতে হয়,
তাহাই সিদ্ধ এবং অসিদ্ধ অবস্থা হইতে সিদ্ধ ও আতপ

যাহা বাহির করা হয় তাহাই আতপ নামে

বিদিত। সিদ্ধ অপেক্ষা আতপ, গুরু, ক্লান্ত ও একটু অধিক
বলকারক ; সুতরাং পরিপাক হইতে বিলম্ব হয়। কতকটা এই
জন্মই আমাদের দেশের বিধবা, হবিষাষী অথবা একাহারী-
গণ এই আতপ চাউলের অল্পই ভোজন করিয়া থাকেন ; সিদ্ধ
চাউল অল্প পক্ষে, রসবর্দ্ধক, লঘু এবং সকল প্রকার খাণ্ড-
দ্রব্যাপেক্ষা স্বল্প সময়ে হজম হইয়া যায়, এমন কি সাণ্ড, বালি
বা এয়ারোটও হজম হইতে, ইহার অপেক্ষা অধিক সময় লাগে
দেখা গিয়াছে। এখানে একটা কথা উঠিতে পারে যে,
রোগে ইহা পথা না দিয়া সাণ্ড বালি দেওয়া হয় কেন ?
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইহা রসবর্দ্ধক এবং আমাদিগের
দেশে ইহা প্রধান খাণ্ড—দুই বেলারই—সুতরাং অসুস্থাবস্থায়
উহা আমাদিগের অনিষ্টকারক। শরীর অসুস্থ হইলে, যাহা
নিতা আহার করা যায়, তাহা পরিবর্তন করিয়া, হয় লজ্জণ

অথবা অল্প কোন লঘু পথা আহার করা প্রয়োজন। ভাতের

ফেণ, যাহা আমরা ফেলিয়া দেই, অতি-

শয় বলকারক ; কারণ চাউলের কাথই,

ভাতের ফেণ

(অর্থাৎ সিদ্ধ করিয়া উহার ভিতরের

রস পদার্থ যাহা নির্গত হয়) উহার পুষ্টিকর পদার্থ। ইতিহাস
পাঠে জানা যায় যে, ক্লাইব যখন দাক্ষিণাত্যের আর্কট নগরে

অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহার রসদ ফুরাইয়া আসায় এদেশী সিপাহীগণ শুদ্ধ ভাতের ফেণ খাইয়া, গোরা সৈন্তগণকে অল্প-গুলি ভোজন করিতে দিত; ঐ ভাতের ফেণ খাইয়াই তাহার জীবনধারণে ও এমন কি ছোট খাট বৃদ্ধ পর্যন্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আমাদের মনে আছে বাল্যকালে শুদ্ধ ফেণা ফেণা ভাত অর্থাৎ ফেণ সমেত ভাত খাইয়াই, আমরা মানুষ হইয়াছিলাম; অধুনাও পূর্ববঙ্গে প্রায় প্রতি-ঘরেই, ঐরূপ ফেণ সমেত ভাত খাওয়ার অভ্যাস বর্তমান আছে দেখা যায়। আমাদের এই দক্ষিণ বঙ্গের লোকের জায় ঐ দেশবাসীগণ, দোকানের তৈয়ারী “জলখাবার” রূপ বিব, পয়সা দিয়া কিনিয়া ডিম্পেসসিয়া অথবা অজীর্ণতা পোষণ করেন না!

একটু লবণ সংযোগে সফেণ ভাত, খাইতে অতিশয় উপাদেয় লাগে এবং কোন প্রকার তরকারী না হইলেও, শুদ্ধ দুটি একটি “ভাতে পোড়া” দিয়াও উহা খাইতে পারা যায়। পাক্তা অর্থাৎ বাসি ভাতের জল, বড়ই শীতল, মুখরোচক এবং শাস্তিহারক; কিঞ্চিৎ লেবু ও লবণ সহ সেবনে, প্রথর গ্রীষ্মের সময় প্রকৃতই ইহা আরাম দায়ক। অনভ্যস্তগণের কিন্তু উহা প্রতিনিয়ত খাওয়া উচিত নহে। ভিডা ভাতের জল
 টাটকা ভিডা ভাত অর্থাৎ ৩৪ ঘণ্টার
 হইলেও তাহা বিশেষ উপকারক; অগ্নিমান্দ্য অথবা কোন
কারণ বশতঃ “পেট গরম” হইয়া ৩৪ বার অজীর্ণ দান্ত হওয়ার
পরে (দান্ত বিশেষ আশঙ্কাজনক যদি না হয়) উদর খালি
বোধ করিলে, লেবুর রসের সহিত ইহা সেবনে ঔষধের কার্য
করে জানিবে।

চাউলে আবার নুতন ও পুরাতন

ভেদে গুণের তারতম্য হইয়া থাকে ; নুতন ও পুরাতন
নুতন বাস্তব্যাহ, গুরু ও কফজনক । চাউল
এক বৎসরের পুরাতন চাউল, লঘু
ও পখা—এই চাউলের গুরুত্ব নাশ হয় বটে কিন্তু বীৰ্য্য নষ্ট
হয় না । এই জন্ত রোগ হইতে উঠার পর, এবং অজীর্ণ রোগীর
পক্ষে, নুতন অপেক্ষা পুরাতন চাউলই প্রশস্ত । যে সকল

দান্তের চাউল হয়, তাহাই গোটা অব-
স্থায় ভাজিলে ফুটিয়া খই প্রশস্ত হয় ; খই চিড়া ও
ইহা মধুর, শীতল, লঘু, বলকারক এবং মূড়ি
ক্ষুধাবর্দ্ধক ও পিত্তনাশক । সুতরাং
রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারক ; হৃৎকের সহ গরম গরম ইহা
সেবনে দান্তও বেশ পরিষ্কার থাকে ; আমাদের মতে অজীর্ণ
রোগীকে এই প্রকার “খুখ-খই” সেবন করিতে দেওয়া উত্তম
ব্যবস্থা । পিত্তপ্রধান হওয়াতেই প্রায় স্থলে অজীর্ণ রোগের
উৎপত্তি হয় দেখা গিয়াছে এবং ইহার গুণও পিত্তনাশক,
কাজেই অজীর্ণ রোগীর পক্ষে ইহা আহার ও ঔষধ ।

বাস্তব্যে ভিজাইয়া একপে ভাজিয়া লওয়া দরকার যে উহা
যেন ফুটিয়া না যায়, তাহার পর উহা ফুটিয়া লইলেই চিড়া প্রশস্ত
হয় ; ইহা গুরু, বলকর ও বলরোধক । হৃৎকের সহিত সেবনে
ইহা অধিক পুষ্টিকর এবং বিশেষ পরিপাক হইয়া থাকে ;
অধিক সময় বাবৎ (১৫ অথবা ২ ঘণ্টা) জলে ভিজাইয়া
রাখিলে, ইহা সেবনে শরীর শীতল ও উদরের গরম তাব নষ্ট

হইতে দেখা গিয়াছে। আমরা আশায় রোগী মাত্রকেই এই প্রকার জলে ভিজান চিড়া, কিঞ্চিৎ লেবুর রস ও চিনি সহ খাইতে দিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি। অজীর্ণরোগীও যদি পর্যায় ক্রমে, খই এবং ইহা সেবন করিতে পারেন, আমাদের বিশ্বাস সহজেই তাহা হইলে রোগ বিদূরীত হইতে পারে। চাউল ভাজিয়া মুড়ি তৈয়ার করিতে হয়; খই এর জায় ইহাও লঘু বটে, কিন্তু খই অপেক্ষাকৃত অধিক লঘু; তৈল লবণ ও লব্ধা সংযোগে মুড়ি অতিশয় মুখরোচক হয় কিন্তু অতিশয় গুরুপাক হইয়া থাকে, একত্ৰ অজীর্ণ রোগাক্রান্তগণ ইহা এইভাবে কদাচ যেন সেবন না করেন। ডিম্পপটিকগণ যদি বাজারের চলিত খাবার দ্রব্যাদি না খাইয়া, শুদ্ধ মুড়ি খাওয়া অভ্যাস করেন, তাহা হইলে বোধ হয় অজীর্ণ রোগীর সংখ্যা মোটের উপর দুই তৃতীয়াংশ কম দেখা যাইতে পারে। মুড়ির আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহার ভিজান জল হিকায় বিশেষ উপকারী।

চাউলের পরই আটা বা ময়দা আমাদের

নিত্য আহাৰ্য্যের মধ্যে স্থান পাইয়া থাকে। ময়দা ও আটা এই বন্ধদেহ ইহা প্রধান খাদ্য না হইলেও, পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম এবং বিহার প্রদেশবাসীগণের ইহাই প্রধান খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে দেখা যায়। আজকাল আমাদের দেশেও—বিশেষতঃ সহরে—ইহা প্রায় সকলেরই একবেলাকার খাদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে দুইবেলা ভাত না খাইয়া, এক বেলা ভাত এবং অল্প বেলায় অর্ধাং

কুটি ও লুচি ।

১৩

রাজিতে আটা অথবা ময়দা দ্বারা প্রস্তুত কুটি অথবা লুচি বা পুরোটা প্রভৃতি খাইয়া থাকেন। ময়দা ও আটার বা যথেষ্ট ছাড়ুতে, ছানাজাতীয় ও শর্করাজাতীয় উপাদান অধিক, কিন্তু

বাধনজাতীয় পদার্থ অল্প থাকে। প্রধানতঃ আটা বা ময়দার গুণ এই যে, ইহা শুক্ক, রুক্ষ, কোষ্ঠবদ্ধকারক এবং তৃকা উৎপাদক। ইহা দ্বারা দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণের সময়, যেমন পরিমাণে ঘৃত সংযোগ করা বাইবে, সেই পরিমাণে ইহা আরও শুক্ক হইবে। দেখা গিয়াছে যে, অজীর্ণরোগী মাত্রেই, ময়দা দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি সহজে হজম হয় না, উপরন্তু উহাতে অল্প উৎপাদন করে—কিন্তু এমনও দেখা গিয়াছে যে কাহারও পক্ষে

কুটি সহ্য হয় এবং কাহারও বা লুচি স্নান হয়। তাহে গড়া

যেতদাৎ অর্থাৎ জন গম্ব জম্বৎ

উৎপাদন

বাৎসরিক ১০ পঞ্চা

মধ্যে যেতদাৎ দান গুল বৃত্তে তজ্জ

থাকে। ঠাণ্ডা বা বাস লুচি অপেক্ষে

রপতঃ ভাতই (পূরাতম চাউর)

এই রোগে পথ্য ব্যবহৃত হও

এখন দেখা যাউক আটা ও ময়দার

কোন প্রভেদ আছে কিনা? প্রধানতঃ দেখিতে গেলে উহা

একই বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ব্যবহারে উহাদের পরস্পর গুণের

বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। আটা বাহ্যতঃ ময়দা অপেক্ষা

একটু মোটা ও ময়দা দেখায়, কিন্তু উহা বড়ই বোলায়েন

এবং কোষ্টপরিষ্কারক। এই আটা যদি আবার হস্ত দ্বারা
 বাতায় ভাজা হয়, তাহা হইলে অধিক
 গুণবিশিষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। বাতায় ভাজা
 কোষ্টবদ্ধ স্বভাবাবিহীন ব্যক্তিগণের প্রত্যেক-

কেরই কর্তব্য যে (যদি রুটি ইত্যাদি খাওয়াই অভ্যাস হয়) এই
বাতায় ভাজা আটা ব্যবহার করা। কলে প্রস্তুত সাদা ধবধবে

ময়দা ছাড়িয়া, ইহা অপেক্ষাকৃত ময়লা

বলিয়া হয়ত আপনার প্রথমে খাইতে আটা ও কোষ্টবদ্ধতা

অনিচ্ছা হইবে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস

১০।১৫ দিনের মধ্যেই ইহার উপকারীতা স্বয়ং অনুভব করিলে
 আর ইহার উপর বৃণা থাকিবে না। অনেকে কোষ্টবদ্ধতার
 বিরূপ জন্ত, গমের ভূষির রুটি প্রস্তুত করিয়া, আহার করিয়া
 থাকেন দেখা গিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই হয়ত অবগত
 নহেন যে, “পালোট” বলিয়া ময়দা হইতেই উৎপন্ন এক প্রকার
 জিনিষ পাওয়া যায়। ময়দার কলওয়লাগণের নিকট হইতে
 উহা লইতে পারিলেই ভাল হয়, নতুবা বাজারে হয়ত ঠিক সে
 জিনিষ পাওয়া না যাইতেও পারে। এই পালোট ও বাতায়
 ভাজা আটা—সম পরিমাণ লইয়া, তাহার দ্বারা প্রস্তুত রুটি
 অভিশয় বোলায়েম এবং কোষ্টওদ্ধিকারক বলিয়া জানিবে।

আমরা শুধুই এদেশী আহারীয় দ্রব্যাদির কথা বলিয়া বাই-
 তেছি, কিন্তু আজকাল সময় উপযোগী যে
 সকল বিলাতী খাদ্যদ্রব্য চলতি হইয়া পাটরুটি ও কেক
 বিক্রীতে, বধা সত্ত্বে তাহারও আলোচনা

করা- কর্তব্য বলিয়া এখানে তাহার অবতারণা করা গেল।
বিলাতী সমুদয় খাদ্য দ্রব্যাদিই প্রায় ময়লা হইতে প্রস্তুত এবং
আমাদের অন্ন যেমন প্রধান খাদ্যাহার, সেইরূপ এই ময়লাই

তাহাদিগের প্রধান খাদ্য দ্রব্য। বিলাতী সমুদয় খাদ্যদ্রব্যাদি
প্রায়ই ডিবাতি ও চর্কি সংযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে, কাজেই তাহা
সমুদয়ই অতিশয় গুরুপাক জানিবে। পাউরোটি, টাটকা অপেক্ষা
বাসি হইলেই তাহা সহজে পরিপাক হয়। এই রোটি বড়
হালুকা এবং (porous) স্বচ্ছিন্ন হইবে, ততই ভাল হয়।
রোটি প্রস্তুত সময় যাহাতে (fermentation) পাক লান
উপযুক্ত মত হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই প্রকারে
প্রস্তুত পাউরোটি বেশ সহজে হজম হইয়া থাকে। সাধারণতঃ
দেশীয় পাউরোটি প্রস্তুতকারকগণ, অশিক্ষিত হওয়ায়, এদিকে
তেমন দৃষ্টি রাখে না, সুতরাং তাহাদের দোকানের রোটি বিশ্বাস
করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া কর্তব্য নহে। রোগীর জন্য
বিলাতী দোকানের দ্রব্য লইয়া আসাই

কর্তব্য। যদি তোমার পাউরোটি উত্তম টোষ্ট করা রোটি
প্রকারের বলিয়া বোধ না হয়, তাহা হইলে উহা টোষ্ট toast
অর্থাৎ অগ্নিতে, দ্বত বা মাখন মাখাইয়া, উত্তপ্ত করিয়া লইবে এবং
ধীরে ধীরে ভোজন করিবে। বাসি ও টোষ্ট করা রোটি উত্তমই
ওক, সুতরাং একটু অধিক সময় চর্কণ করা প্রয়োজন হইয়া থাকে
বলিয়া, উহা পাকায়ের উপস্থিত হইবার পূর্বেই লালাত্রাবের
সহ উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া যায়। এই ভাজি (পর্দ্যান্ত সময়
লালাত্রাব সহ সংস্কৃত থাকায়) উহা সহজে ভাঙার পরিপাক

ইহবার সুবিধা লাভ করিয়া থাকে। বাঁহারা এই বিলাতী
খাদ্যাদির অতিরিক্ত পক্ষাপাতী, তাঁহা-

দিগের উদ্দেশে এখানে আমরা ২১টি সাবধানতা

কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমরা

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই সমুদয় দ্রব্যাদি অতিশয় গুরুপাক
এবং স্বতন্ত্রভাবে অথবা মাখনাদি সংযোগেও উহারা নিজে নিজে
প্রধান আবাহ্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। উহাদের দ্বারা

কার্বণ (carbon) পর্যাপ্তরূপে আমাদের শরীর মধ্যে গৃহীত
হয়, কিন্তু নাইট্রোজেন (nitrogen) অতি সামান্য মাত্রাতেই
পাওয়া যায় ; অথচ এই দুইটিই পর্যাপ্ত পাওয়া আমাদের
নিত্য প্রয়োজন * । ইহাদের নিকট হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে

“নাইট্রোজেন” নইতে হইলে, অতিরিক্ত মাত্রায় ঐ সব খাদ্যাদি
ভোজন করিতে হয়, সুতরাং কার্বণও অত্যধিক মাত্রায় গ্রহণ
করিতে বাধ্য হইতে হয়। এই প্রকারে প্রত্যহ কার্বোহাই-
ড্রেটস্ (carbohydrates) ভোজন করিতে হইলে (কেঙ্ক
প্রভৃতি দ্বারা) লালাত্রাবীয় পরিপাক শক্তির উপর বড়ই চাপ

দেওয়া হয় এবং ঐ খাদ্যাদির গুরুত্ব ও গাঁজলান (fermen-
tation) ইহবার প্রবণতা জন্ম, পাকায়কেও অতিরিক্ত ভাবে

ত করা হয়। এই সব খাদ্যাদি কালে ভয়ে ২১ দিন
সেবনে সুস্থব্যক্তির পক্ষে কোনই অপকার ঘর্শে না, কিন্তু যদি
প্রত্যহ খাইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারাও অর্থাৎ সুস্থব্যক্তি-
গণও অচিরে ইহার বিষমর কল ভোগ করিয়া থাকেন। যখন

* কার্বণ, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার ইত্যাদি রাসায়নিক দ্বারা
সম্পাদিত সমস্ত বিশেষ বিবরণ পরে (অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে) দ্রষ্টব্য ।

সুদৃশরীরীগণেরই এই পরিণাম, একদ্বীপীকৃত্যগণের পক্ষে
ঐ সকল যে প্রকৃতই খাড়াঁকারে বিব, তাহা বোধ হয় আর
বলিয়া দিতে হইবেনা।

আটা বা ময়দা অপেক্ষা সুজি বহু ভারবুক্ষ এবং সমান বল-
কারক বটে, কিন্তু ইহা অল্প উৎপাদক ;

সেই অল্প ডিম্বেপ্টিকগণের পক্ষে ইহা হুজি

দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি তেমন উপ-

কারক নহে। বলা বাহুল্য যে ইহা দ্বারা তৈয়ারী খাদ্যদ্রব্যাদি
সমৃদ্ধই বৃত্ত সংযুক্ত, সুতরাং উহা যে গুরুভার হইবে তাহার
আর আশ্চর্য্য কি ! তবে অধিক সময় যাবৎ জলে সুজি ভিজাইয়া

রাখিয়া, তৎপরে উহা দ্বারা দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিলে অপেক্ষাকৃত
সহজ পরিপাচ্য হইয়া থাকে। পেটের অসুখাদি না থাকিলে,

কোন কোন পীড়ার আরোগ্যাবস্থায়, শুদ্ধমাত্র জলে মিশ্র করিয়া
অথবা ইহা দ্বারা রুটি তৈয়ার করা ইয়া, পথ্যরূপে ব্যব-

হার করা হইয়া থাকে। জনসাধারণের ভক্ত, (প্রাতঃ-
কালীন বা বৈকালিক) ইহা দ্বারা প্রস্তুত মোহনভোগাদি

(সক্ষম লোকদিগের পক্ষে) বড়ই সুখপ্রিয় এবং উপাদেয় বলিয়া
জানিবে। বাহাদিগের অজীর্ণতাদোষ নাই, অথচ স্বাস্থ্য বেশ ভাল

আছে, তাহাদিগকে আমরা এই উপদেশ দিতে পারি যে, বাজারে
প্রস্তুত সুখরোচক অখাদ্যাদি সেবন করিয়া, নানাবিধ রোগে

আবাসস্থল না হইয়া, অবস্থানকারী ব্যবস্থা দ্বারা সুজির খাদ্যাদি
যেরে তৈয়ার করা ইয়া খাওয়াই কর্তব্য।

চাউলের পরই ডাইল আমাদিগের নিত্য আবশ্যকীয় খাদ্য-

দ্রব্য ; তাহের সহ্য যে কোন প্রকার ডাইল হইলেই এক-
প্রকার খাওয়া চলিয়া যাইতে পারে, অল্প কোন তরীতর-
কারী না থাকিলেও বিশেষ কষ্ট বোধ হয় না। ডাইলে
ছানাভাতীয় ও শর্করাভাতীয় উপাদান অধিক, কিন্তু লবণ ও
মাখনভাতীয় পদার্থ অল্প থাকে। ইহাতে ছানাভাতীয় পদার্থ
এত অধিক যে, মৎস্ত ও মাংস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য।

এই অল্প নিরামিষভোজীর পক্ষে যথা পরিমাণ ডাইলের ব্যবহার
সর্বদা অবশ্য কর্তব্য। সমুদয় প্রকারের

ডাইল সমগুণবিশিষ্ট নহে, সুতরাং ডাইল

সকলের প্রকৃতিতে সকল সময় সর্বপ্রকার ডাইল সহ্য হয় না।

ডাইলের মধ্যে মুগের ডাইলই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব-
প্রকৃতির লোকের পক্ষে সমান উপযোগী। ইহা লঘু, মীতল,
স্বাদু এবং জরায়ু ; শুক্রাতের মতে হরিৎ অর্থাৎ সোণামুগই
সর্বোৎকৃষ্ট। ইহার বুন করিয়া রোগীকে পথ্যও দেওয়া চলিতে
পারে। রোগীর পথ্যকালে, উহা অধিক মশলা সংযুক্ত যাহাতে না
হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। এই প্রকার বুন করিতে
শুষ্ক মাত্র হলুদ এবং জীরা ও পাঁচফোড়ন, সামান্য মাত্র দিলেই
চলিতে পারে। মুগ ভাজিয়া তবে ডাইল প্রস্তুত হয় ; না
ভাজিয়াও বুন আবাদিগের ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে। কাঁচা
মুগ ভিজাইয়া, তাহার খোসা ছাড়াইলে অতি দ্রিক জলখাবার
হইতে পারে। এই প্রকার বুন অতিশয় মীতল ও কুণ্ঠিত
ওক হইয়া থাকে। রেয়া প্রধান ব্যক্তিগণের ইহা সেবন করা
নহে।

মুগের পরই কলায় আমাদিগের নিকট শ্রেষ্ঠ আসন পাইয়া থাকে। রাঢ় প্রদেশেই ইহার চলন অত্যধিক দেখা যায় ; ইহা শীতল, গুরু, স্নেয়াবর্ধক ও মলরোধনাশক। স্নেহ ও জীর্ণকম ব্যক্তিগণেরই ইহা ব্যবহার করা কর্তব্য। কলায় ডাইল সাহায্যে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্যাদি আমরা প্রস্তুত করিয়া থাকি। ইহা দ্বারা প্রস্তুতীত সমুদয় দ্রব্যাদিই গুরুপাকের হইয়া থাকে। অজীর্ণ-রোগী এবং কোন প্রকার রোগ হইতে আরোগ্য-মুখ কাহারও ইহা সেবন করা কর্তব্য নহে।

মসূর :—ত্রিদোষনাশক বলিয়াই আমূর্ষেদ-শাস্ত্রে কথিত আছে। ইহা সহজ পরিপাচ্য, লঘু, রক্তদোষ-নাশক এবং অরুচি ; এই জন্যই অনেক সময় অরে পথ্য রূপে ইহারও বৃদ্ধ ব্যবহার হইয়া থাকে ; উদরাময় প্রবণতা ও পেট-কাঁপা বর্ত্তমানে, ইহার ব্যবহার আরও যুক্তিসূক্ত জানিবো। মসূরের ডাইলে ছানাজাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে আছে এবং বেসারী ব্যতীত সকল ডাইল অপেক্ষা ইহা অধিক সার-বান। ছানাজাতীয় উপাদান অধিক থাকাতাই ইহা মাংসের জায় বলকারক এবং সেইজন্য প্রায় আমিষ বলিয়া গণ্য হওয়ায় হিন্দু বিধবার পক্ষে ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ রহিয়াছে।

অড়হর :—কষায়, মধুর, শীতল, লঘু, বর্ণকারক ও বায় ও পিত্ত নাশক এবং রক্তদোষ নাশক বলিয়া খ্যাত ; ইহা প্রত্যহ সেবন করা উচিত নহে এবং যাহাতে সুসিদ্ধ হইয়া যায়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য।

ছোলা :—গুরু অথবা তৈলেক সহিত ভাজিলে রুক্ষ,

কষায় ও বায়ুজনক হইয়া থাকে; তিজাইয়া তাজিলে বলকারক ও রোচক হয়; সিদ্ধ ছোলা কৃষ্ণপিত্তনাশক; তিজা ছোলা অতি মরম, রোচক, লঘু, পিত্তনাশক এবং শীতল কিন্তু বায়ুবর্জক জানিবে। প্রত্যহ প্রাতে কিঞ্চিৎ লবণ ও আদা সংযোগে, এক মুঠা ছোলা তিজা খাওয়া অভ্যাস করিলে, দৈহিক পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া, শরীরে বলসঞ্চার হইয়া থাকে। ছোলার ডাইল একটু অধিক সিদ্ধ করা প্রয়োজন, নতুবা উহা সহজে হজম হয় না জানিবে।

মটর :—মুঠি অবস্থায় কচি হইলে বড়ই মূখরোচক, মধুর ও শীতল; এই কচি মটর, কাঁচা অথবা তাজা (তৈল বা ঘূতে) বড়ই উপাদেয় খাদ্য, কিন্তু অধিক মাত্রায় খাইলে ঔদরিক বীড়াপি জন্মাইতে পারে; মটর ডাইল খাইতে মন্দ নহে, কিন্তু গুরুপাক; এইজন্য হবিষ্যায় সহিত ইহার সেবন বাবস্থা দেখা যায়।

ধেঁসারী :—অতিশয় কৃষ্ণ, কষায়, তিক্ত, কফ-পিত্তনাশক এবং রোচক; ইহা অতিশয় বায়ু প্রকোপক বলিয়া অধিক দিবস ব্যবৎ খাওয়া কর্তব্য নহে, কারণ পক্ষাঘাত অথবা খজাদি হইবার সম্ভাবনা; পশ্চিমবঙ্গে ইহার প্রচলন ভেমন দেখা যায় না, কিন্তু পূর্ববঙ্গে সমধিকভাবেই প্রচলিত দেখা যায়।

আমরা মোটামুটি ভাবে সমুদয় ডাইল সম্বন্ধেই কথা-আলোচনা এখানে করিলাম এবং সুস্থদেহী যাত্রেই

ইহা অল্পব্যয়ী চলিতে পারেন। কিন্তু
অজীর্ণরোগীর জন্ত কিছু পৃথক ব্যবস্থা
করিতে ইচ্ছা করি ; জীর্ণাক্ষম ব্যক্তি,
মুগ ও মুসুর ডাইলের উপরই অধিক

ডাইল ব্যবহারে

সাধ্যমানতা

নির্ভর করিবেন, কদাচিত্ কলায় এবং অড়হরও খাইতে
পারেন, কিন্তু ছোলা, মটর প্রভৃতির দিক দিয়াও যেন তাঁহার।
না যান ! আর একটি কথা,—কোন এক প্রকার ডাইলই
নিত্য ভোজন করা উচিত্ নহে ; প্রকৃতি স্বয়ং যখন আমা-
দের জন্ত একজাতীয় দ্রব্যই নানাতাবে সৃজন করিয়াছেন,
তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, নিত্য একই প্রকার ভোজন
প্রকৃতির বাঞ্ছনীয় নহে, সুতরাং স্বাস্থ্যেরও অক্ষুণ্ণ নহে।

চাউল এবং ডাইল হইল ভারতবাসীর, [বিশেষতঃ বাঙ্গা-
লীর] প্রধান আহাৰ্য্য পদার্থ ; শুদ্ধ ভারতবাসীরই বা কেন,
এক প্রকার সমুদয় এসিয়াবাসীরই ইহা

প্রধান খাদ্য। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন

তাঃ ও ডালে শরীর

যে, ভাত, ডাইল খাইয়া খাইয়াই

দুর্বল করে।

ভারতবাসীর ক্রমশঃ দুর্বল ও নিস্তেজ

হইয়া পড়িতেছেন। এ সব যুক্তি যে কতদূর ভ্রমাত্মক তাহা

সহজেই অনুমেয়, কারণ জগতের মধ্যে আধুনিক ক্রমভাষ্যসী
পাশ্চাত্য বীরাগ্রগন্তগণেরও সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত জাপানীরা এই ভাতই

নিত্য আহাৰ্য্য করিয়া থাকে ; কই তাহারা ত দুর্বল ও
নিস্তেজ নহে !! চির পরাধীন জাতি ক্রমে স্বাধীন হই-
য়াই থাকে, সুতরাং তাহাদের দুর্বলতা ও নিস্তেজতাব দেখিয়া

অজীর্ণতা ।

আবহমান কাল হইতে ব্যবহৃত তাহাদের আহারীয় দ্রব্যাদির উপর দোষারোপ করা প্রকৃত জ্ঞানবানের কার্য্য নহে !! যদি পূর্ব্বের জ্ঞান বাকালী ছই বেলা, ছই ঘুটি পেট ভরিয়া খাইতে পায়, তাহা হইলেই দেখিবে যে এই বাকালীই পূর্ব্বের জ্ঞান শৌর্য্যবীৰ্য্যশালী হইতে পারে। ইহা

বোধ হয় কাহারও অবিদিত নহে যে, খাদ্যাতাবহ
এই ডাল ভাত খাইয়াই বাকালী দুৰ্দ্ধলতা কারণ।

প্রতাপাদিত্যের নেতৃবাহীনে সমুদয়
মোগলবাহিনীকে তুচ্ছ করিতে সক্ষম হইয়াছিল ! বাকালীর
দুৰ্দ্ধলতা ও ভীকৃতার জগু তাহাদিগের চিরন্তন আহার, ডাইল
ভাতের দোষ ধাহারা দিয়া থাকেন তাহারা নিশ্চয়ই অবিবেচক।
পূর্ব্ব বাকালী—ভারতবাসী মাত্রেই—সন্ধ্যাসে ছইবেলা পরি-
তোষরূপে আহার করিতে পাইত, এখন নিত্য দুঃখিত দেশে
বিরাজিত থাকায়, এ দেশের কয়জন অধিবাসী প্রাণ ভরিয়া
খাইতে পায় ? উপযুক্ত আহার না পাইলে মাঃসপেশী সকল
কেমন করিয়া স্বেচ্ছা হইবে ? ইহার উপর “ম্যালেরিয়া” এবং

“অজীর্ণতা” দুইটি করাল ব্যাধি লাগি-

য়াই আছে !! যদিও শেবোক্ত অজী- ম্যালেরিয়া ও

র্ণতা ব্যাধিটি কতকটা আমরা নিজেয়া অজীর্ণতা

অজ্ঞতাশ্রয়িত আনয়ন করিয়া থাকি ;

তথাপি ইহা নিশ্চয় যে রোগশোকে প্রসীড়িত, চিকিৎসার
অব্যবস্থিত, ভয়ঙ্করী অসুস্থতার সম্ভাব্যতাবিশিষ্ট পরিপ্রসঙ্গ করিতে

হওয়া এবং তদুপরি পেট ভরিয়া খাইতে না পাওয়াই

এদেশ বাসীর শারীরিক ও নৈতিক দুর্বলতার প্রকৃত কারণ!!!

শুধু ভাত ও ডাইল হইলেই আমাদের আহার সম্পূর্ণ এবং তৃপ্তিকরক হয় না, কাজেই উহা তৃপ্তিকর করিবার জন্য, অল্প কতকগুলি উপকরণের প্রয়োজন ; এই উপকরণগুলি যে একান্তই তরী তরকারী প্রয়োজন তাহাও নহে । স্বচ্ছন্দসুখাহারী, সদা পরিশ্রমী, কৃষাণ ও তদবস্থাপন্ন লোকদিগের এই উপকরণ না থাকিলেও চলিতে পারে। ডাইল ও ভাতই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট, যদি কোন দিন কিছু উপকরণ ছুটে ভালই, না ছুটে তাহাতেই বা কি ! একটু লবণ ও তেঁতুল পাইলেও হইতে পারে। কিন্তু ঔষাদিগের পয়সা আছে অর্থাৎ “বড়-লোক” বলিয়া ধ্যাতি আছে, ঔষাদিগের আহারের জন্য নানা উপকরণ “পঞ্চাশ বাগান” চাইই চাই !! নতুবা তাঁহার আহার সম্পূর্ণ হইবে না। এই কথা বলায় যেন কেহ মনে না করেন, যে আমার মতে ডাইল ও ভাত ব্যতীত অল্প উপকরণের দরকার নাই। প্রকৃতির লীলা নিকেতন, আমাদের এই ভারতভূমী সদাই ফলফুলে বিকশিতা ; বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন শাকসব্জী ও ফলমূলের ডালি লইয়া স্বয়ং আমাদের সম্মুখে হস্তাননে দাঁড়াইতেছেন, আর আমরা তাহা লইয়া, উপভোগ করিব না ! যে দেশে বাহা প্রচুর জন্মে, সেই দেশবাসীর যে তাহাই উপভোগ্য ইহা ত সহজেই অনুমের। তবে ও কথার অব-
তারণা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহা যাত্রায় অধিকতর

খাওয়া কর্তব্য নহে ! আমাদের মতে এই উপকরণগুলি প্রত্যহ এক প্রকারের না করাইয়া, এটা এটা করিয়া কুচিতেদে (কতকটা কুচি করিবার জন্তও বটে) পৃথক পৃথক বস্তু আহার করা প্রয়োজন । একেবারে অধিক উপকরণ ভোজনের বিরুদ্ধবাদী হইবার উদ্দেশ্য কি, বোধ হয় অনেকে জানিতে চাহিবেন । তাহার উত্তরে আমরা এই বলিতে পারি যে, এই সমুদয় তরী তরীকারী সহজে হজম হয় না ।

আমরা পূর্বে একস্থানে বলিয়া আসিয়াছি যে, পরিপাক-ক্রিয়া সহজে সম্পন্ন হওয়াইবার পক্ষে, রসনার তৃপ্তিকর ভোজ্যদ্রব্য আহার করা কর্তব্য ও এই জন্তই সুরক্ষনের বিশেষ আবশ্যক ।

কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, যত ইচ্ছা বাসনা তৃপ্তিকর দ্রব্যাদি পাকস্থলীতে চাপাইয়া দিলেও, উহা সহজেই হজম হইয়া যাইবে । ২।১টি কুচিকর উপকরণ থাকিলেই, আহার কার্য বেশ সুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে এবং নিয়মিত ভাবে এই রূপেই আহার করা কর্তব্য ।

এই উপকরণ বা তরী তরীকারীতে লবণ জাতীয় উপাদান অধিক থাকে । ইহার মধ্যে আবার সিম, মটরশুটি, বরবটি প্রভৃতি শুটি জাতীয় পদার্থ অধিক পুষ্টিকর, কারণ উহাতে ছানা জাতীয়

উপাদান অধিক বিদ্যমান আছে । সাধারণতঃ তরী তরীকারী বলিতে আমরা শাক, মূল ও ফলাদি বুঝিয়া থাকি । আর-
কেন্দীর মতে শাক সমুদয় রোগের
আকর বলিয়া কথিত থাকায়, উহা

ভোজন নিবিদ্ধ বলিয়া

বিধিবদ্ধ আছে। সমুদ্র প্রকার শাকই সাধারণতঃ গুরু, রুক্ষ, বহু বলজনক এবং পুরীষ ও বায়ু নিঃসারক। বাহাদির অজীর্ণতা দোষ বর্জনীয় আছে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা না খাওয়াই কর্তব্য। যদিই খাইতে লেগে ইচ্ছা করে, তবে যে যে শাক বায়ু ও পিত্তনাশ করে, তাহাই মধ্যে মধ্যে ভোজন করিতে পারেন—কিন্তু তাহাও স্বর মাত্রায় জানিবে।

নিম্নে শাকাদির গুণ বর্ণা সম্ভব বর্ণিত হইল :—

পুঁইশাক :—পুষ্টিকর, তৃপ্তিকারক, রোচক, পথ্য, বায়ুপিত্তনাশক, নিদ্রাকারক, শীতল ও স্নিগ্ধ ; কিন্তু শ্লেষ্মা-জনক বলিয়া বাহাদিগের ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, তাহাদিগের আহার করা উচিত নহে। লুটেশাক :—রক্তদোষ নিবারক, বলমূত্র নিঃসারক, রোচক, অগ্নিকারক, পিত্তশ্লেষ্মানাশক এবং লঘু ও শীতল। কাঁটানটে :—ইহা প্রকার লাল ও সাদা ; সাদা অপেক্ষা লাল স্বর দোষকারক ও তেমন গুরু নহে ; উভয়ই শ্লেষ্মা-জনক, কিন্তু সাদা কাঁটানটে পিত্তনাশক। কলমীশাক :—স্তনে দুষ্কোৎপাদক, মধুর ও শুক্রজনক। চুকাপালঙ্গ :—অতিশয় অন্ন, স্নেহাচ্ছ, বায়ুনাশক কিন্তু পিত্তকারক ; রুচ্য এবং অতিশয় লঘু। পালঙ্গশাক :—বায়ুজনক, গুরু, কফবর্ধক এবং ভেদক। শ্বেত পুনর্ণবা :—ঈষৎ কষায়, অতিশয় অগ্নিকারক, বায়ুনাশক। বরুতের গোলযোগ, বায়ুরক্তি, শূল, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের পক্ষে ইহা আহার ও ঔষধ। লাল পুনর্ণবা :—বায়ুজনক, লঘু, ও শীতল এবং রক্তপিত্ত শাস্তিকারক।

নিমপাতা :—চক্ষুর উপকারক, ক্রিমিনাশক, পিত্ত-
নাশক, অরুচিনাশক কিন্তু বায়ুজনক ; নিমপাতা ভাজা অথবা
শুক্ল করিয়া খাওয়ায় শরীরে রক্তদোষ বিদূরিত হইয়া থাকে ।

পাটশাক :—(তিক্ত) নালতা শাক বায়ুজনক কিন্তু
রুচিকারক ; বলকর, অরুণশক্তিবর্ধক, শীতল ও ক্রিমি
প্রশমক । পাটশাক :—(মিষ্ট) বায়ু প্রকোপক, রক্তপিত্ত
নাশক । হিঞ্চাশাক :—পিত্তনাশক । অজীর্ণ রোগীর পক্ষে ইহা
বিশেষ উপকারী । কাহারও কাহারও মতে প্রত্যহ প্রাতে
কাঁচা ছুঙ্ক ও হিঞ্চাশাকের রস পান করিলে, অজীর্ণতাদোষ দূর
হইয়া থাকে । শুশুনিশাক :—ত্রিদোষঘ্ন, লঘু, রোচক,
শীতল, অগ্নিবর্ধক, এবং বৃষ্য ।

মূলার শাক :—পাচক, লঘু, রোচক, এবং তৈলের সহ
সঙ্গ হইলে ত্রিদোষনাশক হইয়া থাকে । পটলের পাতা :—
অগ্নিকারক, পিত্তনাশক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, ক্রিমিনাশক,
ও শুক্রজনক । অজীর্ণরোগীর পক্ষে ইহা আহার ও ঔষধ
জানিবে । কচি আমের পাতা, রুচিকারক, পিত্ত ও স্নেহানাশক ।

ছেলার শাক :—সহজে জীর্ণ হয় না, কিন্তু লঘু, পিত্ত নাশক
ও দস্তশোধ নিবারক । মটরশাক :—ত্রিদোষনাশক, তিক্ত, লঘু,
ভেদক । গন্ধভাদালিয়া :—বলকারক, বায়ুনাশক, তিক্ত ও
কফনাশক ; উদরাময় প্রভৃতি পীড়ায় এবং অরুণরোগীকেও ইহার
কোল খাইতে দেওয়া যাইতে পারে ; বিশেষতঃ উদরাময়প্রবণতা
বর্জ্যানে ইহার সুব্যবহার দেখা যায় ।

উপযুক্ত শাকাদির কেবলমাত্র শুষ্ক ব্যবহৃত হইয়া থাকে

কলিয়া উহাদিগকে পত্রশাক বলিয়া থাকে । সুচরাচর আমরা পত্র-
শাকের মধ্যে এই কলি ব্যবহার করিয়া থাকি । যাহাদের মাত্র
ফুলই ব্যবহৃত হয়, এইবার তাহাদিগের বিষয় আলোচিত
হইতেছে :—

বকফুল :—বায়ু ও পিত্তনাশক, রাত্রীজ্বনিবারক, পালা-
জ্বর নিবারক, শীতল, তিক্ত ও কষায় ফুলকপি :—অতি
সহজেই হজম হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা কাঁচা অবস্থায় খাওয়া
কর্তব্য নহে ; রন্ধন দ্বারা উহা রসনার বড়ই তৃপ্তিকর হইয়া
থাকে । ইহা শীতল, লঘু, রোচক এবং মধুর । **বাঁদা** কপি :—
টাটকা ও কচি অবস্থায় সম্ভবমত সকলেই খাইতে পারেন,
কিন্তু ইহার ব্যবহারে অজীর্ণরোগীর কতকটা সংযত ভাব ধারণ
করা কর্তব্য, কারণ ইহা গুরুপাক । **গুলকপি** :—কোমল,
মধুর, শীতল এবং লঘু । **মোচা** :—বায়ু, পিত্ত এবং বহুমাত্র
উপশমকারক ; বলকারক, শীতল, গুরু, তিক্ত এবং মধুর ।
মাজিনার ফুল :—বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপনাশক, লঘু,
রোচক, ক্রিমির এবং শ্বাসশোধ, প্রীতি ও শুষ্করোগ দমন করে ।
ইহা চক্ষের পক্ষেও স্বাস্থ্যকর ।

যে সকল শাকের ফল ব্যবহৃত হয় এইবার তাহাদের বর্ণনা
করা যাইতেছে :—

কুমড়া :—(দেশী) পুষ্টিকারক, গুরু, বায়ুনাশক । কচি
অবস্থায় ইহা শীতল, পিত্তনাশক ও অগ্নিকারক, সুতরাং সকলেই
খাইতে পারেন, কিন্তু আধপাকা কিংবা পাকা অবস্থায় উহার
ব্যবহার কম করা কর্তব্য । আমাদের দেশে এই দেশী পাকা
কুমড়ার বিচি ও শাঁস সহ, ডাল বাটা মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার

বড়ি প্রস্তুত করা হয়। ইহা খাইতে বেশ সুস্বাদু ও মুখরোচক হয় বটে, কিন্তু গুরুপাক হইয়া থাকে। অঙ্গীর্ণদোষাক্রান্ত ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা যতই মুখপ্রিয় হউক না কেন, উপকারী নহে জানিবে। কুমড়া :—(বিলাতী) গুরু, স্বাদু এবং পিত্ত ও অক্ষুধাজনক ; কতকটা বায়ুপ্রকোপকও বটে, কিন্তু স্নেহানাহক। লাউ :—রুচিকর, ষাণ্ডুপোষক, পুষ্টিকর এবং পিত্ত ও স্নেহানাহক, কিন্তু সহজ পরিপাচ্য নহে। কচি হইলে ইহা সহজ পরিপাচ্য হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ইহা কলেরার পক্ষে এক প্রকার প্রতিবেশকরূপে কার্য্য করিয়া থাকে।

কাঁকুড় :—কাঁচা অবস্থায় শীতল, মধুর, রোচক, পিত্তনাশক, কিন্তু গুরু বলিয়া কথিত ; উহা পাকা অবস্থায় ষাওয়া উচিত নহে, কারণ তখন ইহা পিত্ত ও অগ্নিবর্ধন করে, অপিত্ত তৃষ্ণাও বাড়াইয়া দেয়। চিচিঙ্গা :—বলকারক, বায়ুপিত্তনাশক, রুচিকারক ও পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। শোধরোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারক। পটোলের সহ ইহা প্রায় তুল্য গুণায়ক। উচ্ছা :—বড় জাতীয় হইলে তাহাকে করোলা বলে এবং ক্ষুদ্রজাতীয় হইলে শুধুই উচ্ছা কহিয়া থাকে। করোলা, শীতল, লঘু, ভেদক, তিক্ত ও বায়ুর শমতাকারক এবং পিত্তনাশক ; উচ্ছাতে উপরোক্ত সমুদয় গুণই বিরাজিত, অথচ ইহা লঘু ও ক্ষুধাবর্ধক।

ঝিঙ্গা :—শীতল, মধুর, আন্নানাহক ও বহুবৃত্ত নিবারক, শিথিলক ও অগ্নিবর্ধক। ঘোঁড়াল :—বায়ুনাশক। পটোল :—

লবু, ক্ষুধাবর্দ্ধক, বিষ্ক, পাচক, তৃপ্তিকারক। ইহা ক্রিমি ও ত্রিষোণনাশক। ইহার মূল উৎকৃষ্ট বিরেচক।

সিম :—(সাদা) বায়ু ও পিত্তনাশক, বলকারক, গুরু এবং পাকে ও আত্মদে মধুর। কৃষ্ণসিম বায়ুনাশক বটে, কিন্তু অক্ষুধা-জনক, মলরোধক, গুরু, পিত্তবর্দ্ধক, এবং ক্রচিপ্রদ।

সর্জিনার ডাঁটা :—পিত্তলেগ্নানাশক ও অতিশয় অগ্নি-দীপ্তিকারক ; ইহা কচি অবস্থাতেই খাইতে ভাল এবং সহজেই জীর্ণ হইয়া যায়, পাকা এবং শক্ত হইয়া গেলে আর সেরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে।

বেগুন :—বায়ুনাশক, ক্ষুধাবর্দ্ধক এবং লবু ; কচি বেগুন খাওয়ায় কফ ও পিত্তনাশ হয় ; পাকা অবস্থায় উহা পিত্তকারক, লবু ; বেগুন পোড়া খাইতে সুস্বাদু, অতিশয় লবু এবং বায়ু ও আমনাশক হয় বটে, কিন্তু কিকিৎ পিত্তকারক হইয়া থাকে জানিবে। লবণ ও তৈল এবং লব্ধার সংযোগে এই বেগুন পোড়া গুরুপাক হয়, অজীর্ণরোগীরা যেন ইহা মনে রাখেন।

টেঁড়োশ :—কচিকারক এবং কফপিত্তনাশক। কাঁক-

ডোল :—অগ্নিদীপ্তিকারক এবং অকচি নিবারণ করে। •

গুল :—রোচক, লবু, ক্ষুধাবর্দ্ধক, কৃষ্ণ এবং গ্ৰীহা নাশক ; ইহা অর্শকোপের পক্ষে বিশেষতঃ, অতিশয় সুপথ্য।

আলু :—সাধারণতঃ, গোল, লাল, সঁকআলু ও বেটে আলু প্রকারে প্রচলিত দেখা যায় ; সমুদয় প্রকার আলুই শীতল, মধুর, গুরু, বলকারক ও কিকিৎ ক্ষুধাহারক ; ক্ষুধানাস্য লোক-দিগের পক্ষে ইহাদের ব্যবহার একটু স্বল্প হওয়া উচিত ;

যদি হজমশক্তি থাকে, তবে সিদ্ধ গোস্ আন্স লবণ সংযোগে নিত্য ব্যবহার করিতে পারিলে, সহজেই শরীরে পুষ্টিলাভ হইতে পারে ; আন্স ভাজা, অর্ধপোড়া অথবা অল্প কোন প্রকারে ব্যবহার না করিয়া, কেবল সুসিদ্ধ অবস্থায়, যাহা স্বল্প মসলাদি সংযোগে প্রস্তুত হয়, তাহাই ডিম্পেপ্টিকগণ ভোজন করিতে পারেন ; কিন্তু যখন অজীর্ণতা প্রবলভাবে বর্তমান থাকে, তখন নহে । পচা অথবা জামড়াধরা কঠিন আন্স কাহারও খাওয়া উচিত নহে । খোসা ছাড়াইয়া আন্স সিদ্ধ করিলে, উহার পুষ্টি গুণের হ্রাস ও অপেক্ষাকৃত দুশ্চাচ্য হইয়া থাকে । খোসা সমেত সিদ্ধ আন্স খোসাবিহীন আন্স অপেক্ষা ১ ঘণ্টা পূর্বে পরিপাক হইয়া যায় । ইহা নূতন অপেক্ষা পুরাতনই ব্যবহার করা প্রশস্ত । সাঁক আন্স কাঁচাই খাইতে হয় এবং মধুর, রসাল ও শীতল লাগে ; প্রথর রৌদ্রের সময় আরও তৃপ্তিদায়ক বোধ হয়, কিন্তু অধিক মাত্রায় ভোজন করা কর্তব্য নহে । লাল অথবা মিষ্ট আন্সও কাঁচা খাওয়া খাইতে পারে, কিন্তু উহা সহজে হজম হয় না জানিবে ।

পেঁয়াজ ও রসুন :—শরীরের তৌজোবর্ধক ও চক্ষুর হিতকর ; ইহার সহ মগ্ন ও মাংস অল্প ব্যবহার করা প্রয়োজন । হিন্দুর আহার সাহিত্যিক ভাবাপন্ন, কাজেই তাঁহাদের শাস্ত্রে ইহার নিবিদ্ধ ব্যবহার কথিত আছে ; ইহাদের ব্যবহারে মুখে এতই তৃপ্তি হয় যে, নিকটে পৰ্য্যন্ত লোক বসিতে পারে না । মাংসাদি রন্ধনে ইহার ব্যবহার দেখা যায় ; 'আমা-
কিশের বিধান, ইহা কতকটা মোগলদিগের অনুকরণগণেই

আমাদিগের মধ্যে ভৎপাশন সময়ে প্রচলিত হইয়া থাকিবে।
রসুনের উপকারীতা ঔষধাধিকারে আমরা ভগ্নস্থানের সংযোজক
ও শিশুর নাতিমূলের কর্তিত স্থানের ক্ষত শুদ্ধকারক, বলিয়া
দেখিতে পাই।

আদা :—ভেদক, গুরু, ক্ষুধাবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক ;
শুক আদাকেই শুঁঠ বলে। আহার করিবার পূর্বেই লবণের
সহিত আদা খাওয়া অভ্যাস করা বিশেষ উপকারক ; ইহাতে

ক্ষুধার বৃদ্ধি ও রুচিবৃদ্ধি হয় ; অল্পক্লেদ মতে গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে
ইহা খাওয়া উচিত নহে। কলায়ের ডাইল সহ, আদা বিশেষ গুণ-

কারক ও আহারেও সুস্বাদু হইয়া থাকে। আম্রআদা :—শীতল
বায়ুজনক, পিত্তনাশক, মূত্র, তিক্ত ও কণ্ডু নাশক। মূলা :—

রোচক, লবু, উষ্ণ, পাচক এবং ত্রিদোষনাশক ; মূলায় এই গুণ
ক্ষুদ্রাকারের মূলাতেই দৃষ্ট হয়, কিন্তু বৃহদাকারের অর্ধাৎ নেপালী

মূলা, গুরু, রস্ক এবং ত্রিদোষজনক ; তৈলাদির দ্বারা সিদ্ধ
করিলে দেখা গিয়াছে যে ইহাও ত্রিদোষনাশক হইয়া থাকে ;

স্কার্ভির (Scurvey) প্রাতিষেধক বলিয়া ইহা ব্যক-
হারে বেরি বেরি রোগ জন্মিতে পারে না। ইঁচোর :—

(কাঁচা কাঁঠাল) গুরু বায়ুজনক, বলকারক, স্নেহাজনক ও
মেদোবর্দ্ধক ; পাকা কাঁঠালের বিচি—মূত্র, গুরু ও কোষ্ঠ-

রোধক। ইহা ভাজা খাইতে বড়ই সুখপ্রিয় কিন্তু সহজে জীর্ণ
হয় না। অজীর্ণ রোগীর পক্ষে কাঁঠালের কোন দ্বিনিষই

ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। গাজর :—মূত্র, অগ্নিবর্দ্ধক, লবু
ও উষ্ণ। বিট :—দেখিতে গাজরেরই মত, কিন্তু খেতবর্ণের

না হইয়া ইহা লালবর্ণের দৃষ্ট হয় ; ইহার শুণ্ড গাজরের ন্যায় । ইহা হইতে এক প্রকার চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে । এই চিনি অপেক্ষাকৃত স্বল্প মিষ্ট । কলার মূল ও থোর :—ঠাণ্ডা, বল-বর্ধক, অন্নপিত্তদমনকারক, স্ফূটাবর্ধক, কুচিকারক এবং দাহ-নাশক । অজীর্ণ রোগীর পক্ষে ইহা সুপথ্য ।

মানকচু :—লঘু, শীতল এবং শোধনাশক; কিয়ৎ পরিমাণে রক্তেরও পরিশোধক । কেশুর :—শীতল, মধুর, কষায়, শুক্র, রোচক এবং শুনে হৃদয় উৎপাদক । পুদিনা :—বলকর, বমন নিবারক, অক্লিচনাশক, বায়ুদমনক, মুখের জড়তা-নাশক এবং কফনাশক । ইহার চাটুনি, কাঁচা আমের সহ অথবা তেঁতুল সহ, বড়ই মুখরোচক এবং তৃপ্তিপ্রদ খাদ্য । পোস্তাদানা :—অতিশয় শুক্র, কফনাশক ও বায়ুজনক, কিন্তু বলকারক ; ইহার দ্বারা প্রস্তুতীত দ্রব্যাদি অজীর্ণরোগীর পক্ষে আহার একেবারে নিষিদ্ধ । ডুমুর :—সুস্বাদু, শীতল ; ইহার দ্বারা কফ, পিত্ত, অর্শ, ও পাণ্ডুরোগ বিদূরিত হয় ; অধিকতর ইহা রক্তদোষপ্রশমক ও মূত্রাতিশায় উপশম কারক । বহুব্রী ও বহুতদোষবৃদ্ধ রোগীর পক্ষে ইহা নিত্য ভোজন ওষধের কার্য্য করে । মাদার :—কাঁচা হইলে অন্নমধুর, ত্রিদোষজনক, রক্তদূষক, স্ফূটানাদ্যকর, ও চক্ষের অনিষ্টকর ; কিন্তু পাকা অবস্থায় উহা বায়ুপিত্তনাশক, রোচক, স্ফূটাবর্ধক ও বলকারক । বরবটী :—বায়ুবর্ধক, রোচক, বলকারক ও শুষ্ক হৃদয় উৎপাদক, শুক্র ও তৃপ্তিকর । শম্মের মৃণাল বা শালুক :—পিত্তজনিত দাহ নিবারক, রক্তদোষনাশক, বায়ু-জনক, স্ফূটাবর্ধক, শুনে হৃদয় উৎপাদক এবং শুক্র ।

শাকাদি ভোজনে সাবধানতা অবলম্বনের কথা পূর্বেই এক স্থানে উক্ত হইয়াছে ; এখন শাকাদির গুণ জ্ঞাত থাকিয়া কিরূপ অবস্থায় উহা ব্যবহার করা কর্তব্য, তাহাও অবগত থাকা প্রয়োজন বিধায়, এখানে তাহার বিষয় কতক বলিতে ইচ্ছা করি। অতিশয় জীর্ণ, অসময়ে উৎপন্ন, তৈলাদি দ্বারা অশুদ্ধ, অপরিষ্কার স্থানে উৎপন্ন, বিকৃত বর্জ্যযুক্ত (কুড়ে মারা) এবং পোকা মাকড়া দি দ্বারা কীটহুঁষ্ট শাক ভোজন নিষিদ্ধ এবং মূলক ব্যতীত আর কোন শাকই, শুষ্ক ভোজন করিবে না। শুষ্ক মূলক ভোজনে উপকার আছে জানিবে।

প্রকৃতির নীলাভূমী এই ভারতবর্ষে ফল-ফুল ও শাক-সজীর অভাব নাই ; এখানে যত প্রকার ফলমূলাদি পাওয়া যায়, তাহা জগতে আর কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং সমুদয় ফলাদির বর্ণনা করা এখানে অসম্ভব। যে সকল ফল আমরা সমাধিক ব্যবহার করিয়া থাকি, এখানে তাহারই আলোচনা করিব। সকল ফলের মধ্যে অন্ন ও লবণজাতীয় পদার্থ অগ্নাধিক পরি-

মানে বিদ্যমান, কিন্তু কতকগুলি ফলে ফলারি .
আবার (যেমন আন্ন, কাঁটাল ইত্যাদি)

শর্করাজাতীয় উপাদানও অধিক পরিমাণে দেখা যায়। যথারীতি ভোজনে ইহা রক্ত শোধিত করে।

আমাদের এখানে ইহাই ফলের রাজ্য ; বৌল হইতে পকাবিন পর্যন্ত, সকল অবস্থাতেই আমরা ইহার ব্যবহার করিয়া থাকি এবং সকল অবস্থাতেই ইহার বিভিন্ন

গুণ দৃষ্ট হয়; বোল শীতল, ক্রটিকর, রক্তদোষনাশক; কচি আম, কষায়, রোচক, বাতশ্লেষ্মানাশক। ইহার অম্ল, চৈত্র বৈশাখের প্রথমে রোদ্রে, বড়ই তৃপ্তিপ্রদ হইয়া থাকে। কাঁচা আম, বড়ই টক ও রক্তদূষক। ইহা অধিক খাওয়া উচিত নহে; এই কাঁচা আম ছাড়াইয়া রোদ্রে শুকাইয়া আম্‌সি করিলে, উহা স্বাদু ও অম্লমধুর হইয়া থাকে; কিঞ্চিৎ মিষ্ট সংযোগে ইহার অম্ল, বড়ই তৃপ্তিদায়ক, ক্রচ্য এবং ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। পাকা আম মিষ্ট, বলকারক; অগ্নি-
কারক, শ্লেষ্মাবর্জক, কিন্তু পিত্তজনক নহে; আমের গুণ
গাছপাকা আম গুরু, অতিশয় বায়ুনাশক,
অম্লমধুর ও সামান্য বায়ুজনক জানিবে। ঘরে পাকান আমই
পিত্তনাশক, কারণ তাহাতে অম্লরস অল্প হইয়া মিষ্টরস অধিক
থাকে; ২১ দিন ঘরে থাকিয়া পাকিলে, ইহা লঘু, রোচক
বলবীৰ্য্যকারক, বায়ুপিত্তনাশক এবং সহজেই জীর্ণ হইয়া যায়।
আমের রস গুরু, বলকারক, বায়ুনাশক ও অতিশয় পুষ্টিকারক।
দুধের সহিত আম সেবনে ক্রটি বৃদ্ধি, বেহপুষ্টি, বায়ুপিত্তনাশ ও
বর্ণের উৎকর্ষতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহা পরিমাণে অধিক খাইতে
নাই, তাহাতে অগ্নিমান্দ্য, রক্তদোষ (গাত্রে ফোটকা দি হওয়া),
অতিশয় কোষ্ঠরোধ প্রভৃতি হইতে পারে, অতএব আম্র ভোজনে
সাবধান হওয়া কর্তব্য; বিশেষতঃ অজীর্ণ রোগীগণ লোভ বশতঃ,
দুধের সহিত অধিক খাইয়া যেন অধিক মাত্রায় ইহা, আহার

কয়েন

আম্রসত্ত্ব :—রোদ্রে পাক হইয়া যায় বলিয়া, ইহা

লবু হয় এবং আহায়ে তৃষ্ণা, বমি এবং বায়ুপিত্তের উপশম ও কোষ্ঠ শুদ্ধি কারক হয় জানিবে।

কাঁঠাল :—আমের স্থায় ইহাও আমাদের দেশে সময়ে প্রচুর জন্মে এবং কাঁচা (ইঁচোর) অবস্থা ইহাতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পক্কাবস্থায় ইহা নীতল, স্নিগ্ধ, বায়ুপিত্তনাশক, তৃপ্তিজনক ও পুষ্টিকর; আরও ইহা অতিশয় মাংসবৃদ্ধিকর ও শ্লেষ্মাজনক জানিবে। খাজা কাঁঠাল (অর্থাৎ বাহার রোয়া—কোষ কঠিন) বড় সহজে জীর্ণ হয় না এবং ভোজনে উদরের উপদাহ প্রায়ই উৎপন্ন করিয়া থাকে। গলা কাঁঠাল অপেক্ষাকৃত জীর্ণকর। অগ্নিমান্দ্য ব্যক্তির ইহা মুখরোচক হইলেও পাকস্থলী রোচক নহে, সুতরাং ব্যবহারে সাবধান হওয়া কর্তব্য। কাঁঠালের রস, গুরু, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, মধুর এবং নীতল। কাঁঠালের বীজ, স্নিগ্ধ এবং ঘৃত সংযুক্ত হইলে বলকর, মুখরোচক হয়। অপিচ ইহা ক্ষুৎস্পন্দনের একটি ঔষধ বলিয়া গণ্য।

তরমুজ :—নীতল কিন্তু গুরু; পাকা তরমুজ উষ্ণ, পিত্তজনক কিন্তু বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক। কিঞ্চিৎ চিনি সংযোগে ইহা বড়ই উপাদেয় ও তৃষ্ণানাশক সরবৎ হয়। **ধরমুজ :**—বলকারক, কোষ্ঠশুদ্ধিকর, গুরু, নীতল, বায়ু ও পিত্তনাশক। **আতা :**—নীতল, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং কফবর্ধক; ইহা বমন ও বমনের বেগ নিবারণেও কদম্বিৎ সমর্থ। **শশা :**—কচি অবস্থায় লবু, সুস্বাদু, নীতল ও পিত্তনাশক; পাকা শশা, পিত্তজনক ও উষ্ণ। ইহার কচিই উপকারী জানিবে এবং অজীর্ণরোগীও স্নানাস্নানে খাইতে পারে।

কাঁকুড় :—মধুর, গুরু, কক ও পিত্তনাশক ; ইহা রন্ধন করিয়াও তরকারী রূপে আহার চলিতে পারে। ইহার পকা-বহাকেই কুটি বলে ; ইহা উষ্ণ এবং পিত্তজনক কিন্তু কাঁকুড় তাহা নহে। তাল :—(কচি) লঘু, স্নেহাজনক, স্নিগ্ধ, মধুর বায়ু ও পিত্তনাশক। পাকাতাল সহজে জীর্ণ হয় না ; কাজেই তালের প্রস্তুত সমুদয় খাদ্যদ্রব্যই অগ্নিমান্দ্র্য ব্যক্তির পক্ষে খাওয়া নিষিদ্ধ। পাকাতালের শুক আঁটি চিরিয়া তাহার মধ্য হইতে তালের কোঁকল বাহির করিতে হয় ; উহা তৃপ্তিকারক এবং স্নিগ্ধ ও সহজ পরিপাচ্য জানিবে। তালের রস বা তাড়ী, টাটকা অবস্থায় খেজুর রস অপেক্ষা স্নিগ্ধকর এবং বায়ুনাশক ও পিত্তকর ; কিন্তু ইহা স্নেহোদয়ের পূর্বে খাওয়া প্রয়োজন ; রোদ্র বাড়িতে থাকিলেই উহা হইতে গাজ্জা উষ্ণ তাড়ী নামক মাদক রসে পরিণত হয়। কুটুম্ব :—(পাকা) গুরু, বায়ু-পিত্তনাশক, কঠিনোধক ; ইহা অন্নমধুর বলিয়া বড়ই মুখরোচক এবং তৃষ্ণা ও হিকার উপশমকারক। ক্লাম :—দাহশান্তিকর, রুক্ষ, ক্ষুধারোধক। ইহা অধিক পরিমানে খাওয়া কর্তব্য নহে। ইহার বিচি বহুমূত্র রোগে উপকারক। গোলাপজাম :—গুরু, রোচক, মধুর ও স্বাদু। কলা :—কাঁচা অবস্থায় তরকারী করিয়া ব্যবহার হয় ; ইহা গুরু, ও সহজ পরিপাচ্য নহে ; কাঁচা-কলা হইতে ময়দার দ্বারা এক প্রকার পালো তৈয়ার হইয়া থাকে ; ইহার কুটি বেশ সুপাচ্য। পাকাকলা অতিশয় ভারজনক, ক্রিমি-উৎপাদক, এবং বায়ু ও কফবর্দ্ধক এবং পুষ্টিকর। বর্তমান কলাই খাইতে অতি সুস্বাদু, তন্নিরেই চাপা কলা জানিবে।

কামরঙ্গা :—ইহা শীতল, অন্নমধুর ও বাতশ্লেশকর ; ইহা অধিক ব্যবহারে অন্ন হইবার সম্ভাবনা ।

বেল :—কাঁচা বেল কষায়, উষ্ণ, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, ধারক এবং বাতশ্লেশকর । পাকা বেল সুগন্ধি, মধুর, চূর্ণকর এবং অধিক মাত্রায়, পেট কাঁপায় । অত্যন্ত কল পরিপক হইলে গুণাধিক্য অল্পে কিন্তু পাকা বেল অপেক্ষা কাঁচা বেলই অধিক গুণশালী জানিবে । বেলশুট ধারক এবং আমাতিসার ও শূলে বিশেষ হিতকরী । (আধপাকা কাঁচা বেলের খোলা ফেলিয়া দিয়া, শাঁসের ভিতর যে বীজ ও আটা থাকে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া, বেলের গুণ উহাকে চাকা চাকা করিয়া কাটবে এবং রৌদ্রে শুকাইতে দিবে । পরে রৌদ্র শুষ্ক—করিয়া বোতলে ছিপি দিয়া রাখিবে । ইহাকেই বেল শুট বলা যায়) ।

পুরাতন উদরাময় এবং রক্তামাশয়ে ইহা বিশেষ উপকারী ; শিশুগণের অনিয়মিত কোষ্ঠপরিচ্যায় অবস্থাতেও (অর্থাৎ উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতার পর্যায় অবস্থায়) ইহার ব্যবহারে সুফল ফলিতে দেখা গিয়াছে । ইহাতে ট্যানিক Tonic আসিষ্ট আছে সুতরাং অন্ত্রের উপর ধারক astringent কার্য করে । আবার ইহা দাঁত পরিষ্কারও করে ;—অন্ত কোন ধারক পদার্থে একত্রে এক্রপ সন্নিধান বড় দেখা যায় না । বেলের decoction অর্থাৎ তরল সার পদার্থ এবং নিরাসই ব্যবহারে প্রশস্ত । বেল পোড়া ব্যবহারে আহার এবং ঔষধ উভয় কার্যই সমাধা হয় ।

(৩ ঔল শুক খের বা দেড় ঔল আধপাকা বেল—বিচি, আঁশ* ও আঠা বাদ দিয়া—এক পাইন্ট বা অর্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া লইতে হইবে । পূর্ণ বয়স্কের জন্য ১ ঔল বেলের তরলসার করিয়া, দিবসে ৩৪ বার ইহা সেবা ; বেলের সিরাপ প্রস্তুত করিতে হইলে, অর্ধখণ্ড পাকা বেলের কোমল অংশের সহিত, এক ঔল জল ও এক চাষচ চিনি মিশ্রিত করিয়া, বেলের মূত্রখণ্ড সকল (আঁশ) বাদ দিয়া ফেলিলেই, সিরাপ প্রস্তুত হইয়া যায় । ইহাও ৩ বার সেবা) ।

কুল :—(নারিকেলী) ভেদক, শীতল, গুরু ও পুষ্টিকর ; দেশী কুল (ক্ষুদ্র), রোচক, বায়ুজনক, গুরু, কফপিত্তকর ও উষ্ণ । কুলমাত্রেই শুষ্ক হইলে ভেদক, অগ্নিদীপক লঘু ও তৃকানিবারক । ইহার অমল উপাদেয় এবং প্রশাস্তিকর । করমুচা :—(পাকা) রোচক, অন্নমধুর ককবৃদ্ধিকর, লঘু ও বায়ুপিত্তনাশক ; কাঁচাবস্থায় ইহা গুরু, অন্ন, তৃকানাশক ও রক্তপিত্তকর । বঁইচি :—সর্ষ-দোষনাশক এবং মধুর ; ইহা বিচি সমেত খাইলে বড়ই উদরাময় উপকার করে । ফল্গুনা :—পিত্তনাশক, দাহনাশক, মধুর ও পুষ্টিকর ; কাঁচা অবস্থায় ইহা পিত্তকর ।

ডালিম :—মিষ্ট হইলে ক্রিমোষনাশক, তৃপ্তিকর, লঘু, বল-কারক ও বরুণশক্তিবর্ধক ; ইহাতে তৃকা ও দাহ শান্তিও হইয়া থাকে ; অন্নমধুর ডালিম রোচক, অগ্নিদীপ্তিকর এবং সামান্য পিত্তজনক, কিন্তু টক হইলে পিত্তজনক ও বায়ু-রোগানাশক হয় । প্রাচীন উদরাময় ও ডালিমের গুণ রক্তমাশয়ে ইহা উপকারী ; মুখে ক্ষত হইলে

জলে সিদ্ধ করিয়া, ইহার কুলকুচা করিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। ইহার তরলসারই বিশেষ প্রয়োজনীয়। দুই প্রকারে ইহা প্রস্তুত করা হয় (১) শিকড়ের ছাল (২) খোসা। তাজা ডালিমের শিকড়ের ছাল (টুকরা) ২ ঔন্স অথবা ঐ শুক ৩ ঔন্স; দুই পাইন্ট বা ১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ সের থাকিতে নামাইয়া নাড়িয়া লইবে। ফিতা কুখির জন্ত ইহার বিশেষ ব্যবহার; পেটের অসুখাদি জন্ত ১ ঔন্স দিবসে ৩ বার সেব্য। খোসার তরল সারও ঐ উপায়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং ১ বা দেড় ঔন্স দিবসে ৩ বার সেব্য। জলের পরিবর্তে ছুন্ধের সহিত ইহার তরলসার প্রস্তুত করিলেও, সময়ে সময়ে অস্ত্রের পীড়ায় উপকারী হইতে দেখা গিয়াছে। এই তরলসার সহ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি দ্রব্য সংযোগে ইহা আরও মুখরোচক করা যাইতে পারে। আমাদের দেশীয় লোকের অস্ত্রের গোলযোগেই ইহা অধিক কার্যকরী। অজীর্ণ রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারক, কারণ যকৃতের কার্য বৃদ্ধি করিয়া পরিপাকের বিশেষ সহায়তা ইহাতে হইয়া থাকে।

নিম্নলী :—দোলা জল পরিষ্কার জন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা বাতশ্লেষ্মানাশক, শীতল, মধুর ও গুরু।
খেজুর :—শীতল, মধুর, স্নিগ্ধ, কটিকারক, গুরু, তৃপ্তিকর ও পুষ্টিকর এবং বলকর, বমননিবারক ও বাতশ্লেষ্মানাশক।
দেশী ক্ষুদ্র খেজুর অপেক্ষা বৃহৎ পিণ্ডখেজুর (পশ্চিম দেশীয়,) এবং সোহার। (আরব দেশীয়) খেজুরের গুণ সমস্ত

বৃষ্ট হয়। খেদুর রস মাদক, পিত্তকর অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, রোচক, এবং বাতশ্লৈশ্মনাশক ও মূত্রকর।

কিস্মিস্ :—শীতল, চক্ষের হিতকর, পুষ্টিকারক, গুরু, শরৎক্ষিকারক, ভেদক, মূত্রকারক, বলবর্দ্ধক, রোচক ও কোষ্ঠে বায়ু উৎপাদক। ইহা জলে ২।১ ঘণ্টা তিজাইয়া রাখার পর ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায় ; গরম হৃৎকের সহ সিদ্ধ করিয়া

খাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা সহজেই বিদূরিত হইতে পারে। মনাকা :—

কফপিত্তনাশক, গুরু ও শুক্রজনক। আঙ্গুর অর্থাৎ কাঁচা মনাকা।—গুরু, অন্ন ও বায়ুপিত্ত উৎপাদক। নাস্পাতি :—

লঘু, ত্রিদোষনাশক, অন্নমধুর, স্ততরাং সকলেরই পক্ষে সুব্যবহার্য ;

আপেলও ইহার ত্রায় গুণসম্পন্ন। বাদাম :—গুরু, বায়ুনাশক, পিত্তনাশক, কিন্তু উষ্ণ—সহজে জীর্ণ হয় না—এবং কফবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক।

বাদাম, জলে অধিকক্ষণ তিজাইয়া রাখার পর ব্যবহারে, কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধতা লাভ হইতে দেখা যায় ; কিন্তু বাদাম

তাকা (অধিক) স্নিগ্ধ লোকেরও খাওয়া কর্তব্য নহে। আক-

রোট :—ইহা বাদামেরই ত্রায় গুণবিশিষ্ট এবং কফপিত্তবর্দ্ধক।

কমলালেবু :—গুরু, বাতপিত্তনাশক, রক্তদোষনাশক, কফনিঃসারক, বলকারক ও পুষ্টিকর। ইহার দ্বারা বমি ও

তৃষ্ণা নিবারণ হয়। মিষ্টরসবিশিষ্ট লেবুই উক্ত গুণসম্পন্ন।

পাতিলেবু :—অন্ন ও ক্রিমিনাশক ; উদর বেদনা নাশক ;

শেটকাঁপা, অতিশয় মন্দারি, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি পীড়িত ব্যক্তির

ইহা নিত্য ব্যবহার্য হওয়া কর্তব্য। অরুচি ও বমনেচ্ছা

হইলেও, ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

ভুক্ত পদার্থ হজম নাহইয়া, উদর ভারবৃদ্ধ
এবং ক্ষতিত হইয়া থাকিলে, অথবা চোয়া লেবুর গুণ

(বদগন্ধযুক্ত) চেকুর উঠিতে থাকিলে,

কিঞ্চিৎ লেবুর রস, লবণ দিয়া অথবা গরম জলের সহ সেবন
করিলে, অতি সহর উপশম পাওয়া বাইতে পারে। সুস্থ ব্যক্তি
গণেরও ইহা নিত্য ব্যবহার করা কর্তব্য, তাহাতে সহজে
অজীর্ণতা দোষ জন্মিতে পারে না। বাতাবিলেবু :—অন্নঘূর,
রোচক, শীতল, কিন্তু শুষ্ক। গোড়া লেবু—উষ্ণ, শুষ্ক, অন্ন,
বাতশ্লেষ্মানাশক ; ইহার ব্যবহারে বমনেচ্ছা, বমি, তৃষ্ণা, আমাশয়
দোষ, অজুখা এবং ক্রিমি নষ্ট হয় ; মুখের বিকৃত আশ্রয়ও ইহা
দূর করিতে সমর্থ। কাগজী লেবু—বমন ও তৃষ্ণানিবারক ; মিছরী
অথবা চিনি ভিজান জলের সহ, সামান্য পরিমাণে, ইহার রস
মিশ্রিত করিয়া খাইলেও শরীর শিথ ও শীতল হইয়া শ্রান্তি
দূর হয়।

তেতুল :— * অন্ন, শুষ্ক, বাতনাশক, পিত্তজনক, কফবর্জক
ও রক্তদোষনিবারক ; পাকা তেতুল, ক্ষুধাবর্জক এবং বাত-
শ্লেষ্মানাশক। কোন সন্ধিস্থান যচ্ কাইয়া বাইলে, তথায় কাঁচা
তেতুল পোড়াইয়া প্রলেপ দিলে উপশম প্রাপ্ত হয়।

আলু বোথরা :—রোচক এবং সুস্থ বিরোচক।

নারিকেল :—কচি ডাবের জল রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ

* অল্পে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় এবং খাওয়া পরিপাক হস্ত যে সকল রসের প্রয়োজন,
অল্পত্ব্য আহায়ে সেই সবদের অধিক নিঃসৃত হইয়া, পরিপাকের সাহায্য করে।
লেবুর রসে রক্ত শোধন করিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে।

ও পিত্তজ্বরে হিতকর ; ইহা শীতল, বায়ুনাশক ও রোচক সূত্রাং অজীর্ণরোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী । প্রতিদিন আহারের পর, ইহার জলপানে অজীর্ণতা লক্ষণ দেখা দিবার আর ভয় থাকে না । ডাঃবের শাস :—রোচক, মূত্রবর্ধক, তৃপ্তিজনক এবং ধাতুবর্ধক ; কিন্তু সহজ পরিপাচক নহে । ঝুনা নারিকেল :—ওরু, হৃজ্জর ও বল, মাংস এবং পুষ্টিপ্রদ ; ক্ষয়রোগীর অগ্নিবল থাকিলে, তাহার পক্ষে ইহা বিশেষ হিততর, কিন্তু অজীর্ণ রোগীর বিষম শত্রু ।

আনারস :—অন্নমধুর, পিত্তনাশক, শীতল, মুখরোচক, ধারক ও ক্রিমিনাশক ; ইহার পাতার রস সেবনে ক্ষুদ্র ও কিতা কুমি বিনষ্ট হইয়া থাকে ; ইহা সেবনে অজীর্ণতাও দমন হয়, কারণ যকৃতের উপরও ইহার বিশেষ ক্রিয়া বর্তমান দেখা যায় ।

আক :—রক্তপিত্তনাশক, বলকারক, স্নিগ্ধ, কফজনক, শুষ্ক, কৃত্রকারক ও শীতল ; কচি আক প্লেগ্মার উৎপাদক, মেদোবর্ধক ; মধ্যমবয়স্কার আক, বায়ু-পিত্তনাশক ও সরস ; বৃদ্ধ আক রক্তজনক, বলকারক ও বীৰ্য্যোৎপাদক । দন্ত চর্কিত আকের রস, রক্তপিত্তনাশক, চিনির ভায় বীৰ্য্যবিশিষ্ট, ও রোম্বাজনক । কষে মিশ্রিত আকের রস, ময়লাদি মিশ্রিত থাকায় বিকৃত হইয়া শুষ্ক, বিদাহী ও বিষ্টভী হয় । আকের রস অগ্নিতে জাল দিলে শুষ্ক, বাতরোমানাশক, শুষ্কনাশক ও সামান্ত পিত্তকর হইয়া উঠে ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ !

মৎস্ত মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং মসলাদি ।

অমিষ ও নিরামিষ লইয়া আবহমান কাল হইতে স্বচ্ছ চলিয়া আসিতেছে ; এখানে আমরা তাহার কোন আলোচনা না করিয়া, শুদ্ধমাত্র মৎস্ত ও মাংসের সাধারণ গুণাদি ও তাহাদের বিশেষ ২ প্রকারের পুথক গুণাদি মাত্র বর্ণনা করিব ।

মাংসমাত্রেই সাধারণ গুণ, বাতনাশক, বলপ্রদ, পুষ্টিকর, তৃপ্তিকারক, গুরু, মেদবর্দ্ধক এবং
পাকে ও স্বাদে মধুর । মাংস

জীবের মাংস অমৃত সদৃশ, রোগোৎপাদক এবং সুপথ্য ; যে জীব নিজ হইতে মরিয়া যায়, তাহার মাংস বলক্ষয়কর,—গুরু এবং অতিসার রোগোৎপাদক জানিবে ; সুতরাং এই প্রকার মাংস কাহারও সেবন করা কৰ্ত্তব্য নহে । বৃদ্ধ জীবের মাংস প্রায়ই রোগোৎপাদক, অতএব উহা সৰ্ব্বথা পরিত্যাজ্য ; বালজীবের মাংস বড়ই সুখপ্রিয়, লঘু ও বলকারক ; মাংস ভোজীগণের পক্ষে ইহা অবগত থাকা নিতান্ত আবশ্যক বিদ্যায়, আমরা যথাসাধ্য এখানে উহার আলোচনা করিলাম ।

আমাদের দেশে ছাগমাংসই সমধিক প্রচলিত ; ইহা লঘু, বায়ুপিত্তকফনাশক, নাতি শীতল, অতিশয় বলকারক, রুচিকারক, মেদবর্দ্ধক ; কচি ছাগশিশুর মাংস অতিশয় লঘু, বায়ুপ্রদ এবং মহতী বলকারক ; ইহার আর একটি গুণ জ্বরনাশক, সুতরাং জ্বর রোগীকেও (যদি উদরাময়াদি দর্ডমান

না থাকে) ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রোগীর পথ্য-
ভাবে ব্যবহার করিতে হইলে, ইহার মাংসের ঘূৰ্ বাহির করিয়া,
মাংস বাদ দিয়া, শুদ্ধ ঘূৰ্, স্বল্প মসলাদি সংযোগে সেবন করিতে
দেওয়া কর্তব্য। খাসির মাংস গুরু, কফ-

জনক, মাংসবর্জক, বলকারক, বায়ুনাশক পিত্ত-মাংস
ও পিত্তনাশক; রক্ত অথবা কোন রোগে

মৃত ছাগলের মাংস, কর্কশ ও বায়ুজনক; ছাগমুণ্ড বেধাবর্জক
ও রোচক; ইহার অণ্ডকোষ শুক্রবর্জক এবং যকৃৎ (চলিত
কথায় যাহাকে মেটে বলে) চক্ষুর জ্যোতিবর্জক। ছাগের পরই
মেঘমাংস :—ইহা পুষ্টিকারক, পিত্তশ্লৈশ্মজনক এবং গুরু;
খাসী করা মেঘ মাংস কিঞ্চিৎ লঘু; ইহারও শিশুর মাংস ছাগ-
শিশুর মাংসের তায় গুণকর।

কচ্ছপ মাংস :—বলকারক; বায়ুপিত্তনাশক ও ধ্বজ
ভঙ্গ নিবারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। হরিণ মাংস :—শীতল, মল-
মূত্ররোধক, অগ্নিকারক, লঘু; কৃষ্ণসার হরিণের মাংসই তৃপ্তি-
কর ও সুখাত্ত বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু ছাগের তায় সুস্বাদু
নহে। খরগসু মাংস :—শীতল, লঘু; স্বাস্থ্যরক্ষক, অগ্নি-
কারক; পিত্তশ্লৈশ্মনাশক এবং বায়ু সাম্যকারক; অর এবং
অতিসার রোগীকে ইহা নির্ভয়ে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে;
রক্তহীনে ব্যক্তির পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারক।

চতুষ্পদ জন্তুগণের মধ্যে, পূৰ্ণোক্ত কয়টি জীবের মাংসই সমধিক
প্রচলিত বলিয়া, উহাদের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল;
অজীর্ণ সমুদয় জীবের মাংসও সম্প্রদায় বিশেষে লোকে ভোজন

করিয়া থাকে, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে যখন সেই সমুদয় খাদ্য নহে, তখন তাহার সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না।

পক্ষমাংসের ভায় পক্ষীর মাংসও ভোজন প্রথা প্রবর্তিত দেখা যায় ; ইহাদের মধ্যে যান্ত্রিকৈত্রচারী পক্ষীর মাংস লঘু ও সুপথা ; জলচর পক্ষীগণের মাংস বলকারক, স্নিগ্ধ এবং গুরুতর। লাবপক্ষীর মাংস :—অগ্নি-কারক, সুপথা, স্নিগ্ধ ; সাদা লাবের পক্ষী-মাংস মাংস ত্রিদোষগ্র ও অতিশয় লঘু।

চড়াইয়ের মাংস :—লঘু, শীতল, স্বাদু, কফপ্রদ ও গুরুজনক। পায়রার মাংস :—শীতল, গুরু, রক্তপিত্তশাস্তিকর, বায়ুনাশক ও বীৰ্য্যবর্দ্ধক। স্তিত্তিরী মাংস :—বলকারক ও ত্রিদোষগ্র ; সাদাই প্রশস্ত গুণকর। হংস, সারস ও বক প্রভৃতি জলচর পক্ষীর মাংস :—পিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, বাতশ্লেষ্মবর্দ্ধক, শীতল, মধুর ও গুরু। মুরগীর মাংস :—মেদবর্দ্ধক ; বায়ু-নাশক, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরু, চক্ষের জ্যোতিকারক, বলকর ও কফ-বর্দ্ধক ; অরাদি রোগে দুর্বল হইয়া পড়িলে (হজম শক্তি বর্দ্ধমান) রোগীকে ইহার সু-পথ্যভাবে প্রয়োগে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। এই অবস্থায় পায়রা ও হাঁসের মাংসও কেহ কেহ ব্যবহা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের মতে শিঙ-মোরগ মাংসই সর্ব-শ্রেষ্ঠ জানিবে। মুরগীর মাংসে সাধারণতঃ ছানাজাতীয় উপাদান অধিক থাকে। পক্ষ মাংস অপেক্ষা পক্ষীর মাংস সুপাচ্য।

পক্ষীর ডিম্ব :—অনেকে আহাৰ করিয়া থাকেন ; হাঁস

ও মূরগীর ডিমই চলিত দেখিতে পাওয়া যায় ; ডিম মাঝেই
 শুষ্কজনক, বায়ুনাশক এবং পুষ্টিকারক জানিবে ; মূরগীর
 ডিম অপেক্ষা হাঁসের ডিম লম্বুতর ; অনেকে ব্যবস্থা দিয়া
 থাকেন যে, স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য

পক্ষীর ডিম ।

প্রত্যহ কাঁচা ডিম খাওয়া উপ-

কারক ; এমন কি ১২ ড্রাম মস্তুর সহিত হইলে আরও
 বলকারক ও স্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে—এমন কথাও কেহ কেহ
 বলিয়া থাকেন ; এ ব্যবস্থা আমরা সমীচীন বলিয়া বোধ করি
 না । হাঁসের ডিম অত্যধিক ব্যবহারে বাতরোগগ্রস্ত হইবার
 সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে । ইহাতে এলুমেন অধিক থাকায়,
 বহুমূত্রপ্রবণ অথবা বাতব্যাধিপ্রবণ ব্যক্তিগণের খাওয়া কর্তব্য
 নহে ; অজীর্ণ রোগীর পক্ষে ইহার ভ্রাণ পর্য্যন্ত লওয়া নিষিদ্ধ ।

আমাদের এই উষ্ণপ্রধান দেশে

মাংস ভোজনে

মাংস বিশেষ ভূমিদায়ক নহে ; বরং

সাবধানতা

সময়ে অনিষ্টকারকই হইয়া পড়ে—

অবশ্য তাহা মাংসের দোষে বত না হউক, ভোজনকারীর
 অনবধানতা প্রযুক্তই বিশেষতঃ, উহা সংঘটিত হইতে দেখা
 যায়, কারণ জীর্ণাকম, অথবা স্বল্প জীর্ণাশক্তি-বিশিষ্ট লোকে
 যদি না বুঝিয়া যাহা তাহা আহার করে এবং তাহার ফলে

প্রাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আহার্যাপদার্থকে দোষ
 না দিয়া আহারকারীকেই দোষী করা কর্তব্য । এদেশে
 মাংস নিত্য ভোজ্যের মধ্যে পরিগণিত না হইয়া, মধ্যে
 মধ্যে ভোজন করাই কর্তব্য ; যদিই কেহ নিত্যভোজন করিতে

চাহেন ও তাঁহার জীর্ণশক্তি বিশেষ বলবতী থাকে, তবে অধিক মসলাদি সংযুক্ত না করিয়া উহা খাওয়া কর্তব্য ; মসলাদি সম্বন্ধে ভাগে দেওয়া হইলে, মাংস আরও গুরুতর হইয়া

পড়ে । পাকস্থলীর উপর নিত্য গুরুতর কার্য্যভার পড়িতে থাকিলে ক্রমে পাকস্থলী অবাধ্য হইয়া উঠে, সুতরাং উহার দ্বারা নিয়মিত ভাবে কার্য্য সাধিত হয় না এবং তাহারই ফলে স্বয়ং উহাও বিকৃত হইয়া যায় এবং শারিরীক অস্বাস্থ্য যন্ত্রাদিও বিকৃত করিয়া ফেলে । মাংসের সহিত পেঁয়াজ দিলে উহা খুবই মুখরোচক হয় বটে, কিন্তু উহা পরিত্যাগ করিলেই ভাল হয় । আমার এই কথায় হয়ত অনেকে বলিবেন যে “পেঁয়াজ বর্জিত নিরামিষ মাংসই যদি খাইতে হয়, তবে না খাওয়াই ভাল” !! পেঁয়াজ সংযোগে যাঁহারা মাংসভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহারা উহা বাদ দিয়া ২১০ দিন খাইলেই নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন যে, উহা বাদ দিয়াও কোন

খন্ড মসলা যুক্ত

বিশেষ অনুবিধা বোধ হয় না । আমরা

মাংস

ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কোন কথা বলিতে

চাহি না ; পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় সকলেই নিত্য মাংস আহাৰ্য্য করিয়া থাকে, কারণ তথায় মৎস্ত প্রায় পাওয়া যায় না এবং মাংসও সস্তায় পাওয়া যায় । আমরা এখানে নিত্য যেমন মৎস্তের কোল খাইয়া থাকি, তাহারা সেই রূপ স্বল্প মসলাদি সংযোগে নিত্য মাংসের কোল খাইয়া থাকে । ঐ প্রদেশে

যাইয়া নীজেগাও খাইয়া দেখিয়াছি যে, এই প্রকারে মাংস ভোজনে কোন প্রকার অনুধ করে না । তবে তাহারা তথায়

পৌরাজ নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকে; আমাদের মতে অত্যন্ত গুরু মসলাদি পরিবর্জননের সহ ইহারও “বিসর্জন” হওয়া কর্তব্য। গ্রীষ্মপ্রধান দেশোপেক্ষা শীতপ্রধান দেশে মাংসাহার সমধিক কর্তব্য, সুতরাং আমাদের দেশে শীতকালেরই ইহা উপযোগী আহার।

আমিষের মধ্যে মৎস্তই আমাদের দেশে বিশেষ প্রচলিত; বিশেষতঃ, অল্পমতঃ প্রাণ বাঙ্গালীর ইহা নিত্য প্রয়োজনীয় আহাৰ্য্য। মাংসের জ্ঞান মৎস্তও পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক ও উষ্ণ; সুতরাং কামাদিত্যাবোক্তজক বলিয়া হবিষ্যাকারী এবং বিধবার পক্ষে ব্যবহার নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রে বিধান দেওয়া আছে। অপিচ সধবার পক্ষে ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য, এমন কি ইহার ব্যবহার “আয়ত্তির” চিহ্ন বলিয়াই ব্যবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়।

মৎস্তের সাধারণ গুণ এই যে ইহা স্নিগ্ধ, মৎস্ত
উষ্ণ, মধুর, গুরু, কফপিত্তজনক, বায়ু-
নাশক, রোচক, মেদবর্দ্ধক, পুষ্টিকর এবং বলবর্দ্ধক; বাহাদিগের
জুখাগ্নি বেশ দীপ্ত থাকে তাহাদিগের পক্ষে ইহা অতিশয় উপ-
কারক। মল্লাগ্নিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে ইহার ব্যবহার সংযত-
ভাবে এবং প্রকারভেদে বাছাই করিয়া হওয়া দরকার। পচা
অথবা বাসি মৎস্ত সহজে কাহারও মৎস্ত ব্যবহারে
ধাওয়া উচিত নহে; অপৰ্য্যাপ্ত তাবেও সাবধানতা
ইহার ব্যবহার না করিয়া, নিয়মিত ও
পর্য্যাপ্তভাবে মৎস্ত ভোজন করিলে কোনই অপকার হইতে দেখা
না। অরুচন উপলক্ষে অনেকে বাসি মৎস্তের তরকারী বা

অন্ত প্রকারে ইহা ব্যবহার করিয়া বিপদগ্রস্ত—এমন কি মৃত্যুস্থ
পর্যন্ত পতিত হইয়াছেন দেখা গিয়াছে। টাইকা মৎস্ত ব্যতীত,
অজীর্ণ রোগীর বিশেষতঃ, অন্ত মৎস্ত খাওয়া কর্তব্য নহে।

এখন বিশেষ বিশেষ মৎস্তের কিরূপ গুণ আছে দেখা
যাউক। মৎস্তের মধ্যে রোহিত মৎস্তই শ্রেষ্ঠ ; ইহা বায়ু-
নাশক, গুরু, স্বাদু এবং অধিক পিত্তজনক নহে ; রোহিত মৎ-
স্তের মস্তক বিশেষ বলকারক ; বড়জাতীয় এই মৎস্ত ভাজা
ইত্যাদি অধিক না খাইয়া, ঝোলের সহিত সুসিদ্ধ করিয়া
ভোজনে তেমন অপকার দেখা যায় না ; কিন্তু অধিক মাত্রায়
অথবা ভাজা খাওয়ায় অপকার সম্ভাবনা। পরিপাক শক্তি
স্বল্প থাকিলে ইহা খাওয়া উচিত নহে, বরং ইহার বাচ্চা পুঁটি
মৎস্তই তাহাদিগের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য হওয়া কর্তব্য। পুঁটি
মৎস্ত-বাতশ্লেষ্মা নিবারক, স্নিগ্ধ, রোচক ও লঘু। কাতলা
ও মুগেল :—বলকর, বায়ুনাশক, রোচক, পিত্তনাশক কিন্তু
মেদবর্দ্ধক ও গুরু ; রোহিত মৎস্তের স্থায় ইহাও দীপ্তাঙ্গি-
বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে মাত্র হিতকারক। ইলিশ :—মধুর, স্নিগ্ধ,
রোচক, বলবর্দ্ধক, পিত্তশ্লেষ্মজনক, মেদবর্দ্ধক, দূশ্পাচ্য এবং বায়ু-
নাশক ; ইহা খুবই সুখরোচক কিন্তু আহারে বড়ই কষ্টদায়ক ;
তাহাদিগের পরিপাক শক্তি সুবিধাজনক নহে, তাহাদিগের পক্ষে
ইহা বিষ সন্মূহ। সমুদ্র মৎস্ত অপেক্ষা ইহাতে তৈল অধিক থাকে ;
ইহার তৈলও খাইতে বিশেষ সুস্বাদু, কিন্তু সুবিরেচনার সহিত
ভোজন না করিলে বড়ই বিপদের সম্ভাবনা ; এই মৎস্ত
বাসি ও পচা আরও বিপদজনক ; কত প্রাণী যে ইহা সেবনে

ওলাউঠাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহার ইয়বা নাই। অতএব ইহার ব্যবহার অতীব সাবধানের সহিত হওয়া কর্তব্য। অজীর্ণরোগী অথবা দুর্বল ব্যক্তি যেন কদাচ ইহার আশ্বাদ গ্রহণ না করেন। টাঁই :—গুরু, বলকারক, মধুর, ও স্নিগ্ধ ; কিন্তু সহজপরিপাচ্য নহে। ভেট্‌কী মৎস্ত রোহিতের জায় গুণসম্পন্ন। খাল :—বায়ুপিত্তনাশক, বলকারক, কিন্তু ককবর্জক। বোয়াল :—গুরু, বলকারক, রক্তদূষক ও নিদ্রাকারক।

বেলিয়া :—মধুর, শীতল, পিত্তনাশক ও রক্তদোষনাশক ; ইহা রোগীর পথ্যবিশেষে অনায়াসে রোগে ব্যর্থের মংগা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

শিজি :—বায়ুশান্তিকর, স্নিগ্ধ, রোচক ও লঘু ; ইহা রোগীরপক্ষে বড়ই তৃপ্তিপ্রদ ; জেয়ল মৎস্তও এই শ্রেণীস্থ এবং রোগীর পথ্য জানিবে। মাগুর :—বায়ুনাশক, বলকারক, লঘু এবং পুষ্টিকর, ইহাও রোগীর পথ্য। কই মৎস্তকেও আমরা এই রোগীর পথ্য শ্রেণীতে ধরিয়া থাকি ; ইহা রুচিকারক, স্নিগ্ধ, মধুর, ক্ষুধাবর্জক, বায়ুনাশক, কিন্তু কিষ্কিৎ পিত্তজনক। সরলপুঁটি :—পিত্তনাশক, শীতল, মধুর, বায়ুনাশক, রুচিকারক ও কফনাশক ; অজীর্ণ রোগীর পক্ষে ইহা এবং পূর্বোক্ত রোগীর পথ্যরূপে নির্দিষ্ট মৎস্ত সকল বিশেষ উপকারক জানিবে।

চিঙ্গড়ী :—ক্ষুদ্রজাতীয় হইলে বায়ুপিত্তনাশক, লঘু ও রুচিকর ; কিন্তু গল্‌দা চিঃড়ী আহারে খুবই তৃপ্তি-

কর এবং পুষ্টিকারক হইলেও—বিশেষ উপকারক নহে ;
মৎস্যগ্নি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে উহা মোটেই স্নৈকলপ্রদ নহে ; বাদা

জাতীয় অল্প এক প্রকার চিংড়ী পাওয়া যায়, উহাও পেটের অসু-
খোৎপাদক জানিবে। এই চিংড়ী ও ইলিশ মৎস্ত হইতেই নানা-
প্রকার উদরের গোলযোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, অল্প কোন
জাতীয় মৎস্তেই উহাদের জায় অপকার হইতে দেখা যায়
না ; অতএব এই দুই জাতীয় মৎস্ত ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ
সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

খয়রা মৎস্য :—সামান্য পিত্তজনক, বায়ুনাশক এবং
সহজ পরিপাচ্য নহে। টেঙ্গরা মৎস্ত :—বেশ রুচিকারক ও
মেধাবর্ধক বটে, কিন্তু বায়ুপিত্তজনক, মেদঃক্ষয়কর ; ইহাও
সহজ পরিপাচ্য নহে। চেঙ্গ মৎস্ত মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল ও লঘু।
বানমৎস্য :—রক্তপিত্তশাস্তিকর, কফনাশক ও বলবর্ধক।

ক্ষুদ্রমৎস্ত মাত্রেই থাকিতে মিষ্ট, বায়ুপিত্ত ও কফনাশক, রুচি-
বর্ধক, লঘুপাক, বলবর্ধক এবং সুপথা। মৎস্যের ডিম্ব
অতিশয় পুষ্টিকারক, বলবর্ধক, স্নিগ্ধকর, লঘু, কিন্তু কফজনক ও
মানিকর। শুক মৎস্ত বা নোনা মৎস্ত কোন প্রকারেই উপকারক
নহে ; উহা দুস্পাচ্য ও মলরোধক ; বহু লোকেই নোনা বা শুক
মৎস্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া
যায়, কিন্তু এ প্রথা বড়ই দুষ্টনীয়া এবং সর্বথা পরিভ্রান্ত।

ধনধান্তপুষ্পভরা, শ্রাবাকলা বহুজননার গৃহে, তরীতরকারী
ও কলমূল যেমন নানাজাতীয় স্তরে স্তরে শোভমান নৃষ্ট হয়,
সেইরূপ এতকাল খাল-বিল-নদী-তড়াগাদিও প্রচুরভাবে

বঙ্গজননীর সেবানিরত থাকায়, এখানে কোনকালে মৎস্তের অভাব দৃষ্ট হয় নাই; অপিচ স্থান বিশেষে নানাজাতীয় (পূর্ব-লিখিত প্রকার ব্যতীতও) মৎস্ত দেখিতে পাওয়া যাইত এবং এখনও যায়, কিন্তু কালের বশে ক্রমশঃ খালবিলাদির অভাব প্রযুক্ত আমাদের দেশও মৎস্ত শূন্য হইতে বসিয়াছে ! প্রকৃতির অন্ততম সৌন্দর্য্য, স্বচ্ছ সলিল-

রাশিতে স্বচ্ছন্দবিহার করিতে না পাই-

মৎস্যের বংশ

লোপের কারণ

গ্রাই যে, এই মৎস্ত বংশ লোপ

পাইতে বসিয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। বর্তমানে গবর্ণমেন্ট মৎস্তকুল বিনাশের কারণ নির্দেশ জ্ঞাত বহু টাকা ব্যয়ে মৎস্ত-কমিশন বসাইয়া উহার প্রতিকার কল্পে চেষ্টিত হইয়াছেন। কিন্তু কমিশন নির্দেশিত পন্থা আমরা সম্পূর্ণ সমীচিন বলিয়া বোধ করি না। ইহারা বলেন যে, ধীরকুল বড়ই অশিক্ষিত সুতরাং তাহারা অজানিত ভাবে ডিম সহিত মৎস্ত মারিয়া মারিয়াই উহাদের বংশ লোপ করিতে বসি-

য়াছে; সেজন্য এখন কমিশন নির্ধারিত পন্থায় ডিমপ্রসব সময় বাদ দিয়া মৎস্ত ধরিলে ব্যবস্থা হইতেছে! হায় যদি তাহাই সত্য হইত, তবে বোধ হয় এতদিন অভিধান হইতেই মৎস্ত নাম লোপ পাইয়া যাইত! লোকে কথায় বলে যে “মাছের মার পুত্রশোক”! অর্থাৎ মৎস্ত এতই ডিম প্রসব করে যে, তাহাদের তদ্ব্যবহারণা করা একেবারেই অসম্ভব; পুরুষ মৎস্ত কতক ডিম, প্রসব হইবা মাত্রেই তৎক্ষণাৎ ধাইয়া ফেলিতে থাকে, কতক সংখ্যা স্রোতের জলে কোথায় তাসিয়া যায় তাহার স্থিরতা থাকে না, কতক বা জীমৎস্ত সাবলাইয়া

রাশিতে চেষ্টা করে। এইরূপই আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ; তদুপরি নিত্য কত মৎস্ত রাশি যে বর্ষিত হইতেছে তাহারও সংখ্যা নাই, তথাপি উহা সমানরূপেই যোগাইত হই-
তেছিল। কিন্তু আজকাল হঠাৎ মৎস্তকুলের বংশ নাশের আশঙ্কা
প্রকটরূপে কেনই বা উদ্ভিত হইল ? আমাদিগের মনে হয়
যে খাল, বিল, নদী ও তড়াগাদির

দূষিত ভাব ও শুষ্কতাই ইহার কারণ।

মৎস্ত রক্ষার

প্রতিকার

যদি ঐ সমুদ্র খাল বিলাদি খননাদি
দ্বারা মৎস্তকুলের বাসস্থান-স্বচ্ছন্দতার উপর দৃষ্টি রাখা হয়, তাহা
হইলেই মৎস্তকুল পুনরায় বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। পরিকার জল
পানীয় জন্ত যেমন মনুষ্যকুলের প্রয়োজন তেমনি মৎস্তগণের

পক্ষে ও ইহা নিতান্ত আবশ্যক ! কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে
আজকাল ইহার অভাবেই নানাপীড়াদি সমুদ্ভূত হইয়া মানব-
কুলও যেমন আধিব্যাধিপীড়িত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হই-
তেছে, সেইরূপ মৎস্তকুলও বংশহীন হইয়া পড়িতেছে !!

পুঙ্খরিলী জাত মৎস্তই সর্বাপেক্ষা

কোন্ মৎস্ত প্রশস্ত

শ্রেষ্ঠ—ইহা মধুর, স্নিগ্ধ, বলকারক ও

বায়ুনাশক ; ইহার পরই খালবিলাদি জাত ও স্রোতবর্তী নদী-
জাত মৎস্ত। সমুদ্রতীরবর্তী স্থান সমুদ্রে সমুদ্রজাত নানাপ্রকার
মৎস্তাদি পাওয়া যায়, উহা প্রায়ই সহজ পরিপাচ্য নহে ;
বর্ষাকালে নদীজাত মৎস্ত অল্প সমাপেক্ষা কিঞ্চিৎ দুশ্চাচ্য
হইয়া থাকে।

মাংস ও মৎস্তের যুব সম্বন্ধেও একটু আলোচনা করা আব-

শুক ; সিদ্ধ মাংসের ঘূষ রুচিকারক, বায়ুপিত্তনাশক, তৃপ্তিকর এবং প্রমশান্তি করিয়া থাকে । দুর্বল

ও রোগাজীর্ণগণের পক্ষে ইহা বিশেষ

মৎস্ত ও মাংসের

ঘূষ

উপকারক ; কিন্তু ইহা প্রয়োগকালে

রোগীর ঔদরিক কোন গোলমাল বর্তমান আছে কিনা অনুসন্ধান করা কর্তব্য ; এরূপ স্থলে আমাদের মতে মাংসের ঘূষ না দিয়া লঘু ও সহজ পরিপাচ্য ক্ষুদ্র মৎস্তাদির ঘূষ দেওয়া প্রয়োজন ।

আজকাল অনেকে কাঁচা মাংসের ঘূষও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি না । স্থলবিশেষে মাংসাদির ঘূষ, দেওয়া আবশ্যক হয় এবং তখন ইহা চিকিৎসকের ব্যবস্থানুযায়ী হওয়াই কর্তব্য ; ইহার বদলে মৎস্ত-ঘূষ দেওয়া ব্যবস্থাও মন্দ নহে ; আমরা অনেক স্থলে এই ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি । টাইফয়েড, ইত্যাদি নিস্তেজকর রোগেও শ্রদ্ধাম্পদ পূজনীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী মহাশয়ের মতানুযায়ী আমরা ইহা ব্যবহার করিয়া সবিশেষ ফল পাইয়াছি ।

এ পর্য্যন্ত আমরা বধাসম্ভব তরী-তরকারী ও ফলমূল এবং মৎস্ত—মাংসের আলোচনাই করিয়া আসিলাম । তরী-তরকারী অথবা মৎস্ত মাংস আমরা রন্ধন করিয়া ভোজন করি এবং সেইরূপ রুচকগুলি মসলার প্রয়োজন হইয়া থাকে । এখানে ঐ সমস্ত মসলা ও পান (তামুল) সহিত যে মসলাদি আমরা নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার ও আলোচনা করা আবশ্যিক মনে করি ; ইহারা সাধারণতঃ সুধাবৃদ্ধি, ভক্ষ্যদ্রব্যে সুগন্ধ প্রদান এবং

পরিপাক যন্ত্রের শ্রাবণ ক্রিয়ার Secretion বন্ধ করিয়া থাকে।

উহাদের পরিপাচ্য ও অপরিপাচ্যতার উপরও আমাদের সাধা-
রণ পরিপাক শক্তি নির্ভর করিয়া থাকে। সরিষার তৈল

ছারাই আমাদের সমুদয় আহাৰ্য্য বস্তু

(অন্ন ব্যতীত) প্রস্তুত হইয়া থাকে ;

সরিষার তৈল

ইহা লঘু, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ ও রক্তপিত্তদূষক। আজকাল
কলের দ্বারা প্রস্তুত এই সরিষার তৈলে নানাপ্রকার ভেজাল
দ্রব্য মিশ্রিত থাকায়, ইহা ব্যবহারে বেরি বেরি ইত্যাদি
রক্তম রক্তম রোগের প্রাদুর্ভাব হইতে দেখা যাইতেছে। যদিও
হেল্‌থ অফিসারের মতে ভেজাল তৈল (সরিষার) বেরি বেরির
কারণ নহে বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তথাপি আমাদের মতে
উহা একেবারে দোষবর্জিত বলিয়া রোধ হয় না। ঘানির খাঁটি
সরিষার তৈল পাওয়া যাইলে, যাহা তাহা মিশ্রিত কলের তৈল

ব্যবহার করা কর্তব্য নহে ! রাই সরিষার গুঁড়া বা মাষ্টার্ড
mustard অনেকে ভাতে পোড়া বা তরী তরকারীর সহ ব্যব-
হার করিয়া থাকেন ; ইহা সামান্য গুরুপাকের হইয়া থাকে
এবং অত্যধিক সেবনে গলা ও বুকজ্বালা প্রভৃতি দেখা দিতে
পারে। পূর্ববঙ্গে এই সরিষা দিয়া এক প্রকার ঝাল কঁাসন্দি
প্রস্তুতীত হইয়া থাকে, বিলাতে প্রস্তুত মাষ্টার্ড অপেক্ষা তাহা
সহস্রগুণে উত্তম ; আমাদের এই প্রদেশেও আত্র (কাঁচা) সংযোগে
সরিষা দিয়া একপ্রকার কাসন্দি প্রস্তুত হইয়া থাকে ; এই
শেবোক্ত কাসন্দিতে অন্ন সংযোগ থাকায় আত্মদে মন্দ হয় না,
অথচ ঝাল কাসন্দির ন্যায় গুরুপাকেরও হয় না। অজীর্ণ রোগীর
ইহার ব্যবহারে সাবধান হওয়া কর্তব্য।

হরিত্রাই :—প্রায় সমুদয় রক্তন
করা দ্রব্যেই ইহা মিশ্রিত করা হয় ;

রক্তনের মসলা ।

ইহা ব্যবহারে রক্তদোষ, শোথ ও কামলা নষ্ট হইয়া থাকে ; পিত্ত ও কফনাশক এবং বর্ণজনক ক্ষমতাও ইহার দৃষ্ট হয় ; অনেক সময় অন্য মসলাদি না দিয়া, শুধু হরিত্রা ও ধনিয়া সংযোগেই ঝোলাদি প্রস্তুত করাইয়া রোগী বা তদবস্থাপন্ন লোকের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে । ধনিয়া :—লবু, ক্ষুধাবর্ধক, রুচিকারক, ত্রিদোষনাশক ; ইহা তৃষ্ণা, দাহ, বমি ও কৃমি নষ্ট করে । জীরা :—তিন প্রকার যথা গুল্ল, কৃষ্ণ এবং ক'লৌজী ; তিনের গুণ কিন্তু একই প্রকার । ইহা ক্ষুধাবর্ধক, অরুণশক্তি-বর্ধক, জরায়ুশোধক, রুচিকারক, চক্ষুর হিতকর, কফনাশক, পিত্তজনক, ও বলকারক । মরীচ :—(লঙ্কা) ক্ষুধাবর্ধক, রোচক, দাহকর ও কফনাশক ; ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে সংঘত হওয়া কর্তব্য ; অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে, বুকজালা, অগ্নি-মান্দ্য এবং অর্শ উৎপাদন করিতে পারে । স্থানভেদে ইহার ব্যবহার সম্বন্ধেও বিশেষ ভারতম্য লক্ষিত হইতে দেখা যায় ; পূর্ববঙ্গে প্রায় লোকেই বঙ্গের দক্ষিণ প্রদেশস্থ লোক অপেক্ষা ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকে । অজীর্ণ ও অর্শ রোগীর পক্ষে ইহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য ।

গোলমরীচ :—বিশেষ উপকারক ; অনেক সময় লঙ্কা মরীচ না দিয়া গোলমরীচ ব্যবহারে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করান হইয়া থাকে ; ইহা অতিশয় বায়ুনাশক, কফর এবং উৎকালি প্রস্রাবনক ও ক্ষুধিনাশক । বাহাদিগের পক্ষে লঙ্কার ঝাল

সহ্য হয় না, তাহাদিগের জন্ত ইহার ব্যবস্থা হওয়া কর্তব্য।
 হিং :—অনেক সময় বিশেষতঃ কল্যাণি ডালের সহিত
 ব্যবহৃত হইয়া গাকে ; ইহা উষ্ণ, ক্রটিকারক, পিত্তবর্জক,
 বলকারক ও রক্ত প্রবর্তক ; ইহা সেবন করিলে অনেক সময়
 বাবৎ উদগারে ইহার গন্ধ পাওয়া যায় বলিয়া, অনেকে ইহা পছন্দ
 করেন না। মেথি :—বায়ুনাশক, প্লেগ্মানাশক, ক্রটিকারক এবং
 স্ফূটাবর্জক ; রাঁধুনি :—ক্রটিকারক, তীক্ষ্ণ, পাচক ও বায়ুনাশক।
 তেজপত্র :—লঘু ও তীক্ষ্ণ ; ইহা বায়ু, কফ, গা বমি বমি ও
 অরুচি নাশ করে।

লবণ :—ভিন্ন রকম চলিতেই পারে না ; অলবণ সংযুক্ত
 কোন দ্রব্যই ক্রটিকারক নহে; ঝাল ও লবণ সমভাবে প্রয়োগ
 করিতে জানিলেই তাহাকে সুপাচক অথবা সুপাচিকা বলা
 হইয়া থাকে। ঝাল না হইলেও বরং খাওয়া চলিতে পারে,
 কিন্তু লবণ বিনা উহা প্রায় অসম্ভব। এই লবণ সাধারণতঃ
 আমরা সৈন্ধব, করকচ ও পাক্সা এই তিন ভাবে নিত্য ব্যব-
 হার করিয়া থাকি। ইহার মধ্যে সৈন্ধব ও করকচই বিস্তৃত
এবং হিন্দুর ব্যবহার্য্য ; পাক্সা লবণ গো-শূকরাদির রক্ত ও
 হাড় দ্বারা পরিশুদ্ধ করা হয়, সুতরাং অন্বদেশীয় হিন্দু
 মুসলমানের অব্যবহার্য্য। সৈন্ধব লবণ, ত্রিদোষনাশক,
 লবু, শীতল, বলকারক, রোচক এবং চক্ষুর উপকারক ও
 অগ্নিদীপক। করকচ লবণ নাতিশীতোষ্ণ, বায়ুনাশক, কফ-
 বর্জক ; পাক্সা লবণ শুষ্ক, শীতল, বায়ুনাশক হবিষ্য জন্ত
 সৈন্ধব লবণই ব্যবহৃত বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে ওণ
 বিচার করিয়া দেখিলেও উহাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

কোন কোন রোগে অবলবণ পথ্য দেওয়া হইয়া থাকে ;
সম্প্রতি বার্লিন নগরীয় এক ডাক্তারী পত্রে প্রকাশিত হই-
য়াছে যে, শিশুগণের গাত্রে একজিমা (Eczema) দেখা
বাইলে, উহাদিগকে লবণ বজ্জিত আহাৰ্য্য পদার্থ খাইতে

দেওয়ার, একজিমা ৪১৬ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সারিয়া
বাইতে দেখা গিয়াছে । ইহা পাঠে এই সিদ্ধান্তও করা যাইতে
পারে যে, স্তন্যপায়ী শিশুগণের একজিমা,

সম্ভবতঃ তাহাদের মাতা অথবা স্তন্য-
দাত্রীর অতিরিক্ত লবণ আহার জন্ত

অলবণ খাদ্য

ব্যবহা,

উদ্ভূত হইয়া থাকে এবং স্তন্যদাত্রী লবণবজ্জিত খাদ্য আহার
করিতে আরম্ভ করিলেই, অচিরে শিশুকে ঐ পীড়া হইতে
উদ্ধৃত্ত করাইতে পারেন । পূৰ্ণবয়স্কের শরীরে একজিমা দেখা
দিলেও এই ব্যবস্থায় বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে । খাদ্যদ্রব্য
লবণ সংমিশ্রণ করা হয় কেবল উহা আশ্বাসজনক করিবার
জন্ত, নতুবা ঐ লবণে পরিপাক ক্রিয়া অথবা শারীরিক অণু
কোন উপকার হয় না । একজিমা ব্যতীত শোথ এবং মূত্র-
যন্ত্রীয় (Kidney) অস্ত্রান্ত রোগেও ইহা বর্জন করা
আবশ্যক ।

পান :—রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, লঘু, বলকারক, স্নেহনাশক,
মূত্ৰের হ্রগ্ধ নিবারক, এবং বায়ু ও শ্রমশাস্তিকর । মসলাদি সহ
আহারান্তে ইহা চৰ্ণন করা কর্তব্য ; ইহা দ্বারা মূত্ৰের জড়তা-
নাশ ও কাস্তিবর্জন ; হইয়া থাকে । ঘন

ঘন ও অত্যধিক মাত্রায় ইহা সেবন

পান ও তাহার
মসলাদি

বিধেয় নহে। কারণ তাহাতে দস্ত, দৃষ্টি, কেশ, শ্রবণেন্দ্রিয় ও অগ্নির বলহানি, বায়ু ও পিত্তের বৃদ্ধি এবং রক্তবিকৃতি উপস্থিত হয়। যাহাদিগের দস্ত দুর্বল, তাহাদের ইহা ব্যবহার করা কর্তব্য নহে ; ক্ষুধার সময়েও ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ, কারণ তাহাতে ক্ষুধার লোপ হইয়া থাকে।

সুপারিই :—পানের প্রধান মসলা ; ইহা গুরু, শীতল, কফপিত্তনাশক, রোচক ও মোহকর। কাঁচা সুপারি, অগ্নিমান্দ্য-কর, দৃষ্টিশক্তির ধ্বংসাত্মক এবং মোহ উৎপাদক। কিছুদিন পূর্বে “পানি পোকা” সম্বন্ধে যে সমুদয় বিবাক্ত রোগীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, তৎসমুদয়ই সুপারির এই গুণ হেতু উদ্ধৃত জানিবে। কাঁচা এবং কোন কোন প্রকারের সুপারি খাইয়া অনেক সময় বিশেষ “বোর” লাগে এবং শ্বাসবদ্ধ হইয়া আইসার ভায় বোধ হয় এবং সেই সঙ্গে মুহূর্ত্ত ঘৰ্ণও হইতে দেখা যায়। পানের সহিত সুপারি অধিক খাইলে, উহা দন্তের মধ্যে লাগিয়া লাগিয়া দস্তবেষ্টের হানি করার দস্ত নড়িয়া যাইতে পারে। **চূণ :**—পানের একটি প্রধান অঙ্গ ; ইহা বাতিরেকে পান খাওয়া চলিতেই পারে না। ইহা বাতশ্লেষ্মা, অগ্নিপিত্ত, শূল, গ্রহণী এবং কৃমি নষ্ট করিয়া থাকে ; কিন্তু ইহা অত্যধিক মাত্রায় ব্যবহার করা কর্তব্য নহে, কারণ উহাতে রেনাল কলিক (Renal colic) বা বৃক্কক শূল এবং পাথুরী

Gravel জন্মাইতে পারে। যাহাদিগের এই পীড়া বর্তমান আছে, তাহাদিগের ইহা ব্যবহার না করাই কর্তব্য। চুণের জলের আবার গুণ পৃথক দেখিতে পাওয়া যায় ; (এক কোয়ার্ট

বোতল জলে এক ছাটক গুঁড়া চূণ মিশাইয়া ২৪ঘণ্টা যাবৎ
উহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলেই

চূণের জল

চূণের জল প্রস্তুত হইয়া যায়।)

অজীর্ণতার ইহা সেবনে মহত্বপূর্ণকার দেখা যায়; পেটকাঁপা
ও অজীর্ণ অশচারণনিত দান্ত হইতে থাকিলে শিশুগণকে ছুঙ্কের
সহিত সামান্য মাত্রায় ইহা সেবন করিতে দিলে, খুব সস্তর উক্ত-
দোষ বিদূরীত হইতে দেখা গিয়াছে। বহুব্রূ, শূল ও অন্নপিত্ত
রোগেও ছুঙ্কের সহিত ইহার ব্যবহার করিতে দেওয়া কর্তব্য।

মৌরী :—বায়ু ও কফনাশক, ক্ষুধাবর্দ্ধক, লঘু ও উষ্ণ ;
ইহা অগ্নিমান্দ্য, শূল, ক্রিমি, বমন কোষ্ঠবদ্ধতা, ও ঘোনিশূল
নষ্ট করে। অরে অতিরিক্ত তৃষ্ণা ও গা বমি বমি ভাব বর্ধ-
মান্, ইহা ভিজান জল ব্যবহারে অনেক স্থলে শান্তিলাভ
হইতে দেখা যায়। ঘোয়ান :—রুচিকারক, লঘু, বমি ও শূল-
নাশক এবং অগ্নিদীপক ; ইহা ব্যবহারে অজীর্ণতা সৰ্বদ্বার উদ্-
ঘরোগ, প্রীহা, ক্ষুধা ও ক্রিমি নষ্ট হইয়া থাকে। আজকাল ঘোয়ানের
আরও প্রায় অধিকাংশ অজীর্ণরোগীই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এল্লাইচ :—(বড়) অগ্নিকারক, লঘু ও উষ্ণ ; ইহার দ্বারা
গা বমি বমি, তৃষ্ণা, বমন প্রভৃতি বিনষ্ট হয় ; ছোট
এল্লাইচ :—নীতল, লঘু ও বায়ুনাশক। লারুচিনি :—বায়ু ও
শিশুনাশক ; অক্রমক এবং পরীয়ের উৎকৃষ্ট বর্ণনাধক ; মুখ-
শোষ ও তৃষ্ণাও ইহা দূরীত করে। লবঙ্গ :—রোচক, নীতল,
লঘু ও চক্ষুর বিককক ; ইহার ব্যবহারে কাশি, পেটকাঁপা,
বমন, তৃষ্ণা ও হিকা নিবারিত হইয়া থাকে। প্রদীপের নীচে ইহা

দুগ্ধ করিয়া সেবনে অনেক সময় উৎকর্ষশি কথিয়া যায়।

জয়িত্রীঃ—উষ্ণ, রোচক, দুর্গন্ধনাশক এবং বর্ণের উৎকর্ষসাধক।

এলাইচ, দারুচিনি, লবঙ্গ ও জয়িত্রী ইহারা প্রায়ই সমভণ্ড বিশিষ্ট; রন্ধনের মশলা রূপেও ইহারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল দ্রব্যাদি প্রায়ই উষ্ণ, স্নাত্তরং ইহারা একত্রে গরম মশলা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি এবং মিষ্টদ্রব্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই বধাসম্ভব সমুদয় ঋতুদ্রব্যই আলোচিত হইয়া যাইবে; দুগ্ধ এবং জল পানীয় পদার্থ বলিয়া উহারা পৃথক স্থানে পরে বর্ণিত হইবে। দধিঃ—উষ্ণ, স্নিগ্ধ, শুষ্ক; ইহা ভোজনে কফরুদ্ধি হইয়া থাকে; রাত্রি কফরুদ্ধির সময় “ন

দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি

রাত্রৌ দধি-ভোজনং” ইতি নিষেধ বাক্যে

উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সকল প্রকার দধির মধ্যে গো দুগ্ধের দধিই উৎকৃষ্ট; ইহা অন্ন, রুচিপ্রদ, বায়ুনাশক ও পুষ্টিকর। মাহিষদধি শুষ্ক, রক্তদূষক, কফজনক ও বায়ুপিত্তনাশক। পক্ষ দুগ্ধজাত দধি রুচিকারক, সমুদয় ঋতুপুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ, অগ্নি ও বলবর্দ্ধক এবং বায়ুপিত্তনাশক। চিনির সহিত দধি সেবনে, শরীরস্থ বায়ুনাশ ও তৃপ্তিকর হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা শুষ্ক-পরিপাক হইয়া পড়ে। অন্নদধি অপেক্ষা চিনিপাক অধিক মিষ্টরসাদিক্যবুজ্জ দধি স্বাদ্য যোজ্যবহ। দধির সহ্য করিবার ক্ষমতা-কর, বায়ুনাশক, কফপিত্তবর্দ্ধক ও কোষ্ঠপরিষ্কারক এবং শুষ্ক; ইহার মাত, অন্ন, রুচিপ্রদ, লঘু, বলকারক, বায়ুকফনাশক, তৃপ্তিজনক ও তৃষ্ণা নিবারক; অজীর্ণরোগীর পক্ষে ইহার

ব্যবহার উত্তম ব্যবস্থায় ঘোল :—লবু, প্রীতিজনক, অন্নরস,
 বায়ুনাশক এবং গ্রহণী প্রভৃতি রোগে
 সুপথ্য । জীর্ণ হইয়া উহা স্বাহরসে

হৃদি ও ঘোল

পরিণত হয় বলিয়া, ইহাতে পিত্ত প্রকৃপিত করে না এবং কফ

নিবারণ করে । চিনি মিশ্রিত ঘোল বায়ুশিথলনাশক, তৃপ্তিজনক
 এবং রসালবৎ গুণকারী ; গরম হৃদয়ে কিঞ্চিৎ লেবুর রস দিয়া
 ছানা কাটাওয়া সন্তোজাত ঘোলই আমরা প্রশস্ত মনে করি ।
 বাসি হৃদয়ের ঘোল অপেক্ষা ইহা অধিক গুণসম্পন্ন ; ‘অজীর্ণ-
 দোষসম্পন্ন ব্যক্তিষাত্রকেই আমরা ইহা সেবন করিতে ব্যবস্থা
 দিয়া থাকি । ঘোল সেবী ব্যক্তি কখন পীড়াগ্রস্ত হয় না এবং
 রোগ বর্জন্যে উহা প্রবলতর হইতে পারে না । ঘোল হইতে
সম্পূর্ণরূপে দূত উদ্ধৃত করিয়া লইলে, উহা অতিশয় লঘু
 ও সুপথ্য হয় ; দূত উদ্ধার না করিলে, উহা গুরু,
 পুষ্টিকর ও স্নেহবর্জক হয় ; সৈদ্ধব লবনের সহিত ঘোল
 সেবনে বায়ু প্রশমিত, চিনির সহিত সেবনে পিত্ত প্রশমিত
 এবং বরীচ ও লিঙ্গুল চূর্ণের সহিত সেবনে কফাধিক্য প্রশ-
 মিত হইয়া থাকে । মল্লারিতে ও অরুচিতে ঘোল অব্যততুল্য
হিতকারী ; অতিসার, শূল, উদররোগ, অরুচি, গ্রহণী, ওদ্রা,
 কৃমি প্রভৃতি রোগও ইহাতে নিবারিত হইয়া থাকে ।

এতকাল পরে পাশ্চাত্য জগৎ ইহার গুণ উপলব্ধি করিয়া
 আপনাদের আবিষ্কারের কথা উচ্চৈঃ-
 স্বরে ঘোষণা করিতেছেন ! প্যারিস
 নগরস্থ পাটুর বিদ্যালয়ের প্রধান

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে
 ঘোল ব্যবস্থা

অধ্যক্ষ ডাক্তার মেট্চিনকফ (Dr. Metchinkoff) এই বিষয়ের আবিষ্কারক । তিনি বলেন যে, ঘোলে ল্যাকটিক অসিড (Lactic Acid) থাকায় উহা নিরক্ষিত সেবনে অকাল বার্কক্য জন্মিতে পারে না । বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক যুগে যুক্তিদর্শন করাইয়া দেওয়া ব্যতীত, শুধু একটা কথা বলিলেই পণ্ডিতসমাজ তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন । সুতরাং মেট্চিনকফ সাহেবকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিও দেখাইতে হইয়াছে, যথা :—“মানবের পরিপাকযন্ত্রের বিধান মধো নানা প্রকারের পৃথক পৃথক ব্যাসিলাস্ (Bacillus) অর্থাৎ জীবাণু বর্তমান আছে এবং তাহারা পরিপাকযন্ত্রীয় নলপথের সাধারণ বাসিন্দা ; বাস্তবিক যদি উহারা তথায় বর্তমান না থাকিত, তাহা হইলে পরিপাক সম্বন্ধীয় কতক কার্য সম্পাদন হইতেই পারিত না । বিশেষতঃ, বৃহদন্ত্রে ব্যাসিলাস্ কোলাই Bacillus coli নামক এক প্রকার জীবাণু অধিষ্ঠান করিয়া থাকে ; উহারাও ক্ষতিকারক নহে এবং ঐ স্থানের স্বভাবত প্রজা হইয়া পরিপাক সম্বন্ধে সাহায্য করিয়া থাকে বটে, কিন্তু উহারা সময়ে সময়ে অসংখ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া উঠে । ভ্রমাস্তক এবং অবৈধ ষাণ্টাদি ভোজন (যাহ । আজকাল সভ্যতার অঙ্গীভূত হইয়া উঠিয়াছে) হেতুই উহারা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । আমাদের শরীর মধ্যে এই ব্যাসিলাস্ কোলাই নামক জীবাণু অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধিত হইলেই, আমাদের শরীরগঠন পরিবর্তিত হইয়া, অকাল

মেই বার্কক্য জনোচিত অবস্থা আনাইয়া দেয় । এই অকাল

বার্জিক্যাবস্থা যদি বিচ্ছিন্ন করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে অস্ত্রের পূৰ্বোক্ত জীবাণুর বর্জিতসংখ্যা হ্রাস করা প্রয়ো-

অকাল বার্জিক্য ও
বোল ।

জন । ল্যাক্টিক আসিডের (Lactic Acid) এই জীবাণু হ্রাসকারী ক্ষমতা বর্তমান আছে এবং এই ল্যাক্টিক আসিড্ অতি সহজ উপায়েই বোল হইতে পাওয়া যায় ।” সুতরাং

দেখা যাইতেছে যে, বোল সেবনে দীর্ঘজীবন লাভের সম্ভাবনাও যে আছে তাহা ডাক্তার সাহেব বলিয়া দিতেছেন । ফ্লেটিন্‌ক্ সাহেব নিজ যুক্তির অকাট্যতা প্রমাণ করিয়া, কয়েকটি জন্তুর উপর এই ল্যাক্টিক আসিডের প্রয়োগকালে কিরূপ আশ্চর্যজনক ফল পাইয়াছেন তাহাও ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন । বোল সেবনে দীর্ঘজীবন লাভ হউক বা না হউক, উহা যে পরিপাক যন্ত্রের নানা প্রকার উপদ্রাব—পাকাশয়ের প্রতিশ্রায় হইতে রক্তমাশয় পর্যন্ত সমুদয় বিকৃতাবস্থারই—বিনাশ করিয়া থাকে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই । পাশ্চাত্য জগৎ এতকাল পরে ইহা যে, জ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন তাহাও সুখের বিষয় ! কিন্তু ভারত-বর্ষ যে কত সহস্র বৎসর পূর্ব হইতে এই তথ্য অবগত ছিল, তাহা অজ্ঞদেশীয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমরা—ভারতবাসীরাও—এখন আর অবগত নহি !! .

সূত্র :- সাধারণতঃ অগ্নিদীপ্তিকর, চক্ষুর হিতকর, বায়ু-
পিত্তশান্তিকর, জীবণাবর্দ্ধক, তেজস্কর, অরুণশক্তিবর্দ্ধক, শুক্র,
শীতল, স্নিগ্ধ এবং শ্লেষ্মজনক ; বৃত্তগানে রক্তদোষ, ত্রণ, শূল
ইত্যাদি উপশমিত হয় । সকল বৃত্ত অপেক্ষা গব্য অর্থাৎ পাওয়া

ঘৃতই শ্রেষ্ঠ; ইহা ত্রিদোষনাশক, শীতল, অগ্নিকারক এবং চক্ষুর বিশেষ হিতকর; স্মৃতিশক্তি, কান্তি, তেজ ও ওজঃ বর্দ্ধনকারী, পবিত্র, বলকারক, গুরু, রোচক, সুগন্ধবুদ্ভু এবং আয়ু-বৃদ্ধিকর। প্রত্যেক আধিদৈবিক ক্রিয়ায় হিন্দুর ইহাই অবশ্য প্রয়োজনীয়। “চোখ ওঠায়” চক্ষে ইহা প্রয়োগে সত্ত্বর আরোগ্য লাভ হইতে দেখা গিয়াছে; যেমন কেন ক্ষত হউক না, ইহার প্রয়োগে সুফল ফলিবেই ফলিবে, কিন্তু এই গব্যঘৃত বিশুদ্ধ

হওয়া চাই। কাঁচা ঘৃত, পাতে

খাওয়া সকলের শরীরে সহ্য হয় না,

উহা গরম করিয়া খাওয়া উচিত।

ইহা ও তাহার
গুণাদি

গাওয়া ঘৃত খাইয়া প্রায়ই কোন বিশেষ অসুখাদি হয়

না, কিন্তু “ভয়সা” অর্থাৎ মাহিব ঘৃত খাইয়া অসুখ উৎপন্ন

হইতে দেখা গিয়াছে—কিন্তু তাহাও শুদ্ধ ঘৃতেই দোষে নহে—

ঐ ঘৃত সহ “ভেজাল” মিশান জন্তই প্রায় স্থলে অসুখাদি

উৎপন্ন হইয়া থাকে। গব্যঘৃতে ভেজাল মিশাইবার যো

নাই, কারণ তাহাতে গব্যঘৃতে প্রকৃত সুগন্ধ রক্ষা হয় না।

ভয়সা ঘৃতও রক্তপিত্তশাস্তিকর, বায়ুনাশক, গুরু, শীতল ও

বৃষ্য। সহরে খাবারের দোকানের এই

ভেজাল ঘৃত দ্বারা প্রস্তুত করা খাদ্য-

দ্রব্যাদি খাইয়াই যে সহরস্থ পনের

ভেজাল ভয়সা ঘৃতই
অজীর্ণের কারণ

আনা লোক, অজীর্ণরোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন তাহা আমরা

পূর্বেও একস্থানে বলিয়া আসিয়াছি। পরস্য দিয়া খাবার ভ্রমে

আমরা বিশ্বাস করিতেছি, এই কথা বতদিন আমরা বুঝিতে

মা পারিব, ততদিন অজীর্ণ রান্ধসীর হাত হইতে নিস্তারের উপায় বড় দেখি না ! ইহাই যে একমাত্র কারণ, আমরা একান্ত বলি মা, তবে ইহাও যে একটি প্রধান কারণ সে বিষয়ে কাহারও যতভেদ হইবার আশঙ্কা নাই। দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন হৃত পান করিলে, পিত্তজনিত দাহ, রক্তদোষ, নেত্ররোগ ও বায়ু মষ্ট হয় ; পূর্বদিবসীয় দধিজাত দৃত, অতিশয় রোচক, বলকর, ও পুষ্টিকারক। ভোজন কল্প নূতন দৃতই

নূতন ও পুরাতন
দৃত

ব্যবস্থের জামিবে এবং শ্রমশাস্তি, বল-
কর ও চক্ষুরোগেও নূতন দৃত ব্যবহা

করা কর্তব্য। এক বৎসর পূর্বকার প্রস্তুত করা দৃতকেই

পুরাতন দৃত বলা যায়। ইহা ত্রিদোষনাশক। দৃত সমুদয়

দৃতই পুরাতন হইবে, ততই উহাদের গুণবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বন্ধে রেয়া করিয়া থাকিলে, পুরাতন দৃত দ্বাণিষা দ্বারা বিশেষ উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। বালক বা বৃদ্ধের পক্ষে, কাশরোগে অথবা তদ্বৎ উৎপন্ন রোগে, তরুণ পীড়ায়, অগ্নিমান্দ্য ও অরে দৃত ভোজন নিষিদ্ধ।

নবনীত :—সত্ত উদ্ধৃত হইলে লঘু, শীতল, বরুণশক্তি-বর্দ্ধক ও স্নাত্ত্ব হইয়া থাকে ; দুগ্ধোৎপন্ন নবনীত চক্ষুর হিত-কর, রক্তপিত্তনাশক, শীতল, বলকারক এবং অতিশয় বিদ্র। ইহা শিশু, বালক ও বৃদ্ধ, সকলেরই পক্ষে অগ্নিকর, হিতকর, এবং কীতিবর্দ্ধক।

আমরা নিত্য যে সমুদয় মিষ্ট
দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা

মিষ্ট দ্রব্যাদি

সদ্ব্যবহারে পূর্ববর্ণিত দুইজাত দ্রব্যাদি সহ চিনি, মিছরী অথবা গুড় সংযোগেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং এই তিন দ্রব্যের পৃথক আলোচনা করা হইলেই আর নামানুসারে মিষ্টানের সমালোচনা করার প্রয়োজন হইবে না।

গুড় :—নিষ্ক, গুড়, কুমিজনক, রক্তশোধক, শ্লেষ্মাকারক, বাতনাশক, ক্রান্ত পিত্তনাশক নহে। পুরাতন গুড়ই অগ্নিকারক, বায়ুপিত্তনাশক, রক্তশোধক, পুষ্টিকর এবং ঔষধরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। মৃতন গুড় অগ্নিকারক

মৃতন ও পুরাতন
গুড়

বটে, কিন্তু উহা সেবনে কফ ও ক্রমি উপস্থিত হয়। আদার সহ নিত্য গুড় সেবনে শ্লেষ্মা, হরিডকীর সহ সেবনে পিত্ত, এবং জঠরের সহ সেবনে বায়ুরোগ নষ্ট হয় বলিয়া

আয়ুর্কোষে কথিত আছে। বাড় গুড়, শীতল, বায়ুপিত্তনাশক, নিষ্ক, চক্ষুর হিতকর এবং বলকারক ; একমাত্র ইহা ব্যতীত হবিষ্যের অন্ত অন্ত গুড়ের ব্যবস্থা নাই। খেজুর ও ইক্ষু হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহাদের নামেই গুড় দুই প্রকারে প্রচলিত। (উভয়ের পৃথক গুণ অন্ত খেজুর ও ইক্ষুর গুণ-বর্ণিত স্থান জটব্য)।

চিনি :—বায়ুপিত্তনাশক, রক্তদোষকারক, স্নানশীতল এবং দাহশাস্তিকর। মিছরী :—গণ্ডু, বায়ুপিত্তশাস্তিকর, রক্তদোষনিব্ধারক, ভেদক ও বলকর। উভয়ই এক গুণসম্পন্ন, তবে মিছরী অধিকতর বায়ু ও মলের প্রকর্ষক বলিয়া

চিনি ও মিছরীর
গুণ

অধিক উপকারক। ১০ পেট গরম অর্থাৎ অজীর্ণাদি নাশ জন্য মিছরী ভিজান জল পানের ব্যবস্থা আছে, চিনি ভিজান জলে উহা হয় না। মধু :—শীতল, লঘু, চক্ষুর হিতকর, ক্রচিকারক, স্বরের উৎকর্ষসাধক, মেধাজনক ও অন্ন বায়ু প্রকোপক। ইহা সেবনে কৃষি, ক্রান্তি, তৃষ্ণা, বমি, দাহ ইত্যাদি উপশমিত হয়। মধুর মধ্যে মোমাছি কর্তৃক সঞ্চিত মধুই লঘু এবং সর্ষপ্ত্রেষ্ঠ; পদ্মমধু নেত্রের পক্ষে সর্বিশেষ উপকারক।

অজীর্ণরোগীর পক্ষে মিষ্টদ্রব্যাদির অযথা ব্যবহার বড়ই ফষ্টের কারণ হইয়া পড়ে এবং অতিরিক্ত মাত্রায় মিষ্টদ্রব্য ভোজনে কৃষির উপদ্রবও বাড়িয়া উঠে; এ কারণ মিষ্টদ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধেও সংযতভাব ধারণ করা কর্তব্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পানীয় প্রস্তাব।

জল, দুগ্ধ, মদ, চা ইত্যাদি।

পানীয়ের মধ্যে জলই সর্বপ্রথম এবং সর্ব জীবের অবশ্য প্রয়োজনীয় পদার্থ; ইহার অভাব নাম, অমৃত ও জীবন। যেমন বায়ু বিনা জগতে জীবের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব, তদ্রূপ এই জল বিনাও জীব সম্ভাবিত থাকিতে পারে না। ইহা বলকর,

তৃপ্তিজনক, শীতল, লঘু, সতত হিত-

কর, ও অমৃতসদৃশ জীবনীশক্তি-

জলের সাধারণ

গুণ

সম্পন্ন। ইহা দ্বারা শ্রম, তৃষ্ণা, ঘূর্ছা,

মলরোধ, ব্যমি ও অজীর্ণ প্রভৃতিও নিবারিত হয়। ধূলি-

কণা বা ময়লাদি বিবর্জিত স্থিতির জলই সর্বোৎকৃষ্ট; পূর্বত

গাত্র বিশোধিত হইয়া যে স্থিতির জল পতিত হয়, তাহা সংগ্রহ

করিয়া রাখিতে পারিলে, উৎকৃষ্ট পানীয় জল হইতে পারে।

এই প্রকারে সংগৃহীত জল দ্বারাই সমৃদ্ধ জব্বলপুর সহরে

জল সরবরাহ হইয়া থাকে; এই জলের রিজার্ভার

(Reservoir) ঐ স্থানের একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিষ। এই

জল বায়ুপ্তনাশক, লঘু, তৃপ্তিকারক,

উন্নত জল

আহ্লাদজনক, পাচক ও বৃদ্ধিপ্রদ।

বর্ষাকালের স্থিতির জল বিশেষ উপকারক নহে। শিলাজাত

জল বা বরফ জল অমৃতসদৃশ, কিন্তু গুরু, ঘন, প্তনাশক ও

বাতশ্লেষজনক; ইহা বায়ু এবং মলকে স্তম্ভিত রাখে।

অনেকে গ্রীষ্মকালে আহার সময়ে বরফ জল পান করিয়া

থাকেন; ইহা পরিপাকের পক্ষে সুবিধাজনক নহে, কারণ

পাকস্থলিতে একই সময়ে গরম ও অতিশয় শীতল দ্রব্য যাইতে

দেওয়া কৰ্ত্তব্য নহে। যেমন অতিশয় গরম দ্রব্যে হজম

ক্রিয়া ব্যাঘাতযুক্ত হয়, সেইরূপ অতিশয় শীতল দ্রব্যেও উহা

পরিপাকের পক্ষে বাধা জন্মাইয়া থাকে। হস্তের পশ্চাত্তাগে

একখণ্ড বরফ রাখিলে দেখিতে পাইবে যে, ক্রমে পয়েই

উহার চর্ম মলিন (কেকাশে) বর্ণ পয়ে লাল ও গরম হইয়া

উঠিয়াছে ; চর্ম্মের উপরে যাহা দেখা যায়, পাকস্থলীর মধ্যেও যাইয়া বরফ তাহাই উৎপাদন করে জানিবে। বরফ জলে অজীর্ণতা

বা বরফ জল পানে পাকস্থলীর আবরণ রক্তাধিক্যযুক্ত (congested) হইয়া ডিস্পেপ্সিয়া উৎপন্ন করিতে সাহায্য করে। তৃষ্ণা নিবারণ কর্ণেও বাহারা এই বরফশীতল জল গ্রহণ করেন বা গ্রহণ করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের বুঝা উচিত যে, ইহাতে পিপাসা না কমাইয়া বরং আরও বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। অতিরিক্ত মাত্রায় ইহা পান করিলে পেট গরম হইয়া পড়ে ; ইহার ফলস্বরূপ

উদরাময়াদিও দেখা দিতে পারে। ওলাউঠাদি পীড়ায় অতিরিক্ত তৃষ্ণা বর্ত্তমানে, আমরা বরফ জল দেওয়া দূরের কথা, তৎপরিবর্ত্তে সহায়ত গরম জলই বরফ ও তৃষ্ণা
পানীয়ের জন্ত ব্যবস্থা করিয়া থাকি।

অতিরিক্ত বরফ ব্যবহারে যে কত বিপদ সংঘটিত হইতে পারে তাহা এখানে বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে।

বৃষ্টির জলের নিম্নেই নদীর জল প্রশস্ত—এই নদীর জল ধ্বংসোত্তমুক্ত নদীর হওয়া চাই—ও ইহা লঘু ; শৈব-লাদি সঞ্চিত, স্রোতোহীন অথবা স্বল্পস্রোতা নদীর জল গুরু জানিবে। স্রোতবতী নদীর জল স্রুপের হওয়ার কারণ এই যে, নদীমধ্যে নানাপ্রকার আবর্জনা পতিত হইতে থাকিলেও, স্রোতোবেগ এবং বহুদূর পর্য্যন্ত বায়ুতে উন্মুক্ত (exposed) থাকার ইহার দূষিততাব দাঁড়াইতে পারে না। এই কারণ-

এই হিমালয় পর্বতোদ্ভূত নদী সকলের
জল বিশেষ উপকারক। সকল নদীর
মধ্যে আবার গঙ্গার জলই সর্বশ্রেষ্ঠ। এখানে ধর্মভাবের
কোন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে এবং আমাদের দেশীয়
লোকের কথাও বলিতে চাহি না। বিদেশীয় পর্যটক সুবিখ্যাত
মার্ক টোয়েন (Mark Twain) সাহেব রাসায়নিক উপায়ে সমু-
দয় জল পরীক্ষা করিয়া, এই গঙ্গাজলই একমাত্র কীটনাশক
(Bacilli-destroyer) বলিয়া উহার গ্রহে লিখিয়া গিয়াছেন।
সকল জলই কীটনাশ হাড়িয়া দিলে, সংজীবনকার্য থাকিতে
দেখা গিয়াছিল, কিন্তু গঙ্গার জলে উহা অধিকতর জীবিত
থাকিতে পারে নাই। ইহা দেখিয়া তিনি যত্নবান প্রকাশ
করিয়া গিয়াছেন যে “হিন্দুগণ এই বৈজ্ঞানিক তথ্য আধুনিক
কালের বহু পূর্বেই অবগত ছিলেন—এমন কি আধুনিক
সত্যযুগের অর্থাৎ খৃষ্ট জন্মাব্দের সহস্র বৎসর পূর্বেও, এই
বিষয় উহাদের জ্ঞানের অগোচর ছিল না—তাই গঙ্গাজলকেই
উহার পবিত্রতম বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।”

তাই হিন্দু! আধুনিক সত্যতাতিশায়ী পাশ্চাত্য শিক্তি
হিন্দু! এমন বুঝিলে কি যে তোমাদের পুরাকায়ের ঐতিহ্য
কেবল মাত্র কলহলাদি ভোজনকারী থাকিয়া অবশ্য। কালক্রম
বটনার পুরাণাদি বর্ণন করিয়া যান নাই !!! ইতিহাসের আব-
রণে বাহ্য কিছু সত্য, বাহ্য কিছু সার,
সমুদয়ই ধর্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি হইতে
সংগ্রহ করিয়া, অটলতা টুকু মাত্র বাদ দিয়া তোমাদের পুণ্য

শান্তি, তথা মোক্ষপ্রাপ্তির পর্যন্ত পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। মনে করিও না যে, বিংশ শতাব্দীর দর্শন বিজ্ঞান, তোমার ঘরে বাহ্য ছিল তাহা অপেক্ষাও কিছু নূতন জিনিষ দিতে পারিয়াছে! রাবারের পুস্পকধানের কথা শুনিয়া আমরা হাস্ত করিতাম, কিন্তু আজকাল “এরোগ্রেন” বা উড়ো জাহাজের কথা শুনিয়া বা দেখিয়া কি আর হাসিয়া থাকি? এখন স্বতঃই মনে হয় হয়ত তখনও ইহাই ছিল! যতক্ষণ পান্ধাতা পণ্ডিতগণের নিকট হইতে আমরা পূর্বতন ঋষিগণের গুণবস্থা ও তাঁহাদের দর্শন-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতার পরিচয় না পাইতেছি, ততক্ষণ ত আর আমরা উহা মানিয়া লইতে ছিনা! হার! এতই আমরা পরম্ব্যাপেক্ষী!!!

নদীজলের নিরেই নিকর জল; ইহা রচিকারক, লঘু পিত্ত ও কফনাশক, কোষ্ঠপরিষ্কারক এবং মধুর; অজীর্ণতা-দোষ নিবারণজন্ত অনেক সময়ে, কোন কোন বিশিষ্ট Spring water অর্থাৎ নিকর জল ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। সচরাচর

আমাদের দেশীর “সীতাকুণ্ডের জল” ও “ঘাটশিলার জল” এই জন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিদেশীয় এই ভাটীর জলের মধ্যে “আপেন্টা” “ভিচি” প্রভৃতিই প্রসিদ্ধ। পল্লীগ্রামে এবং বধ্য নিকটে নদী বর্তমান নাই, তথ্য প্রায়ই ইন্দার অথবা কুপজলই পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। যে ইন্দার বা কুপ হইতে সর্বদা জল উত্তোলিত হইয়া থাকে এবং পল্লীর হইতে দেখা যায়, অনেক সময় তাহার জল নির্দোষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইন্দারের জল সুস্বাদু হইলে উহা বায়ু-

পিত্তনাশক হয়; কুপ জলও ঘাই হইলে লবু, পথ্য ও ত্রিদোষক হয়, কিন্তু এই উত্তর জলই কারওপবিধি হইলে অতিশয় পিত্তকারক হয়। সরোবর যদি প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে, উহার জল নিঃসঙ্কোচে পানীয় রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সরোবর বাহাতে পরিশুদ্ধ থাকে অর্থাৎ কোন প্রকার ময়লা আবর্জনা দি পতিত অথবা

বিধৌত হইতে না পারে, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই দৃষ্টির অভাব বশতঃই আমা-

অত্যন্ত জলাদি

দের পূর্বপুরুষগণ প্রতিষ্ঠিত সরোবরাদি

মফঃস্বলে সর্বসাধারণের উপকারার্থ খনিত হইয়াও তাহাদিগেরই বিনাশ পথ প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট পন্থারূপে বহু জলই বাপে-

পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে! ঐ সমুদয় রিয়ার আকর

পুত্রিণী কত বৎসর পূর্বে খনিত যে হইয়াছে হয়ত তাহার ঠিকও

নাই; যথোক্ত পুনরায় মাটি খনিত হইয়া, উহার পূর্ণসংস্কার হওয়া

দূরের কথা, তদুপরি যে শৈবালদল জন্মাইয়া সবুজবর্ণ পানায়

উহা ভরিয়া গিয়াছে, তাহাও কদাচ অপসারিত হয় না! ইহার

উপর রাস্তার ময়লাদি বিধৌত হইয়াও ইহার মধ্যে পড়িতেছে

এবং সরোবরতীরস্থ গাছপালা যাইতেও পত্রাদি পতিত

হইয়া সময়ে তন্মধ্যেই পচিয়া যাইতেছে। এই গলিত পত্রাদি

পরিশোভিত, শৈবালপানাদি পূর্ণ, নীলবর্ণের বহু জলই, হত-

ভাগ্য পল্লীবাসীদের একমাত্র সঞ্চল হইয়া দাঁড়াইতে অনেক

সময় লাগিয়াছে। এই জলেই তাহা-

দের জল, মার্জন। ইহা লেই তাহাদের বাসনাদি পল্লীগ্রামের জনকই

সংস্কারসমুদয় বসনাদি

ধোতকরণ, ইহাতেই মলমূত্রাদি বর্জন, এবং সর্বোপরি
ইহাই পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে ! ! !

এরূপ স্থলে ম্যালেরিয়া আসন জুড়িয়া বসিবে না ত কি হইবে ?
এইসব আবর্জনা দিপূর্ণ বদ্ধ স্থানেই মশকাদি জন্মিয়া থাকে, তাই
মশক মারিলেই ম্যালেরিয়া নাশ হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হই-
তেছে ! মশক দ্বারা ম্যালেরিয়া বিষ যে আমাদের শরীরে প্রবিষ্ট
হইতেছে তাহা স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলিয়া যে মূল বিষ নাশ
না করিয়া উহার বাহক বিনাশ করিলেই আর ম্যালেক্সিয়া তর
পাকিবে না, তাহা আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য নহি।

যে কুপ বা ইন্দারার জল পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইবে, তাহা
যেন “কুয়ো পায়খানার” অতি নিকটবর্তী স্থানে না হয়, (বাহা
পল্লীগ্রামে অধিকাংশ স্থলেই দৃষ্ট হইয়া থাকে) এবং শুষ্ক
পত্রাদি পড়িয়া উহা আবর্জনা মুক্ত হইতে বাহাতে না পারে
এপক্ষে সতত বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। যে জল ব্যবহার করিতে
হইবে, তাহা বিত্ত্ব কি অবিত্ত্ব নিম্ন উপারে অতি সহজেই
অবগত হইতে পারা যায় :—পার্মাঙ্গানেট অফ পটাশ (Perm-
anganate of po'ash) বা কন্ডির তরল সার (Condy's fluid)

বয়ঃ দেখিতে বেগুনে অথবা লাল

(Pink) বর্ণের কিন্তু দূষিত জলে উহা জলের বিগুহতা পরীক্ষা

মিশাইলে বাহাবী বর্ণে পরিবর্তিত

অথবা একেবারে বর্ণহীন হইয়া যায় দেখিতে পাইবে। এই

ইহাঙ্ক কারণ এই যে, ইহাতে পার্মাঙ্গানেট এবং

আপনার পক্ষে বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

জল পরিস্ফুটি করণের ব্যবস্থা । ১৩৫

এক গ্যালন জলে ৪ ফোঁটা পূর্বোক্ত দ্রব্য মিশাইলেই উহার বেশ পরিশোধন হইতে পারে ; কৃপ বা ইন্দিয়ার জল পরিস্ফরণ জন্ত ২ ঔন্স অতরুল পারম্যাঙ্গানেটই যথেষ্ট । যে পর্য্যন্ত কৃপা-দির জল ঈষৎ ভাবে লাল বর্ণ ধারণ করিতে না দেখা যায় সে পর্য্যন্ত উহা মিশ্রণ করা প্রয়োজন । দেখিতে পরিষ্কার হইলেই যে জল বিস্কৃত হইতে পারে তাহা মনে করিওনা ; এক

ফোঁটা জলের মধ্যে ৫০০, ০০০, ০০০ পঞ্চাশ কোটি কলেরা বা অন্যান্য রোগবীজের জীবাণু অনায়াসে অবস্থান করিতে পারে, অতএব তাহা তোমার চক্ষু চক্ষে দেখা যায় না !!!

মকঃস্থলে সুপেয় নির্দোষ পানীয় জল পাওয়া আশ-
কাল বড়ই দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে, জল পরিস্ফুটি
তাই এখানে সহজ উপায়ে জল পরি- করণ
স্ফরণের ২১টি পদ্য দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করি । আমাদের
বিশ্বাস এই উপায়ে পানীয় জল পরিস্ফরণ করিলে, সহজেই
দূষিত পানীয় সেবন হেতু উদ্ভূত পীড়াদির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি
পাওয়া যাইতে পারে । (১) জল অগ্নিতে ফুটাইয়া লইলেই
উহার সকল দোষ অপনোদিত হইতে দেখা যায় ; উষ্ণ
করিলে জলের কেবলমাত্র যে অধিকাংশ অর্গানিক (Organic)
দূষিত পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায় তাহা নহে, ইহাতে ইনর্গানিক
(Inorganic) লাবনিক পদার্থও (salts)—যাহা দ্রবণ অব-
স্থায় জলের সহিত বিগলিত (dissolved) থাকে—অধঃক্ষিপ্ত
হইয়া পড়ে । এই জল যদি ঈষৎ উত্তাপদ্বারা উত্তপ্ত হয়,
তাহা হইলে আরও ভাল, কারণ উহা সর্বাপেক্ষা স্বর

দুই প্রহর অর্থাৎ প্রায় ৬ ঘণ্টা লাগে, এবং সিদ্ধ কৃত শীতল

জল এক প্রহর অর্থাৎ ৩ ঘণ্টা কিন্তু ঈষৎ উষ্ণ জল ১১০ ঘণ্টার

মধ্যেই হজম হইয়া যায়। (২) কোন পাত্রে করিয়া

জল, সমুদয় দিবস রৌদ্রে এবং সমস্ত রাত্রি চন্দ্রকিরণে, অভাবে

শিশিরে রাখিলেই উহা পরিশোধিত হইয়া লবু, শীতল,

অমৃতত্বলা ও ত্রিদোষনাশক হইয়া উঠে। এই জল অন্তরীক

জল সদৃশ শুণকর, বলকর এবং মেধাবর্দ্ধক জানিবে।

(৩) জলে কিঞ্চিৎ কটুকিরি অথবা নির্ঝলী ফল ঘষিয়া থিতা-

ইয়া লইলেও জল বেশ পরিষ্কৃত হইয়া যায়। কিন্তু এ ভাবে

জল পরিস্ফরণ প্রথা আমরা অনুমোদন করি না; ইহাতে

প্রায় অন্ন উৎপাদন করে এবং অচিরে ডিম্পেপ্সিয়া বা অজী-

র্ণতা উদ্ভূত হইতে পারে। (৪) জল ফিল্টার করিয়া লওয়া।

আজকাল বাজারে, ছোট বড়, কাঁচের অথবা চিনামাটির নানা

প্রকার ফিল্টার বিক্রীত হইয়া থাকে। যাহাদের পক্ষে ইহা

ক্রয় করা সম্ভবপর না হয়, তাহারা নিম্ন উপায়ে অতি

সহজেই পানীয় জল পরিষ্কৃত করিতে পারেন; যথা :—একটি

কাষ্ঠ মিশ্রিত ত্রিপদের উপর পর পর ৪টি মাটির কলসী

রাখিবে; ইহার উপরের ৩টি সহিদ্র এবং সর্ব নিম্নটি ছিদ্র

রহিত হওয়া চাই; দ্বিতীয়ে কাষ্ঠের কয়লা, তৃতীয়ে বালি বা

প্রস্তর খণ্ড পরিপূরণ করিয়া রাখিবে; সর্বোপরি এবং সর্বনিম্ন

কলসদ্বয় শূন্য থাকিবে। এখন উপরের কলসে জল ঢালিয়া

দিলে, উহা কলসীর তলস্থ ছিদ্র

দ্বিয়া অল্পে অল্পে আসিয়া, কয়লা ও

বালির ভিতর দিয়া আসিবার সময়,

দেখী সহজ ফিল্টার

বেশ পরিষ্কৃত হইয়া, নিম্নস্থ কলসীতে পতিত হইবে। তলস্থ কলসীর মুখে একখানি পরিষ্কার ফিল্টার রাখা ভাল।

সময়ে সমুদয় ফিল্টারই ময়লা এবং ~~দূষিত~~ হইয়া পড়ে, সুতরাং মধ্যে মধ্যে যদি উহা পরিষ্কৃত করা না হয় তাহা হইলে, যে জীবাণু সকল তাড়াইবার জন্য উহার ব্যবহার একান্ত আবশ্যক মনে করিয়া থাক তাহারই পরিসরকল্পে ইহা সাহায্য করিবে

জানিও ; অর্থাৎ উহার মধ্যে নানা জীবাণু সঞ্চিত হইয়া পানীয় জল দূষিত করিয়া দিবে। মাটির কলসীর ফিল্টারের কয়লা বালিও, মাসে অন্ততঃ একবার বদলাইয়া দেওয়া কর্তব্য। সর্বপ্রথমে সিদ্ধ করিয়া এই প্রণয় যদি জল পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে সেই জল বিশেষ হিতকর হইয়া থাকে। বর্তমানে স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে আমাদের দেশের বড় বড় সহরে, সাধারণের পানীয় জন্য নদী বা দূরবর্তী পাহাড়ের গাত্র হইতে, জল আনা হইয়া ফিল্টার করতঃ সরবরাহ করা হইয়া থাকে। এক্ষণে ঐ সব স্থানে (পূর্বের ন্যায় কূপ, পুকুরিণী ইত্যাদির দূষিত জল ব্যবহার বন্ধ হওয়ায়) সহরবাসীগণের স্বাস্থ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইতে দেখা গিয়াছে। (৫) বকবস্ত্র দ্বারা জল পরিষ্কৃত (Distilled) করিয়া চোয়াইয়া লওয়া প্রথা অতিশয় উত্তম। ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ পরিষ্কৃত জল এবং ঔষধাদি প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই জল আবাদবিহীন হয় বলিয়া, পানীয় জল তেমন ব্যবহার কেহ করে না।

অনেকের ধারণা আছে যে, সোডা লেমনেড ইত্যাদি

এরেটেড্ (Aerated) জল পান করিলেই, দূষিত জলপানের বিষময় কলের হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। কিন্তু হুঁতাপ্য বশতঃ ইহা সত্য্য মনে, কারণ সোডা-জল প্রস্তুতকারকেরা অনেক সময়, দূষিত জল ব্যবহারেই উহা প্রস্তুত করিয়া থাকে।

ইহাতে সীসক অথবা কলের তৈলও লাগিয়া থাকিতে পারে। উদ্ধারা প্রায়ই জল ভাল করিয়া ফিল্টার বা উষ্ণ করিয়া লয় না। বাজারের সোডা ইত্যাদি দ্বারা

তৃষ্ণা নিবারণ করা অপেক্ষা, পূর্বোক্ত তৃষ্ণা সোডা লেমসেড উপায়ে, যাহাতে সহজেই পানীয় জল জল শোধন করিয়া লইতে পারা যায় তাহা করাই যুক্তিসঙ্গত। কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন যে, জলের সহিত কিঞ্চিৎ এলুকোহল মিশাইয়া লইলেই আর বিপদের আশঙ্কা থাকে না। এই শেষোক্ত ব্যবস্থাকারীগণ বোধ হয় জামেন না যে, জল গরম করিলেও উহা হইতে কোন কোন জীবাণুর জীবনীশক্তি লুপ্ত হয়

না !! সুতরাং মদের সহিত মিশ্রিত হইলেই উহা যে নির্দোষ হইতে পারে ইহা কেমন করিয়া বলা যায় ?

এখানে আমরা আর একটি বিষয়ের অবতারণা করা প্রয়োজন মনে করি। জলের কঠিনত্ব (Hardness) ও কোমলত্ব (Softness) ভাবের কথা শুনিয়া হয়ত আপনার মনে অবি-
শ্বাস হইতে পারে, কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষায় বাস্তবিকই উহা প্রমাণিত হইয়াছে দেখিবেন। এই
কঠিনতা আবার (১) অস্থায়ী (কার্ব
মেই অব্ লাইম মিশ্রিত) এবং (২)

কোমল ও
কঠিন জল

সময়ে পরিপাক হইয়া যায়। কাঁচা জল পরিপাক হইতে স্বাস্থ্যীভাবের হইয়া থাকে। উক্ত করিলে প্রথম প্রকারের দূষিত ভাব নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু উহাতে দ্বিতীয় প্রকার দোষ বিদূষিত হয় না। সল্ফেট অফ লাইম অথবা ম্যাগনেশিয়া শেখোক্ত প্রকারের জলে মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। স্বাস্থ্যীভাবের কঠিন জল, নানাপ্রকারে ব্যবহার নিষিদ্ধ ; ইহার দ্বারা দ্রব্যাদি ভালরূপে ধুইয়া পরিষ্কার করা যায় না, সাবানে ফেনা হয় না (will not lather) এবং চর্মে বস্বৎসে, এমন কি সময়ে সময়ে (বিশেষ শীতকালে) ফাটিয়াও যায়। লাইম ও ম্যাগনেশিয়া সল্ট অধিক পরিমাণে জলে থাকিলে, উহা নানাপ্রকার

পীড়ার সৃষ্টি করিতে পারে। কঠিন জল চা প্রস্তুত অথবা রন্ধন জন্ত আদর্বেই ভাল নহে, সবুজ বর্ণের শাকসব্জীর বর্ণও ইহা দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়। ইহা বিশেষ কঠিন হইলে ডিসপেন্-
সিয়া উদ্ভব করাইতে পারে। স্বাস্থ্যী কঠিনতা বিদূষণ জন্ত “ক্লার্কের মতে” (Clarke's process) চূণ (quick lime) প্রয়োগই উত্তম ব্যবস্থা। ১ গ্যালন কঠিন জলে ২ ড্রাম পরিমাণ চূণ প্রয়োগই যথেষ্ট। চূণ প্রয়োগ করিয়া ২৪ ঘণ্টা জল রাখিয়া দিবে, পরে ২১৩ ইঞ্চি তলানি জল রাখিয়া সমুদয়ই ধীরে ধীরে ঢালিয়া লইবে। জল হইতে কতক পরিমাণে জীবাণুও (microbes) এই উপায়ে বিদূষিত হইয়া যায়।

জলের সহিত নানা রোগও আনাদের শরীরে আনীত হইতে পারে ; দূষিত জল ব্যবহারেই যে লোকে ম্যালেরিয়াক্রান্ত হয় তাহা সকলেই জানেন। এই কারণেই স্নীহারোগও উৎ-

পন্ন হইতে পারে। জলে জাতব, উদ্ভিজ্জ, অথবা খনিজ দূষিত পদার্থ থাকিলে রক্তমাশয় এবং উদরায়ন দুই হয়; এই কারণে ডিসপেপ্সিয়াও দেখা দেয় ভাবিবে। দূষিত জল পানীয়রূপে অনবরত ব্যবহারে মূত্রস্থলীতে পাথরী (Stone), গলগণ্ড, ইত্যাদি হইতে দেখা গিয়াছে। কলেরা এবং টাইফয়েড জ্বরের বিষণ্ড ইহার দ্বারাই অধিকাংশ স্থলে আনীত হয়। হৃৎক দূষিত জল মিশ্রিত থাকিয়া, অনেক সময়

উপরি উক্ত পীড়াদির প্রাহুর্ভাব

আনাইয়া দিয়াছে। অস্ত্রের মধ্যে

জল দ্বারা

আনীত পীড়াদি

কৃষি ইত্যাদিও জল দ্বারাই সরবরা-

হিত হইয়া পড়ে ; দূষিত জলে উদ্ধৃত জীবাণুসকলও মশক দ্বারা আমাদের শরীরে একেবারে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে। সুতরাং পানীয় অথবা যে জলই হউক, এই জলের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

পানীয় মধ্যে জলের অব্যবহিত পরেই, হৃৎকের স্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার অল্প একটি নাম বালজীবন, কারণ বাল্যবয়সে, বিশেষতঃ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ৯ মাস পর্য্যন্ত (আমাদের দেশে স্থল বিশেষে ১১ কি ২ বৎসর পর্য্যন্ত) একমাত্র ইহাই শিশুগণের জীবনধারণের অবলম্বন হইয়া থাকে। মৎস্ত মাংসাদিকে আমরা সম্পূর্ণ খাওয়া বলিয়া গণ্য করিতে পারি না, কিন্তু হৃৎকে প্রকৃত পক্ষে পানীয় না বলিয়া সম্পূর্ণ খাদ্যরূপে গণ্য করিতেও পারা যায়।

এখানে আমার একথা বলার উদ্দেশ্য

হৃৎকের গুণ

এই যে সুস্থদেহ বজায় রাখিবার জন্য, যে সমুদয় পদার্থ নিত্য
আমাদের অবশ্য প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহার সমুদয় পদার্থ
মাংসাদির মধ্যে নিহিত নাই, কিন্তু দুগ্ধে তাহা বর্তমান আছে ।

ইহা জীবন ধারণের পক্ষে, অতিশয় প্রয়োজনীয় এবং অতি
সহজে পরিপাক পাইয়া থাকে । আয়ুর্ক্বেদে ইহা বায়ুপিত্ত
নাশক, শীতল, স্নিগ্ধ, জীবনীশক্তিপ্রদ, বলকারক, মেধাবর্ধক
ইত্যাদি বলিয়া কথিত হইয়াছে । সুতরাং আবালবৃদ্ধবনিতা,
সবল, দুর্বল, রোগী, নিরোগী সকলের পক্ষেই, ইহা সমান
ভাবে ফলপ্রদ ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ইহা কোন প্রকার প্রধান
খাদ্যের সহ খাওয়া উচিত নহে, কারণ দুগ্ধ যখন নিজেই একটি
প্রধান খাদ্য (অর্থাৎ প্রধান খাদ্যের সকল জিনিষই ইহাতে
বর্তমান আছে) তখন অন্য কোন খাদ্য দ্রব্যের সহ ইহা সেবন
করিলে, পাকস্থলীর উপর অতিরিক্ত কার্য সম্পাদনের ভার
দেওয়া হয় মাত্র ; সুতরাং সময়ে উহা বিকল হইয়া
যাইবার সম্ভাবনা । কিন্তু আমাদের তাত

প্রধান খাদ্য, তবে কি আমরা তাহের

অন্য খাদ্যের

সহ দুগ্ধ খাইব না ? দুধ তাত আহার

সহ দুগ্ধ সেবন

না করিলে আহার সম্পূর্ণ বলিয়াই অনেকের বোধ হয় না !
যদিও তাহের সহিত দুগ্ধ খাওয়ায় একটু গুরুপাক হইয়া থাকে,
তথাপি উহা আমাদের প্রচলিত নিত্য খাদ্যের সহিত যোগে
বিশেষ কোনই গোল করে না । পাশ্চাত্য জাতীর আহার
প্রায় সমুদয়ই মাংসাদি সমন্বিত, সুতরাং উহার সহিত দুগ্ধ

মোটাই সহ্য হয় না। মাংসের সহিত দুগ্ধসেবন অভ্যাস বলিয়া আমাদের দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রেও বর্ণিত আছে। বাহার্য্য নিত্য মাংসভোজন করিয়া থাকেন, আহারের অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্বে দুগ্ধ সেবন করা তাঁহাদের কর্তব্য ; নতুবা অঙ্গীর্ণ হেতু উদরাময়াদি সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রেও দুগ্ধ এই প্রকারেই সেবনের ব্যবস্থা দেওয়া আছে। কাকি অথবা চা এর পরিবর্তে সম পরিমাণ দুগ্ধ এবং পরম জল মিশাইয়া, অথবা অল্প কোন প্রকার খনিজ জল (যেমন ভিচি, আপেণ্টা, সীতাকুণ্ড, খাট-শিলা ইত্যাদি) বা সোডা ওয়াটার মাত্র মিশাইয়া, প্রাতঃকালে কিংবা অপরাহ্নে সেবন করিলে, চা বা কাকি সেবন অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূত হইতে পারে বলিয়া পাশ্চাত্য গ্রন্থকারগণও বলিয়াছেন।

কাকি অথবা চা এর
পরিবর্তে দুগ্ধ সেবন

তরুণ অথবা অল্প কোন প্রকার
রোগে, দুগ্ধই একমাত্র সুপথ্য (অবশ্য

দুগ্ধ যোগ্য পথ্য

পাকাশয়িক গৌল্যযোগ অবর্তমানে) বলিয়া সকলেরই জানা আছে, কিন্তু এবিষয়ে একটি সাবধনতার কথা বলা আমরা যুক্তি-যুক্ত মনে করি। পাকস্থলীতে পতিত হইয়া দুগ্ধ ছানায়ুক্ত হইয়া

একটি অন্তরল (solid) পিণ্ডে পরিণত হয়। বেশী না খাইলে শরীর দুর্বল হইয়া পড়িবে, এই তত্ত্ব অবশ্য অনেকে করিয়া থাকেন, কিন্তু অধিক পরিমাণে আহারে শরীরের উপকার না হইয়া, অপকারই হইয়া থাকে জানিবে। ২৪ ঘণ্টার

যদ্যে অল্প কোন খাদ্যাদি না খাইলেও, ৩০ ৩৪ পাইন্টের (১ পাইন্ট ২৮০ পোয়া) অধিক দুগ্ধ সেবন করা বা করান কৰ্ত্তব্য নহে। তোমার পারিবারিক চিকিৎসক অবশ্য রোগবিশেষে যতটা দুগ্ধ দরকার এবং তাহার প্রকার অর্থাৎ খাঁটি দুগ্ধ, কি জল মিশ্রিত (কি পরিমাণে) তাহা জানাইয়া দিবেন। কতকগুলি লোকের এমনই বিশ্বাস আছে যে, যেন তাঁহারা চিকিৎসক অপেক্ষা বেশী বুঝিয়া থাকেন, তাই রোগীর প্রতি ভালবাসা দেখাইতে গিয়া সহ্যাতিরিক্ত দুগ্ধ সেবন করাইয়া থাকেন! ফলে তাহাতে বমন হইতে দেখা যায় ও উপকারের পরিবর্তে সমূহ অপকার হইয়া পড়ে, কারণ অর বা রোগাবস্থায় পরিপাক শক্তি সুস্থাবস্থাপেক্ষা বল কার্যকরী থাকে।

দুগ্ধ প্রায় সকলেরই সহ্য হইয়া থাকে, কিন্তু এমনও লোক দেখা যায় যে, তাহার শরীরে দুগ্ধ সহ্য হয় না। তাহারা

বলে যে, পাকস্থলীতে উহা পতিত হইয়া ছানাবৃক্ক হয় এবং অল্প পরেই বমন হইয়া যায়। এখন

কথা হইতেছে যে, দুগ্ধ ত সকলেরই দুগ্ধ সহ না হইলে
ব্যবস্থা পাকস্থলীতে বাইরা ছানাবৃক্ক হয় কিন্তু

তাহা পাকস্থলীতে রাখিবার উপায় কি! দুগ্ধের ভায় বল-

কারক, সহজেই পরিপোষক পদার্থও যদি শরীরে সহ্য না হয়, তাহা হইলে কেমন করিয়া শরীর পরিপোষণ হইবে? দুগ্ধের সহ, সম পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া, অথবা ভিচি (Vichi) বা সীতাকুণ্ড জল, সোডা ওয়াটার

মিশাইয়া খাইলেই, উহা আর বমন হইয়া যাইবার ভয় থাকে না জামিবে। অথবা দুধকে ষোল করিয়াও খাওয়া যাইতে পারে। এক পাইন্ট দুধ গরম করিয়া, তাহার মধ্যে ছোট চামচের দুই চামচ লেবুর রস মিশ্রিত করিলেই, উহাতে ছানা কাটিয়া যাইবে; পরে ঐ ছানাগুলি পরিষ্কার একটি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাঁকিয়া লইলেই বেশ ষোল বা ছানার জল প্রস্তুত হইতে পারে। উক্ত উপায়ে প্রস্তুত ছানার জল প্রায় সকল প্রকার গোলমালগুক্ত পাকস্থলীতেই সহ্য পাইতে পারে।

ইহা অতিশয় বলকারক পানীয় পদার্থ

ছানার জল বা গোল

(যদিও ছাঁকিয়া লইবার সময়,

পাকস্থলীতে সহ্য করাইবার জন্য, দুধের কতক বলকারক অংশ পরিত্যক্ত ছানার সহিত বিদূরিত হইয়া থাকে)। ২৪ ঘণ্টায় অবশ্য সেবনোপযোগী দুধ অপেক্ষা ইহা পরিমাণে অধিক সেবন

করা উচিত নতুবা সম পরিমাণে ফল লাভ হইবে না।

দুধের মধ্যে পো দুধই সর্বশ্রেষ্ঠ; ইহা সমস্ত রোগ শাস্তি-কারক, বায়ু ও রক্তপিত্তনাশক, শ্লিষ্ণ, শীতল, স্নায়ুর ও গুরু। কৃষ্ণবর্ণ গাভীর দুধ, বায়ুনাশক ও বিশেষ ঔষধকারক; পীতবর্ণ গাভীর দুধ, গুরু, কফজনক এবং রক্তপিত্ত ও বাতরোগে উপকারক। বালবৎসা ও বিবৎসা গাভীর দুধ ত্রিদোষজনক;

যে গাভীর বাছুরের বয়ঃক্রম এক মাস

পো দুধের প্রকার

হইয়াছে, সেই গাভীর দুধ ত্রিদোষ-

নাশক, তৃপ্তিজনক ও বলকারক। বন্যাহারলাভ গাভীর

দুগ্ধ, গুরু ও কফজনক; এই দুগ্ধ সুস্থব্যক্তির পক্ষে উপকারক, কিন্তু রোগীর পক্ষে নহে। খড়, তৃণ ও কার্পাস বীজ প্রভৃতি ভোজনজাত গাভীর দুগ্ধ অতি সুপা। দোহনান্তর উষ্ণাবস্থা—তেই ফেশবৃত্ত গোদুগ্ধ, বলকারক, লঘু, শীতল, অমৃততুল্য ও ত্রিদোষনাশক জানিবে; দোহনের পর শীতল হইয়া যাইলে, তখন আর উহা কাঁচা সেবন করা উচিত নহে। দুগ্ধ সহিত অর্ধেক জল মিশাইয়া, অগ্নিতে জ্বাল দিবার সময়, জলত্যাগ মারিয়া চক্ৰমাত্র অবশিষ্ট রাখিলে, উহা কাঁচা দুগ্ধাপেক্ষা লঘুতর হয় জানিবে। নির্জলা দুগ্ধ জ্বাল দিয়া, যত ঘন করিবে, ততই উহা গুরুতর, বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক হইবে; কিন্তু তাহা বলিয়া শরীরে পুষ্টিরক্ষা করিবার জন্য ইহা সকলের খাওয়া উচিত নহে।

গো দুগ্ধের পরই মাহিষ দুগ্ধ প্রচলিত দেখা যায়। বঙ্গদেশ অপেক্ষা বেহার ও পশ্চিমাঞ্চলেই ইহার সমধিক ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ইহা গোদুগ্ধ অপেক্ষা, গুরু, নিদ্রাকারক, ক্ষুধারুদ্ধিকারক এবং শীতল। বাহাদেব মাহিষদুগ্ধ খাওয়া

অশ্রু জাতীয় দুগ্ধ

অভ্যাস নহে, ইহা সেবনে তাহাদের

প্রায়ই উদরের গোলযোগ ও শরীর ভার ভার বোধ হয় এবং এই জন্যই বোধ হয়, তাহারা অধিক সময় নিদ্রায় কাটাইয়া দেয়। ছাগদুগ্ধ লঘু, শীতল, কষায় এবং মলের তরলতানাসক; ইহা অতিসার, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়কাশ রোগীর পক্ষে এবং সর্গ-রোগনাশক; বিশেষতঃ রক্তমাশয়ে ইহা বড়ই উপকারক জানিবে। ভেড়ার দুগ্ধ সেবনে অন্তরী রোগ অর্থাৎ কীড়

প্রদেশে “পাথুরী” (gravel) হইলে তাহা বিনষ্ট ও দুৰ্ব্বলত্বে বাহ্য প্রয়োগে বিশেষ উপকার দৃষ্ট হইয়া থাকে ; ইহা শুষ্ক, পিত্তবর্ধক, রোমোৎপাদক কিন্তু বায়ুশান্তিকর। গর্দভী হৃৎক্সুধা বৃদ্ধিকারক, লঘু, বলকারক এবং শিশুগণের পক্ষে একান্ত হিতকর ; অনেক বলিয়া, থাকেন যে, ইহা বসন্ত রোগের কতক প্রতিবেধক। চারিদিকে বসন্ত হইতে থাকিলে, প্রত্যহ সামান্য পরিমাণে ইহা ব্যবহার করিলে ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা কম থাকে। এই কথার মূলে অবশ্য কোন সত্য নিহিত আছে, নতুবা এত জন্ত থাকিতে এই গর্দভই বা “মা শীতলা-দেবীর” অর্থাৎ বসন্তরোগানির্ভাত্রীর বাহন বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে নির্দেশিত হইবে কেন ?

নারীহৃৎক্স লঘু, শীতল ও বায়ুপিত্তনাশক। রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, নারীহৃৎক্স ও গর্দভীহৃৎক্স প্রায় একজাতীয় ; সুতরাং

নারী ও গর্দভী হৃৎক্স

শিশু ভূমিষ্ট-হওয়ার পর, যদি কোন কারণ বশতঃ মাতৃসুত পান করিতে না পায়, অর্থাৎ যদি মাতার স্তনে হৃৎক্স না থাকে বা উহা দৌৰ্ব্বজনক বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে, অস্ত কোন প্রকার হৃৎক্সের বদলে গর্দভী হৃৎক্সই ব্যবহা করা কর্তব্য। মাতৃসুত না পাইলে, শিশু ক্রমশঃ ক্লেশ হইতে থাকে এবং বাড়িতে পায় না ; কিন্তু গর্দভীহৃৎক্স নারীহৃৎক্সের সহিত সমজাতীয় হওয়ার, উহা সেবনে শিশুর বর্দ্ধনের কোনই বাধা জন্মাইতে পায় না। নারীহৃৎক্স কাচা থাকাই হিতকর, ইহা উত্তম করিয়া সেবন করিলে অপকার করিয়া থাকে। মো ও বাহিব

হুঙ্ক ভিন্ন, অন্ত সকল হুঙ্কই অসিদ্ধাবস্থায়

গুরু, রোগজনক, আমবর্জক ও অগাধ্য ।

সিদ্ধ ও অসিদ্ধ

হুঙ্কের গুণ

ছাগীহুঙ্ক সিদ্ধ করণান্তে শীতল করিয়া

সেবনই প্রশস্ত । সিদ্ধাবস্থায় উক্ত হুঙ্ক বাতরেখনাশক এবং সিদ্ধ করা শীতল হুঙ্ক পিত্তনাশক । আমাদের মতে, নারীহুঙ্ক ব্যতীত সকল হুঙ্কই, এক বলকা জাল দিয়া গরমাবস্থাতেই পান করা কর্তব্য ।

রাত্রিকালে স্নিগ্ধতা ও শারীরিক পরিশ্রমের বিরাম হেতু, সন্ধ্যাকালোপেক্ষা প্রাতঃকালীন হুঙ্ক, গুরু ও শীতল হইয়া থাকে এবং স্ব্যাকিরণ সেবন ও ব্যায়ামাদি জন্ম সায়ংকালের হুঙ্ক, অপেক্ষাকৃত লঘু ও বাতরেখনাশক হয় ।

সময় ভেদে হুঙ্কের গুণ

নাশক হয় । উপরন্তু প্রাতঃকালীন হুঙ্ক,

সুধাবৃদ্ধিকারক এবং পুষ্টিজনক ; মধ্যাহ্নে উহা বলকারক ও কফপিত্তনাশক এবং রাত্রিতে উহা পথ্য ও বহুদোষনাশক জানিবে । হুঙ্ক এতই হিতকর পথ্য যে, উহার সেবনে বালকের দেহবৃদ্ধি, বৃদ্ধের ক্ষয়রোগ নাশি ও তেজবৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

গোহুঙ্ক বা ছাগহুঙ্কের ফেণও ত্রিদোষর, ক্লটিকারক, লঘু, সুধাবৃদ্ধিকারক এবং সস্ত তৃপ্তিকর । ইহা অতিসার, অগ্নি-মান্দ্য ও জীর্ণজরে বিশেষ উপকারক । যদি হুঙ্কে কোন প্রকার বিবর্ণতা, অন্ন, হুর্গন্ধ, ছেঁড়া ছেঁড়া ভাব, বা অন্নলবণ-যুক্ত পদার্থাদি মিশ্রিত থাকে, তবে উহা সর্বথা পরিত্যাগ্য ; কারণ উহা পরিপাকের হানি ত করিবেই, উপরন্তু বৃদ্ধি প্রকৃতিও বিনাশ করিয়া থাকে ।

সাধারণতঃ জলের পরিবর্তে পানীয়রূপে ছুঙ্কের ব্যবহার প্রায় দৃষ্ট হয় না ; কিন্তু রোগবিশেষে বাধ্য হইয়া অনেক স্থলে জলের পরিবর্তে শুদ্ধ ইহাই ব্যবহার জ্ঞাত আমরা উপদেশ দিয়া থাকি । যে সমুদয় পীড়ায় শরীরে জল বা রসসঞ্চয় অত্যধিক হইতে থাকে, তাহাতে জলের ব্যবহার একেবারেই

নিষিদ্ধ হওয়া কর্তব্য ।

এরূপ স্থলে জলের পরিবর্তে ছুঙ্ক
ছুঙ্কও বাহাতে নির্জলা পাওয়া যায়,

সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । শোথ, উদরী, মের বেরি, স্বভি অথবা উহা জনিত উদ্ভূতাদি রোগে, জলের ব্যবহার নিষেধ করিয়া আমরা অনেক স্থলে প্রভূত উপকার সাধিত হইতে দেখিয়াছি । সুহাবহায় অবশ্য জলের পিপাসা ছুঙ্কে সফলরূপে নিবারিত হইতে পারে না, কিন্তু উপরি লিখিত পীড়াদিতে পিপাসা প্রায় থাকিতে দেখা

যায় না । কাজেই সামান্য আয়াসে ঐ সময় জলের পরিবর্তে ছুঙ্ক ব্যবহারের অভ্যাস হইয়া যাইতে পারে ।

শিক্ষিত হউক বা অশিক্ষিতই হউক, যতুম্যামাত্রেই ছুঙ্কের উপকারিতার বিষয় সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত আছেন এবং আমরাও উপরে যথাসাধ্য তাহা পরিপাদন করিতে ক্রটি করি নাই । কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা কোন প্রকারেই অস্বীকার করিতে পারিব না যে, এই ছুঙ্কই

অধুনাতন ছুঙ্কই যাব-
তীর শিশুরোগের
আকর ।

অধুনাতন যাবতীয় শিশুরোগের আকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে !

সত্যজগতের সমুদয় স্থানেরই—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, রুশিয়া,

আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি সকল স্থানেই—যুক্তসংখ্যার
গড় হিসাব পরীক্ষায়, আমরা প্রতিনিয়তই দেখিতে পাইতেছি
যে, হৃৎকপোষা শিশুগণের মধ্যেই, কালের করালরূপাণ অপ্রতি-

হতগতিতে অত্যধিক কার্যতৎপরতার সহিত ধ্বংসকা-

সাধন করিয়া যাইতেছে। আধুনিক সভ্যতা সৃজিত পথানু-
চারিণী, বিগতযশঃশা, হতশোভনা, পূর্বগৌরবখ্যায়িতা
“সোণার-ভারত” কি এ বিষয়ে কোনও সভ্যজগতের পশ্চাতে
পড়িয়া আছে? না কখনই নহে! পাশ্চাত্য জগতের আহার
বিহার, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ছল চাতুরী প্রভৃতির সৃষ্টিক
অনুকরণকারী শিক্ষিত লোকের বাসস্থান হইয়া ভারত
কি এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইতে পারে? কিন্তু ভারত যখন
ষড়ৈখ্যাময়ী, সর্বসভ্যতার আদি
জননী, পুণ্যপুত্র পবিত্রতার আদর্শরূপে
পরিগণিতা ছিল, যখন ভারতই জ্ঞান,

ভারতের পূর্ব
গৌরব।

ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের একমাত্র আকর ছিল,—যাহার রশ্মি-
কণা লইয়াই পাশ্চাত্য দর্শনবিজ্ঞান আজ পুরুষকার সাধু-
নার চরম উৎকর্ষ লোভিত করিতেছে—যখন ভারতে জাতিধর্ম-
নির্বিশেষে ব্যবসায়ীগণ, স্ব স্ব ব্যবসাতে নিরত থাকিয়া, অধর্ম
হইবার ভয়ে সদাই সজ্জিত থাকিত, তখন ভারতে এ তর্কদিন
আসিতে পারে নাই!!! বিয়য় পরম্পরায় যাইবার দরকার
নাই, এটু ছুটুই যদি আজকালকার ভায় ছস্পাপা, অথবা
পাওয়া যাইলেও খাটি না মিলিত, তাহা হইলে ধরে ধরে বাগ-
যজ্ঞ হোমাদি কখনই হইতে পারিত না! কেবলমাত্র পাঁচি

হৃৎ ও তদ্ব্যতীত জীব্যাদি হইতেই যে নিত্য দেবকার্য্য ও গিহ-
কার্য্য সংসাধিত হইত এ কথা বলা বাহুল্য ! কিন্তু পূর্ব্বকথা
আলোচনার আর ফল কি ?

“যজুগতেঃ ক গতা যথুরাপুরী
রঘুপতিঃ ক গতোত্তর কোশলা ।
ইতি বিচিন্ত্য মনঃ কুরু স্মৃতিরং
ন সদিদম্ অগদিত্যবধারয়” ॥

হৃৎপোষ্য শিশুগণের মধ্যে আমাদের দেশে—বঙ্গদেশে
প্রচলিতঃ—একটি বিশেষ পীড়ার প্রাহুর্ভাব ‘দৃষ্ট হইয়া
পাকে । ইহা আর কিছুই নহে—সেই সংলাতিক “শিশু-যকৃৎ” ।

আমরা পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রীয়
কোন গ্রন্থে, এই রোগের বিষয় উল্লি-
খিত দেখিতে পাই না । এই শিশু
শিশু যকৃৎ ও টুবারকু
লোসিস

যকৃৎের মূল কারণ হইতেছে—দূষিত দুগ্ধ । সহরের প্রায়
১৫ আনা শিশুরই শরীরে, অল্পাধিক পরিমাণে এই রোগের
বর্ত্তমানতা দেখা যায় এবং ইহা হইতে মৃত্যুসংখ্যাও
নিতান্ত কম নহে । ইহা ব্যতীত আর একটি বিষয় ব্যাধিও
অগতে শনৈঃ শনৈঃ প্রসারণ লাভ করিয়া বালক,
যুবা ও বৃদ্ধের স্বাস্থ্যকার্য্য সাধন করিতেছে দেখিতে
পাওয়া যায় । ইহার নাম টিউবারকুলোসিস অর্থাৎ ক্ষয়-
রোগ । যেবোক্ত এই রোগের উদ্ভূতির অস্বাস্ত্য কারণ মধ্যে,
টুবারকুলোসিস আক্রান্ত গরুর দুগ্ধ পান করা, একটি প্রধানতম
কারণ বলিয়া চিকিৎসা অগতে প্রমাণিত হইয়াছে । ভাল দুগ্ধ

কৌটাবদ্ধ টিনের দুধ অপকারী। ১৫১

না পাওয়াতেই যখন, উপরিউক্ত দুইটি বিষয় বাধির উদ্ভব
সম্ভাবনা প্রমাণিত হইল, তখন সাধারণ লোকে যে, উহাদের
হাত হইতে নিজ নিজ শিশুসন্তানগণকে

কম্বাট বাঁধান দুধ

রক্ষা করিবার জন্ত, বিজ্ঞাপনের “চাক-

টোলে” উল্লেখিত, স্তূপের সাগর পার হইতে আনীত, টিনের
কৌটাবদ্ধ কম্বাইত অর্থাৎ কন্ডেন্সড দুধ, অবাধে ব্যবহার
করিতে আরম্ভ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?
শুধুমাত্র শিশুগণের জন্তই যে, ইহা ব্যবহৃত হইয়া পাকে
তাহা নহে, আজকাল চা খাইবার জন্ত, বহুলোকেই ইহা
ব্যবহার করিয়া থাকেন। শৈবোক্ত ব্যক্তিরাও যে দুধের
ভালমন্দ গুণ বিচারের জন্ত বিলাতী দুধ ব্যবহার করেন,
তাহা আমরা মনে করি না; বরং সময় অসময়ে
কোপার দুধ মিলিবে বা না মিলিবে, সেই জন্যই বিশেষতঃ
ঝড়া মিটাইবার ইচ্ছায়, অশেষ দোষের আকর এই বিলাতী
টিনের আবদ্ধ দুধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অধিক দিবস

আবদ্ধ থাকায়, উহা যে বিষময় হইয়া উঠে, তাহা জানিয়াও
কেহ কেহ ভাল দুধ ভোগাড় করার অনুবিধা এড়াইবার জন্ত,
ইহা ব্যবহার করা বন্ধ করেন না। কণ্ডেন্সড দুধের পরিবর্তে,

কোন কোন বিলাতী কোম্পানীর কলে

কৃত্রিম বিলাতী দুধ

প্রস্তুতীকৃত, শিশুর খাদ্য ব্যবহার করা

আমরা সর্লভোভাবে সমীচীন বলিয়া মনে করি—যেমন মেলিন,

আলেনবর্রি, হর্লিক্স, প্রাস্মন, স্তানাটোজেন, প্রভৃতি।

ইহাদের সকল গুলিই বিশেষ পরীক্ষিত এবং শুদ্ধমাত্র গরম জল অথবা তৎ সহ সামান্য দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া, সেবন করাই-
লেই চলিতে পারে। চিকিৎসকের উপদেশ মত, শিশুর শরীরো-
পযোগী যাহা তিনি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন, তাহাই ব্যবহার
করান কর্তব্য। শিশুর খাণ্ড বলিয়া আজকাল আমাদের দেশেও,
কতকগুলি কৃত্রিম খাণ্ড প্রস্তুতীত হইয়া বাজারে প্রচলিত হই-
তেছে। দেখিতে পাই, কিন্তু উহা সম্যক পরীক্ষিত নহে বলিয়া
সহসা কাহাকেও অনুমোদন করিতে পারা যায় না। আমাদের
দেশীয় কৃতবিদ্য চিকিৎসকমণ্ডলীকে এখানে অনুযোগ না
দিয়া থাকিতে পারিলাম না! দেশীয় উপাদানে প্রস্তুতীত, শিশু
ও রোগীর খাণ্ডগুলির রীতিমত পরীক্ষা হইয়া, উহার দোষগুণ
প্রস্তুতকারকগণকে জ্ঞাত করাইলে,

আমাদিগের বিশ্বাস ঐ গুলিও বিলম্বী

দেশীয় কৃত্রিম দুগ্ধ

খাণ্ডাদি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট থাকিতে পারে না!
কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এ দেশীয় চিকিৎসকগণ ও
বিষয়ে সামান্য পরিমাণও চেষ্টা করেন না এবং প্রস্তুত-
কারকগণও চিকিৎসক ও রাসায়নিক বিজ্ঞায় পার-
দর্শীগণের সাহায্য লওয়া উচিত মনে করেন না। ইহাও
সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে!! যে সে একজন কোন কৃত্রিম
খাণ্ড বাহির করিলেই, সাধারণ লোকে কোন্ সাহসে তাহা
রোগী বা শিশুকে অবাধে খাওয়াইতে পারে?

ভাল দুগ্ধ না পাওয়া যাইলে, যে ব্যবস্থা করা দরকারী তাহা
ত বলা হইল, কিন্তু যাহাতে ভাল দুগ্ধ পাওয়া যাইতে পারে

তাহার বিষয়ও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি । ইহার প্রতিকার করে
গো জাতীর উন্নতি সাধন করা সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয় ।

পূর্বে এ দেশে গো-সেবা গৃহস্থের একটি নিত্য নৈমিত্তিক ধর্মের
মধ্যে গণ্য ছিল, অর্থাৎ ধর্মোদ্দেশ্যে গো-জাতীর প্রতিপালন এবং
সংরক্ষিসাধন সকল লোকেরই অবশ্য কর্তব্য বলিয়া অবধারিত
ছিল । গো-জাতির দুঃসেবনে, যখন আবালবৃদ্ধ আমরা সক-
লেই পরিবর্তিত হইয়া থাকি, তখন তাহাদিগকে মাতৃস্থানীয় মনে
ধারণকরুণঃ সেবা করায়, জায়তঃ
যে ধর্ম আচরিত হয় তাহার সন্দেহ
নাই । কিন্তু বাস্তবিক যদি উহা

গো-জাতির সেবা

গৃহস্থ ধর্ম

ধর্মের ভাবে দেখিতে আমরা অনিচ্ছুক হই, তথাপি কি অল্প
ভাবেও ইহাদের সেবা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য নহে ?
উহাদের উন্নতিসাধন অর্থে আমরা এই বুঝি যে, যাহাতে উহারা

স্বচ্ছন্দে আহার বিহার সম্পন্ন করিতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি

রাখা মাত্র । এই প্রকারে পরিপুষ্ট হইলেই, পর্যাপ্ত পরিমাণে
উহারা আমাদের দৃষ্টি দিতে পারিবে এবং তাহা সেবন
করিয়া আমরা, আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল,—শিশু
সন্তানপণ,—এবং রোগী প্রকৃতি সকলেই সুস্থদেহ লাভ করিতে
পারিব । তবেই দেখুন, গো-জাতির সেবায় কাহাদের লাভ
হইয়া থাকে ।

আজকাল গো-সেবা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই
হয়, যদিও এখন আর গৃহস্থের নিত্য হোম-যাগ-ধর্মের

জন্ত ছুঁ প্রয়োজন হয় না, কিন্তু শিশুসন্তান ও নিজে-
দের শরীরপোষণের জন্ত ত উহার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য
রহিয়াছে ; সুতরাং গৃহস্থ ছুঁদের জন্ত গোয়ালাগণের উপরই সম্পূর্ণ
নির্ভর করিয়া থাকেন। এই গোয়ালাগণ ব্যবসারে লাভ-
বান হইবার জন্ত, গো-জাতির সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য না
রাখিয়া, কি করিয়া কেবল ছুঁ অধিক পরিমাণে সংগ্রহ হইতে
পারে, তাহারই কৌশল উদ্ভাবনায় প্রকৃতই “গোয়াল বুড়ির”
পরিচয় দিয়া থাকে। তাহার “দুকা দিয়া” বৎসহীন গাভীর
ছুঁ দোহন করিয়া থাকে ; এই “দুকা
দেওয়া” ছুঁ সম্পূর্ণ অপকারী, উপরন্তু দুকা দেওয়া ছুঁ

গো-জাতি ইহাতে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে।
যে গরুর প্রতি এই প্রকার “দুকা দিয়া” দোহন ক্রিয়া
সাধিত হয়, তাহা কোন প্রকারেই পুষ্টিলাভ করিতে
পারে না এবং স্বরাদনেই মারা যায়। বৎসহীন গাভীর ছুঁ
অথবা যে গাভীর বৎসের বয়স এক মাসের অনধিক,
তাহার ছুঁ নিতান্ত অপকারী। বাড়ীতে যদি গরু না থাকে,
তবে গোয়ালার নিকট হইতে ছুঁ লইবার সময় এ বিষয়ে
সজ্ঞান লওয়া একান্ত কঠিন।

শিশুকে গোছুঁদের উপর নির্ভর করিয়া রাখিতে হইলে,
আরও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন যে, নিয়মিত একই গাভীর
ছুঁ, উহার প্রত্যহ সেবন জন্ত দেওয়া হইতেছে এবং

এ স্নাতী বৎসবতী ; গাভীর আহার জন্য কি কি দেওয়া
হয় এবং তাহাও পর্যাপ্তরূপে ভোজন করিতে পায় কিনা,

ভাহারও সংবাদ রাখা প্রয়োজন । ঐ

গোধার দুই সংগ্রহের

গাভীর শরীরে কোন পীড়া দি আছে

উপায়

কিনা, অথবা যে গোশালায় ঐ

গাভী থাকে, তথায় কোন অন্য গাভীর সংস্পর্শদোষ দুষ্ট

রোগ, যেমন টাইফয়েড, টুবারকুলোসিস প্রভৃতি আছে কিনা,

সে সবক্ষেত্রে বিশেষ পরীক্ষা লওয়া কর্তব্য ।

পল্লীগ্রামে গো-জাতি কতকটা স্বচ্ছন্দতার সহিত বিচরণ

করিতে পারে, কিন্তু সহরে উহার সম্পূর্ণ অভাব ; গাভীকুল

সহরে দিবারাত্র একই স্থানে বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া ক্ষুধিহীন

হইয়া যায়, কাজেই উহাদের দৃষ্টিতে তদাহারীদেরও বিশেষ

ক্ষুধি হইতে দেখা যায় না । আজকাল পল্লীগ্রামেও,

বিশেষতঃ যেখানে মিউনিসিপালিটি আছে তথায়, “পাউণ্ডে”

বাইবার ভয়ে গৃহস্থ বা সোয়ালাগণ গাভীদিগকে স্বচ্ছন্দে

বিচরণ করিতে দিতে পারে না । যদিও বা নির্দিষ্ট কোন

মাঠে গোচারণের ব্যবস্থা বর্তমান থাকে, কিন্তু বড়ই ভয়ের

বিষয় যে, উহা হয় একেবারে তৃণ-

গোচারণ স্থানের

লতাদিবিহীন অথবা কেবলমাত্র

আবশ্যিকতা।

শুক ঘাসে পরিণত ! ! কচি তৃণ

এবং লতাদিতোজন করিতে পাইলে, উহারা যেমন পরিপুষ্ট

লাভ করিয়া থাকে, তেমন অন্য কোন খাদ্যেই নহে ! কিন্তু

অগনিত মাটমাটে পরিপূর্ণ এদেশেও, গো-জাতির বিচারণ অন্য

কোন প্রকার বিশিষ্ট স্থান নির্দেশিত দেখা যায় না !

গো-জাতির উন্নতি করে ইহা কম প্রতিবন্ধক নহে; যদি প্রত্যেক জমীদার স্ব স্ব জমীদারী মধ্যে, প্রতি পরগণা বা মোজায় করেক শত বিঘা করিয়া জমী গোচারণের জন্য বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন, তাম্ব হইলে অবশ্য গো-জাতির অশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে এবং তাহার পরিণাম ফলে, তাঁহাদেরই সকলের নিঃশঙ্কসন্তানগণ, সুদৃঢ় সেবনে পরিপুষ্ট লাভ করিয়া অকাল মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারে !!

আজকাল চা, কার্ফ, অথবা কোকা বা চোকোলেট ও আরামপ্রদ পানীয়ের অন্তর্গত হইয়া, সভ্যজগতে সর্বস্থানে আদৃত হইয়া থাকে; সুতরাং উহা সেবন আমাদের মতবিরুদ্ধ হইলেও পানীয় প্রস্তাব হইতে, উহা বাদ দিয়া

চা'র, সাধারণ ভণ

কেলিতে পারিব না। চা অম্লহর,

আরামপ্রদ, বর্ষোৎপাদক এবং উষ্ণ; ইহা অবশ্য পরিমিতহারী অবচ নিত্য বাহ্যরা অভ্যস্ত নহে, তাহাদিগের জন্তই জানিবে। অতিমাত্রায় অথবা অধিক দিবস ব্যবহারে, ইহাতে ক্ষয়, মস্তিষ্ক,

চালক-শাস্ত্র এবং পাকস্থলীর বিকৃতি জন্মাইয়া থাকে। এই যান্ত্রিক বিকৃতির ফলে বিবমিষা, বমন, বায়ুপূর্ণ অজীর্ণতা, হস্তপদের কম্পন, মুখমণ্ডলের মলিনতা, ক্রীণ নাড়ী, ক্রুর উপরি-
তাপে অক্ষালপীড়া, ক্ষুধার উন্নততা এবং বৃকচাপাবোধক স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি অস্বাভাবিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শরীরের কম শক্তি করে বলিয়া, ইহা পরোক্ষভাবে কাহার কাহারও মতে পোষক বলিয়া পরিগণিত হয়। মাস ও উত্তাপোৎপাদক

খাদ্য পরিপাক করিবার পক্ষে, চা পান প্রযুক্তি ; যদি, জ্বর বা হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া শরীর অসুস্থ বোধ করিলে, এক পেয়ালার চা সেবনে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে, কিন্তু বলা বাহুল্য যে এই উপকার নিত্য চা সেবীগণের উপভোগ্য নহে ! চা

সেবনে উপকার পাইতে হইলে, উহার

চা প্রস্তুতকরণ

প্রস্তুতীকরণ (৩৭ পাতা দেখ) সতর্ক

বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য, নতুবা বিশেষ অপকার হইবার সম্ভাবনা। যদি চা সেবন করিতেই হয়, তাহা হইলে উহা যাহাতে ভাল জিনিষ হয়, সে পক্ষেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কারণ সভাদরের চা নানা প্রকার মিশ্রণ জন্ত অপকারী হইয়া থাকে। চা সহ ছুই দেওয়া অবশ্য কর্তব্য এবং

সামান্য চিনি (যদি উহা আশ্বাদের বিরক্তিকর না হয়) মিশ্রিত করিবে। সকল সময়েই চা গাঢ় অর্থাৎ কড়া না করিয়া সেবন করা কর্তব্য, নতুবা পাকস্থলীর গোলযোগ, নিদ্রাশূন্যতা এবং সাধারণ স্নায়বিক গোলযোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। এই কারণবশতঃই শীতল চা অথবা দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার গরম করিয়া বা যেমন পথে পথে অগ্নির জ্বালের উপর রাখিয়াই, বিক্রীত হইতে দেখা যায়, সেই প্রকারের চা খাওয়া উচিত নহে।

পূর্বে বিশ্বাস ছিল যে “থিনি”

চা অপকারী কেন ?

thiene নামক চার উপাদান শরী-

রের ক্ষয় হ্রাসকারক, সুতরাং ক্ষয় হ্রাস করিবার শক্তি বহুবার বর্ধমান থাকে, তাহা যে আহ্বারের আবশ্যকতাও

কিয়ৎ পরিমাণে নীশ করিতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য ।

এই শক্তি চা'য়ে নিহিত থাকার জন্তই, প্রকারান্তরে ইহাকে পোষক বস্তুর সাহিল করিয়া ধরা হয় । কিন্তু এড-ওয়ার্ড স্মিথ্ (Edward Smith) নামক একজন ডাক্তার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, চা ক্ষয় হ্রাস করার পরিবর্তে, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতির উত্তেজন এবং অজ্ঞাত প্রকারে শরীরের ক্ষয় বর্দ্ধিত করিয়াই থাকে । চা ব্যবহারের পোষকতার দ্বিতীয়

দফায় বলা হইয়া থাকে যে, উহাতে গ্লুটেন্ Gluten নামক পদার্থ বিद्यমান থাকায়, সাক্ষাৎসম্বন্ধে উহা পোষক (nutrient) বস্তুর অন্তর্গত, কিন্তু সচরাচর যে ভাবে চা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, তাহাতে ঐ গ্লুটেন সামান্য পরিমাণেও নিষ্কাশিত হয় না দেখা গিয়াছে । ডাঃ স্মিথ্ আরও বলেন যে, চা সেবনের ফলে, মাংস এবং উত্তাপোৎপাদক খাদ্য বিশেষরূপে পরিপাক হইয়া যায় । পর্যাপ্ত পরিমাণে আহারের সংস্থানোপায় থাকিলে ইহা পোষনক্রিয়া বর্দ্ধনও করিতে সমর্থ ; কিন্তু পক্ষান্তরে প্রচুর অথবা সম্যক দেহধারণোপযুক্ত আহারের অভাব হইলে,

উহাই শরীরের ক্ষয় বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে ।

আহারের অব্যবহিত পরেই চা খাওয়া উচিত নহে, কারণ উহা দ্রুত বলশালী সঙ্কোচক পদার্থ ; খাদ্যবস্তুর “জিলাটিনের” সহ, উহার ট্যানিক্ আসিড্ মিশ্রিত হইয়া, অজীর্ণতা উৎপাদন করিতে পারে ; এই জন্তই অধিক দিবস চা পানে, কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মাইতে পারে । অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, মূর্গারোগ বা জ্বপিশেষের স্পন্দন অথবা অন্য কোন প্রকার স্বাস্থ্যবিধানের উত্তেজনা প্রকাশক রোগে পীড়িত

ব্যক্তিগণের পক্ষে, ইহা পানীয়রূপে ব্যবহৃত হওয়া কর্তব্য নহে ।
 মাথাধরা, স্নায়বিক বেদনা অথবা স্নায়ু-
 বিধানের বলক্ষয়জাত অত্যন্ত পীড়ায়, চা সেবনে সাবধানতা
 ইহা স্নায়ুবিধানের উত্তেজক পানীয়রূপে সময়ে সময়ে ব্যবহৃত
 হইলে ফলশ্রুতি হইতে দেখা যায় । কিন্তু বলা বাহুল্য যে,
 অত্যন্ত চা সেবীগণের এ ফলশ্রুতি কল্পিতে দাবী করা ক্রায়সঙ্গত
 নহে ।

সত্যজগতে বিদিত হইবার জ্ঞাত, আমরা অধুনা বিলক্ষণ
 চা পায়ী হইয়াছি ! ডাঃ স্মিথ্ সাহেব বলিয়াছেন, “উহা পর্যাপ্ত
 ভোজনাতাব্যুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে শরীরক্ষয় বৃদ্ধিই করিয়া
 থাকে” কিন্তু এ বিষয় কি আমরা কখন উপযুক্তভাবে ভাবিয়া
 দেখিয়াছি ? অনেক ব্যক্তিকে চা খাইবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করায়,
 আমরা সবিস্ময়ে অবগত হইয়াছি যে, সামান্য জলখাবারে ক্ষুধা
 নিবৃত্তি না হওয়ায়, এক গ্লাস বা পেয়লা চা অর্থাৎ গরম জলে

যেমন তেমন করিয়া চা সিদ্ধ করতঃ, দুগ্ধ বা তদভাবেই, চিনি
 সংযোগে খাইয়া, ক্ষুধার নিবৃত্তি করিয়া থাকি” !!! চা যে ক্ষুধা-
 নাশে প্রকৃতি প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী

আমাদের চা খাওয়া

ইহা আমরা দেখাইয়াছি, আবার ইহা
 যে স্বলাহারী অথবা অত্যবশ্যপ্রযুক্ত অপ্রচুর ভোজনে অত্যন্ত
 ব্যক্তির শরীরে ক্ষয় বৃদ্ধিত করিয়াই থাকে, তাহাও ডাঃ
 স্মিথের কথায় আমরা দেখাইয়াছি । আমাদের দেশের অধি-
 বাসীর মধ্যে, প্রায় বার আনা লোক যে উদর পুরিয়া খাইতে
 পায় না, তাহাও সকলে বিশেষরূপে বিদিত আছেন । এখন

আপনারই বিচার করিয়া দেখুন, আমাদের পক্ষে চা উপকারী কি অপকারী !

অনেকে বলিয়া থাকেন যে আসাম, জলপাইগুড়ি, দার-জিলিং প্রভৃতি স্থানে চা বিশেষ উপকারী—এমন কি তত্তৎ প্রদেশস্থ ম্যালেরিয়া অথবা তড়াই জ্বরেও, জরনাশক রূপে কার্য্য করিয়া থাকে । আমরা এ কথায় যথার্থতা কতক স্বীকার করিয়া থাকি ; কারণ ঐ সব প্রদেশে যদি উহা

স্থানিক উপকারিতা

বিশেষ প্রয়োজনীয় না হইত, তাহা হইলে

প্রকৃতি কখনই প্রচুরভাবে তথায় উহা উৎপন্ন হইতে দিত না ।

যে বস্তু যথায় প্রকৃতি কর্তৃক প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়,

তাহা যে ঐ প্রদেশস্থ লোকের অবশ্যজ্ঞাবী প্রয়োজনীয় তাহা

স্বীকার করিতেই হইবে ।

কাফি :—সেবনে যন্তিষ্ক, পাকস্থলী, ও দৃঢ়কব্ধের উত্তেজনা দৃষ্ট হইয়া থাকে ; ইহা উৎকৃষ্ট পচননিবারক (antiseptic) প্রচুর মুত্রনিঃসারক এবং অম্লরসী সঞ্চে বাধাপ্রদানক । কাফি সিদ্ধ করিয়া পরিমিত মাত্রায়, সময় বিশেষে সেবন করিলে, শরীরের উত্তে-

কাফির গুণাগুণ

জনা, পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি, ও অন্ত্রের

তরঙ্গায়মান (peristaltic) গতির উৎকৃষ্টতা সাধন

হইতে দেখা যায় । অধিকন্তু ইহা শরীরের ক্রয় এবং মুত্র

সহ ইউরিক্‌ অ্যাসিডের নির্গম হ্রাস করিয়া থাকে এবং

শ্রম জন্ত শরীর ও মনের অবসাদতাব অমুভূত হইতে দেয় না ; কিছুকণের জন্ত, বিনা আত্মাসে, নিদ্রাজর করাইবারও

কমতা ইহার বর্তমান আছে দেখা যায় এবং সবকে সতেজ রাখে।

কিন্তু ইহাও অধিক মাত্রায়, অথবা নিত্য সেবনে অভ্যস্ত হইলে, পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত, শিরঃপীড়া, শিরোধূর্নন, বুক ধড়্‌ধড়্‌

করা, নিত্যস্থ অস্থিরতা, আক্ষেপ এবং পক্ষাঘাত জন্মায়। সিদ্ধ

কাফির সহিত সম পরিমাণ এক বুলকা দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করা উচিত; উহারও প্রস্তুতকরণ চা এর স্তায় হওয়া প্রয়োজনীয় এবং সত্ত্ব প্রস্তুত, গরম ও চিনি সংযোগে খাওয়া কর্তব্য। আহারের পর, ইহা

দুগ্ধ দিয়া অথবা না দিয়া, আদর্শেই কাফি সেবন প্রথা

খাওয়া উচিত নহে, কারণ উহা পরিপাক শক্তিকে বাধা জন্মান ব্যতীতও অজীর্ণতা এবং অনিদ্রার উৎপাদক কারণ হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, প্রাতঃকালে কাফি সেবনে পরিপাকশক্তি গোলমালযুক্ত হইয়া যায়, কিন্তু অপূরাহ্নে ইহা সেবনে তেমন দোষ ঘটিতে দেখা যায় না।

অনেক সময় ঔষধার্থেও কাফি প্রযুক্ত হইয়া থাকে; শারীরিক ক্লান্তি, ক্রমশ ও মনের অবসাদতা, স্নায়বিক বেদনা, স্নায়ুর বিকসি পতিত শিরঃপীড়া এবং অনিদ্রা এবং পুরাতন মন্দাত্ম্যজনিত অনিদ্রায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ঔষধার্থ ব্যবহার

অপিচ ইহা বমন নিবারণ, অতিসার

প্রশমন, শ্বাসের টান নিরূপ্তি ও মাদক-দ্রব্য সেবন জন্ম লিম ক্রিয়ার দৌলনাশ করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্রমশ সঞ্চীর

রোগে ইহা প্রযুক্ত হইলে অনেক সময়ে উপকার ঘটে হয়।

কোকোয়াঃ—দুগ্ধের সহিত অথবা জল মিশ্রিত
 দুগ্ধ বা শুদ্ধ জলের সহিত প্রস্তুত করিয়া, ইহা সেবন করা যাইতে
 পারে ; কিন্তু যে প্রকারেরই প্রস্তুত হউক না কেন, উত্তমরূপে সিদ্ধ
 হওয়া চাই । অজীর্ণতা দোষসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে, দুই তৃতীয়াংশ
 গরম জল এবং এক তৃতীয়াংশ গরম দুগ্ধ সহ, ইহা সেবন করা
 কর্তব্য । চা বা কফির জ্বার, ইহাও যেন বেশী কড়া বা উগ্র
 করিয়া প্রস্তুত করা না হয় ; ইহা একরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে
 হইবে, যেন দুগ্ধ অপেক্ষা সামান্য ঘনতর হয় এবং পেরালা শব্দ
 হইলে, তাহাতে সামান্য অগ্নিক্ষেপ ঘুট
 হইতে পারে । **চোকোলেট** পুষ্টি-
 কারক এবং ইহাও খাওয়া চলিতে
 পারে, কিন্তু অজীর্ণরোগীর পক্ষে নহে ; ইহাও অমুগ্র করিয়া
 প্রস্তুত হওয়াই কর্তব্য ।

কোকোয়া ও

চোকোলেট

এখন এক কথা উঠিতে পারে যে, চা কফি ইত্যাদি চারিটা
 পানীয়ের মধ্যে কোন্টি প্রশস্ত ? আমরা পৃথকভাবে
 কয়টিরই গুণাগুণ বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু সমালোচনায় কোন্টি
 প্রথম স্থান অধিকার করিতে সমর্থ তাহা দেখাই নাই । চা,
 অপেক্ষা কফি অতি সহরে স্বাস্থ্যবিধান গোলযোগবৃত্ত করিয়া
 দেয় ; কোকোয়া উহার অপেক্ষা অধিক পোষক হই-
 লেও সহজ পরিপাচ্য নহে, উপরন্তু উহা একপ্রকার বিক্রী আবাদ-
 বৃত্ত হওয়ায়, অনেকের পছন্দনীয়ও নহে ; চোকোলেট আবার
 কোকোয়া অপেক্ষাও, বহু উপবৃত্ত বলিয়া বর্ণিত দেখা যায় ।

স্বাস্থ্যবীর প্রকৃতির লোকে কাকি, বিশেষ

উপযোগী বলিয়া জানা গিয়াছে। এই

তুলনা দৃষ্টে, ইহা বেশ উপলব্ধ হইতে

পারে যে, ইহাদের মধ্যে অল্পে চাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধর্তব্য ; কিন্তু

চা কাকি প্রভৃতির

পংপং তুলনা

ইহা দ্রব্যের গুণবহু নহে, সেবনকারীর শরীরের উপযোগী-
তায় বলিয়াই বুদ্ধিতে হইবে। ইহার পরে কাকি দ্বিতীয়,
কোকোয়া তৃতীয় এবং চোকোলেট চতুর্থ আসন পাইবার উপ-
ন্থিত। কাহারও কাহারও মতে, কোকোয়া কোন প্রকার
তরুণ রোগোৎপন্ন অজীর্ণতার ব্যবহৃত হইতেও পারে, কিন্তু
প্রকৃত অজীর্ণরোগীর পক্ষে ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়াই
কর্তব্য।

এইবার আমরা মস্তুর বিষয় বশাসাধ্য আলোচনা করিয়া
পানীয় প্রস্তাব শেষ করিব। সত্যতা বুদ্ধির সঙ্গে, মদ খাওয়ার
প্রগতি প্রতিমিতই শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে দেখা
নাইতেছে। অনেকে চিকিৎসকের পরামর্শ মতই, প্রথমে সামান্য
পরিমাণে মদ্যপান করিতে অভ্যাস করিয়া পরিশেষে পূর্ণ মাতাল
রূপে পরিণতি হইতেছেন ! এ দৃষ্টও দেখিতে পাওয়া বিরল
নহে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের মোহাই দিয়া, বাহার ইহাকে
পানীয় এবং স্বাস্থ্যরক্ষার মর্হোবব বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন,
তাহাদের বুদ্ধির অসাড়তা দর্শন করাইবার জন্ত, পাশ্চাত্য
জগতের আধুনিক মনিষীগণের গবেষণার ফল এই স্থানে সাধা-
রণের খোঁচর করাইতে ইচ্ছা করি ;

মস্তুর সাধারণ গুণ আলোচনার, আমরা দেখিতে পাই যে,

ইহা কঠিকারক, ক্ষুধাবর্জক, পুষ্টিকারক, বলকর, স্বরসংশোধক, শোক-ভয়-শ্রান্তি নিবারক, প্রীতিকারক, অনিদ্রা প্রকাশক, অতিনিদ্রা নিবারক, মলাদিরোধপীড়িত ব্যক্তিগণের কোষ্ঠিশোধক, মুখের জড়তানাশক, উদ্বিগ্নাদি বিন্যাসক এবং অতিশয় কামো-দ্বেজনাবর্জক। অধিক শোকাভূত ব্যক্তি অনেক সময় স্তম্ভ-দুঃখ বিনাশ করিবার জন্য সামান্য মাত্রায় মদ্যপান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার কার্য অধিকক্ষণ স্থায়ী না হওয়াতেই, স্থায়ীভাবে বিস্মৃতি আনাহঁবার জন্য, বারে বারে মাত্রা-বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ; সুতরাং অনতিবিলম্বে একটি বন্ধ মাতালে পরিণত হইয়া পড়েন !

মদ্যের সাধারণ গুণ সমালোচনায়, উহাকে কোন প্রকারেই মন্দ জিনিষ বলিয়া ধারণা জন্মাইতে পারে না। অনেক সময় এই ধারণা হইতেই মদ্যপানের স্পৃহা যে, বলবত্তর হইতে থাকে তাহার প্রমাণ অনেক স্থলে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং মদ্যপানের ফলে শরীরে কি প্রকার অবস্থা বিপর্যয় ঘটে হইয়া থাকে, তাহার নির্ণূত চিত্র এখানে দিতে ইচ্ছা করি। মদ্য খাওয়ার তিন প্রকার অবস্থা ক্রমঃশঃ শরীরে বিকশিত হইতে দেখা যায়। অল্প মদ্যপানজনিত
উদ্বেজনাবৃত্তাকে প্রথম মদ, তদপেক্ষা
অবস্থা বিপর্যয়
মত্ততর অবস্থাকে দ্বিতীয় বা মধ্যম মদ

ও জ্ঞানের সম্পূর্ণ লুপ্তাবস্থাকে তৃতীয় বা অস্ত্রা মদ্যাবস্থা কথিত হয়। এখন এই তিন অবস্থার বিশেষ লক্ষণগুলিও জানিয়া রাখা

আবশ্যক । (১) প্রথম মদাবস্থায়, মনে বেশ একটু শ্রুতি উপস্থিত হয় ও গীতবাদ্য, হস্ত প্রভৃতি বিষয়ে বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ পায় ; ইহাতে পান ভোজনের ক্রিয়ার কোন প্রকার বৈলক্ষণ্যভাব বা বৃদ্ধি ও স্বতঃশক্তি, গোলমাল দৃষ্ট হয় না এবং কার্যাদি সম্পাদনেও শক্তির লোপ না হইয়া, বরং স্বাধুবিধান সকল উহার সম্পাদনে সচেষ্ট হইয়াই থাকে । এই জন্তই এই মদাবস্থা, অতিশয় সুখপ্রদ, এমন কি জগতের কোন প্রকার সুখই ইহার সমতুল্য নহে বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন । কিন্তু ঠিক এই অবস্থা উৎপাদক মত্তের মাত্রা খুবই সামান্য এবং

পরিমিত ; এই জন্তই অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত-গণ পরিমিত মাত্রায় মত্তের ব্যবহারে সংকোচ বোধ করেন না ।

(২) মদেয় দ্বিতীয় অবস্থায়, কণে ২ শ্রুতি এবং কণে ২ মোহ উপস্থিত হইতে দেখা যায় ; কখনও বা ঐ শ্রুতি বেশ পরি-শ্রুট হইয়া পুনরায় লোপ পাইয়া থাকে । সর্বদা সজ্ঞ ও অসজ্ঞত প্রলাপ বকা, বেড়াইবার কালে টলিয়া পড়া, এমন কি বসিয়া থাকা অবস্থাতেও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ টলিতে থাকা, পান ভোজন বা পরস্পর কথোপকথনে সাম্যতাবের অভাব প্রভৃতিও লক্ষিত হয় । তৃতীয় বা অন্ত্য মদাবস্থায়, (৩) মত্তপায়ী সার্ব্ব তিন হস্ত পরি-মিত ভূমী দখল করিয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকে ! স্থান অস্থানের বিচার করিবার শক্তিও থাকে না । যে আমোদ, আনন্দ বা সুখ, পর্য্যাপ্তরূপে উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যে মত্ত পান করিয়া থাকে তাহা লাভ করিতেও সমর্থ হয় না । যে অবস্থার কার্য্য-কার্য্য, সুখদুঃখ ও হিতাহিত জ্ঞানের নাশ হইয়া থাকে, সেই-

অবস্থা পাইতে কোন্ ব্যক্তি স্বতঃ ইচ্ছা করিয়া থাকেন ? কিন্তু হয় ! অধুন। অধিকাংশ মদ্যপায়ী ব্যক্তিকেই এই অবস্থাপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল দেশে, বিশেষতঃ সহরে, মদের দোকানের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনই মদ্যপায়ীর সংখ্যাও হ হ বাড়িয়া যাইতেছে ! কে বলিতে পারে ইহার পরিণাম কোথায় !

“ঔষধার্থে সুরাপানে দোষ নাই” নামে আমাদের দেশে একটি প্রচলিত প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা অবশ্য মদ্যপায়ী-গণকে বিদ্রপচ্ছলেই বলা হইয়া থাকে, কারণ ঐ বিধেই কেহ তাহাদিগকে নিবেদন করিলে, উত্তর করিয়া থাকে যে, চিকিৎসকের নির্দেশমত স্বাস্থ্যরক্ষার জগ্গই তাহারা মদ্যপান করিয়া থাকে ! কিন্তু প্রকৃতই চিকিৎসক

ঔষধার্থে সুরাপান

নির্দিষ্ট মাত্রা, তাহারা বজায় রাখেন

কিনা তাহা স্বীকার করেন না, অথচ ফলে বেশ ধরা পড়িয়া যান ! সে বাহা হউক, সুরা যে প্রকৃতই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের

মতে ঔষধ প্রস্তুতার্থে, ভেবেজ দ্রব্যের সহিত বাধ্য হইয়া, যে পরিমাণ সুরা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা ব্যতীত পৃথকভাবে, রোগীকে কেবলমাত্র বল প্রদান (Stimulate) করিবার জগ্গ

সুরা প্ররোপ করা কর্তব্য নহে ! কিন্তু আজকাল এলোপ্যাথী-মতে, রোগীর অবস্থা নিবেদন করাইলেই, তাহাকে প্রথমতঃ ঔষধের অর্থাৎ শরীরে ব্যস্তিক উত্তেজনাশক্তি বর্দ্ধন করিবার জন্য মদ (ত্রাণ্ডি), প্রদান করা হইয়া থাকে। এইরূপে উদ্ভূত

মদ্যপান সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতের ভ্রমধারণা । ১৬৭

দৈহিক উত্তেজনা শক্তি অধিকতর হারী হয় না, সুতরাং ঘন

ঘন (সময় বিশেষে প্রতি ৫।১০ মিনিট অন্তর) টিমুলেন্ট প্রয়ো-

গের ব্যবস্থা হইয়া থাকে ! কিন্তু প্রতি-

প্রতিক্রিয়া-ক্রিয়া

ক্রিয়া শক্তির প্রভাবে, কৃত্রিম উপায়ে

উক্ত উত্তেজনা শক্তি সম্বন্ধেই, বিশেষ প্রকারে, হঠাৎ অবনমিত

হইয়া পড়িতে দেখা দেয়া যায় এবং তাহার ফলে মৃত্যু আসিয়া

পড়ে । যে কোন দ্রব্যেরই, দৈহিক উত্তেজনা শক্তি বর্ধনের

ক্ষমতা বর্তমান আছে, তাহাই উত্তরোত্তর প্রযুক্ত হইতে থাকিলে,

যে সময়ে তাহারই প্রতিক্রিয়া শক্তির বলে উহা হঠাৎ অবনমিত

হইয়া থাকে, ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন

না ! তথাপি দেহস্থ রক্তমোকণ, ফোঁকা করিয়া দেওয়া প্রভৃতির

জার মত্তপ্রয়োগ ব্যবস্থাও এলোপ্যাথীমতে যথেষ্ট প্রচলিত

দেখিতে পাওয়া যায় ।

প্রতিক্রিয়ার এই অবনমনকারী শক্তির অস্তিত্ব পাশ্চাত্য-

জগৎ পূর্বে স্বীকার করিতেন না ! সম্প্রতি জার্মানির অন্তঃপাঠী

বার্লিন নগরীর প্রফেসার স্টিমিডবার্গ

পাশ্চাত্যের ভ্রম

(Schimidberg) পর্যবেক্ষণ ও

পরিবেষণের ফলে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মত্ত উচ্চতর স্নায়বিক

কেন্দ্রের অবসাদক বস্তু । উক্ত জার্মান প্রফেসারের নূতন মত

বোঝবার ফলে, সমুদয় পাশ্চাত্য জগৎ চমকিত হইয়া পড়ি-

য়াছে এবং অনেক বতিমান পণ্ডিত ঐ মতের সমর্থনও করি-

তেছেন । হায় ! পাশ্চাত্য সভ্যতার বিমল আশিসপ্রদায়ক

এই মতশক্তিপ্রভাবেই ভারতবাসীর জীবনীও ক্রমশঃ ক্ষয়

পাইতেছে ! অনেকের ধারণা আছে যে, নিয়মিত ভাবে মত্ত-
পান করা, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বড়ই প্রয়োজন, সুতরাং উহা নৈমি-
তিক আহারীয় পদার্থের অঙ্গীভূত হওয়া প্রয়োজন ! এ ধারণা যে
ভ্রমপূর্ণ তাহাও পরীক্ষায় জানিতে পারা গিয়াছে ; ইহার প্রভাবে
জান্তব শরীরে কেবলমাত্র চর্ক্ষিময় তন্তুরই (fatty tissue)
পরিপোষণ হইয়া থাকে, অল্প কিছুই নহে ।

দৈনিক উত্তেজনাশক্তি বর্দ্ধনের চেষ্টায়, মত্ত কর্তৃক যে
পরিণাম ফল উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা দেখান হইয়াছে ;
এখন আর একজন পণ্ডিতের উল্লেখ করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা
সম্বন্ধেও যে, উহার ব্যবহার আবশ্যকীয় নহে তাহাই দেখা-
ইতে চেষ্টা করিব । প্রফেসর জি, সিন্স উড্‌হেড্‌ এম্, এ,
এম্, ডি মহোদয় কিছুদিন পূর্বেই ইহার বিষয় বাহা লিখিয়াছেন,
এখানে তাহারই প্রকৃত অনুবাদ দেওয়া গেল :—“প্রতিদিন কি
পরিমাণ মত্ত পান করিলে, দৈনিক সুস্থতা রক্ষা হইয়া, মত্তপান
জনিত বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে না

পারে, এই বিষয়ের মীমাংসার উপ-
নীতি হইবার জন্য, বহুদিবস হইতেই সাধারণ লোকের,
এমন কি চিকিৎসকগণের মধ্যেও বিশেষ বাদানুবাদ চলিয়া
আসিতেছে ; আন্তর্য্যের বিষয় এই যে, এ বিষয়ে যতই
গভীর চিন্তা করা যায়, ততই প্রতিকূল মতাবলম্বী হইয়া

পড়িতে হয় ! কিছুদিবস পূর্বে, নৈমিত্তিক ভাবে, ২ ঔন্স
মত্তপান করা, পানেচ্ছুগণের পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, অবশ্য
প্রয়োজনীয় এবং নিরাপদ বলিয়া কথিত হইত ; কিন্তু এখন

পরিমিত মদ্যপান ও বিজ্ঞানসম্মত নহে ! ১৬৯

জরুরী ও সুইটসারল্যান্ডের নিদানতত্ত্ববিদ, শারীরতত্ত্ববিদ, এবং স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞানবিদগণের পরামর্শানুসারে, জরুরী সমিতি কতক মদ্যপান কৃত মাদকতানিবারণোদ্দেশে, যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠে জানা যায় যে, ১-১। ঔল মদ্যপানই আবশ্যক হলে যথেষ্ট এবং অনপকারক, কিন্তু এই সামান্য পরিমাণও নিত্য ব্যবহার করা কর্তব্য নহে ; কারণ

মত্ত, যে কোন প্রকারই হউক না কেন—ব্রাণ্ডী, ওয়াইন, বিয়ার, খেনো—এবং বত স্বল্পই হউক না কেন, মদ্যব্যবহারের পক্ষে গ্রিষ বলিয়াই জানিবে। মত্তের যদিই কোন প্রকার বলপ্রদানক বা পরিপোষক ক্ষমতা থাকে (বাহার সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে) তাহা অতি সামান্য এবং কোনই কার্যের নহে। যিনি জীবনে কদাচ মদ্যপান করেন নাই, তাহাকেই প্রকৃত সমাচারী ও সাম্বিকতাবাপন্ন ব্যক্তি বলিতে পারা যায়। সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটেনকোফারের (Pettenkofer) স্বলাভিভিক্ত মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অধ্যাপক, ডাক্তার ম্যাক্স গ্রাবার (Max Gruber), মহাশয় বলেন যে, পরিমিত মদ্যপানের অল্পকালে কোনই বিজ্ঞানসম্মত বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং উহা নিত্য পান করিলে যে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে, এরূপ উপদেশ দেওয়া বড়ই অজ্ঞান !! তিনি বলেন যে, সামান্য পরিমাণে (এমন কি ১-১। ঔল) মদ্যপানেও মদ্যব্যবহারে প্রকৃত অপকার সাধিত হইতেছে।

সুন্দর প্রকার ওয়াইন ও স্পীরিট যাদ্বেতেই, অসামান্য পরিমাণে এলকোহল বর্জন্য থাকে এবং এলকোহলের পরি-

মাণ বতই অধিক থাকে, উহা ততই

উগ্রতর ও অপরিপাক হইয়া পড়ে।

মদ্যে এলকোহলের

মাত্রা

প্রতি স্পিরিটে যে পরিমাণ এল্-

কোহল থাকে, তদপেক্ষা স্বল্প বা অধিক এলকোহল সমেত

মদ্যকে, প্রত্য স্পিরিটের উচ্চ (above) অথবা নিম্ন (below)

নামে বর্ণনা করা হয়। হাইকি, ব্রাণ্ডি বা বস্ক, ইত্যাদিতে কি

পরিমাণ এলকোহল মিশ্রিত করিতে পারা যাইবে, তাহা আইন

দ্বারা বিধিবদ্ধ করা আছে, অর্থাৎ সেই মাত্রায় এলকোহল

সেবনে বিশেষ কোনই দোষ হয় না, কিন্তু ব্যবসাদারগণ

তাহা ঠিক রাখে না। ইহার অধিক পরিমাণ বিশিষ্ট এলকোহল

সংযুক্ত মদ্যপান করিলেই, যত্ন ও পাকাশয়ের গোলযোগ দেখা

দিবার সম্ভাবনা।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা এখানে মদ্যপানের বিষয়ে কতক-

গুলি সাবধানতা অবলম্বন করাইতে চাহি। পাশ্চাত্যগণের

মতে, স্পিরিট কিংবা ওয়াইন নিয়মিত এবং স্বল্প মাত্রায়

ব্যবহারে পরিপাকশক্তি বর্দ্ধিত করে। কিন্তু “শূণ্ড উদরে”

(অর্থাৎ যখন পাকস্থলীতে অন্ত

কোন ভুক্তবস্তু বর্তমান না থাকে)

মদ্যপানে সাবধানতা

ইহার পান অতিশয় দোষজনক, কারণ পাকস্থলীর আবরণ

পাত্র মদ্য সংযোগে ক্ষয়িয়া যায় এবং পরিপাক শক্তিও

লোপ পায়। লালবর্ণের মদ্যে ট্যানিন নামক পদার্থ আছে। এই

ট্যানিন্ যে পরিমাণেই থাকুক না কেন, পাকাশয়ে যাইলেই উহা

পরিপাকশক্তির হানি জন্মায়। কোন ২ প্রকার মদ্যে চিনির

ভাগ বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় এবং চিনিতে যে, অনেক লোকের পরিপাকক্রিয়ার ব্যাধাত জন্মাইয়া থাকে, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, এমন স্থলে সেই সমুদয় মদ্যের ব্যবহারে সংযত হইয়া চল। কর্তব্য। সাদাবর্ণের মদ্য সমুদয়ই অন্ন-মদ্য ; ইহাতে সামান্য পরিমাণেই ট্যানিন বা চিনি থাকে, সুতরাং লালবর্ণের মদ্যাপেক্ষা ইহাই অজীর্ণরোগীর পক্ষে

উপকারক। কিন্তু এই সাদা মদ্যও

নিতির মদ্য

নিয়ম করিয়া, সোডা জলের সহ মিশাইয়া খাইতে হইবে। পোট নামক মদ্য লালবর্ণের, সেইজন্য অনেকে উহা অজীর্ণরোগীর পক্ষে অনুপযুক্ত বলিয়া থাকেন, কিন্তু এই অজীর্ণতার সহ যদি উদরাময়প্রবণতা বর্তমান থাকে, তবে ইহা অনায়াসে ব্যবহার করান যাইতে পারে এবং আমরা ২১১ স্থলে ইহা ব্যবহার করাইয়া বেশ ফল পাই-
রাছি। বিলাতী অর্থাৎ পাশ্চাত্য চিকিৎসাগ্রন্থেই আবার ইহাও দেখা যায় যে, “যদি ট্রিভুলেন্ট অর্থাৎ উদ্ভেজক পানীয় সেবন তেমন প্রয়োজন না থাকে, তবে শুদ্ধ জল পান করিলেই চলিতে পারে ; জলের ন্যায় বিপুল উপকারক পানীয় আর নাই”। তাহা হইলে এখন বেশ উপলব্ধ হইতেছে যে, মদ্যাদি

যে নিতান্তই আবশ্যক এমন নহে, তবে সখের ঋতিরে স্বাস্থ্য-
রক্ষার নাম করিয়া, অন্নমাত্রায় সেবনে বিশেষ দোষ না হইতে

পারে। কিন্তু ইহার প্রলোভনময়ী শক্তিকে বিদূরণ করিতে পারা বড় সহজ নহে, সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত হইতে হইতেই কখন যে পূর্ণ মদভ্যাস হইয়া পড়ে তাহা বলা যায় না।

কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ মিউকিস্‌ও এই যত তাঁহার নব প্রকাশিত Tropical Hygiene নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রীষ্মপ্রধানদেশে (ভারতবর্ষে) নবাগত ও অবস্থানকারী সাহেবগণকে উদ্দেশ্য করিয়াই তিনি লিখিয়াছেন, “আমরা যে মত্ত পান করি তাহা ভালবাসি বলিয়া, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষণ জন্য উহার কোনই মূল্য দেখা যায় না, যদিও উহা ব্যবহার না করায় উপকার আছে” ।

অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে প্রাণতঃ বক্রত এবং পাক-
হুলীই বিকৃত হইয়া পড়ে এবং এই দুইটি বস্তুর সহ,
শরীরস্থ অন্যান্য বস্তুর বিশেষরূপে
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায়, প্রকৃত পক্ষে
সমুদয় দেহই বিকল হইয়া যায় ।

অতিরিক্ত মদ্যপানের
ফল

মদাত্মক নামক পীড়া, বক্রতের মধ্যে চর্কি সংঘটন, পাক-
শরিক প্রতিক্রিয়া (catarrhs), তরুণ বক্রতপ্রদাহ, বক্রতের
সিরোসিস ইত্যাদি পীড়াই অধিক হলে দৃষ্ট হয় জানিবে ।
মদমত্ত পিতার ঔরসজাত সন্তানের, মূগীরোগ হইবার সম্ভাবনা
থাকে ; বাতালগণের উপদংশ রোগও সহজে সঞ্চিত চাহে

না । বংশে একজন বাতাল থাকিলে তাহার অনুকরণে বংশীয়
অন্য লোকেও বাতাল হইতে পারে ; যদিও তাহার মন্দ
পরিণাম দেখিয়া, যদ্যপিও তাহাতে মৃণা জন্মিবারই সম্ভাবনা, কিন্তু
অধঃপতনে ঘাইবার প্রলোভন পথ এতই আপাতমনোহারী যে,
সমাজস্থ কেহ সহজে তাহা ছাড়াইয়া আসিতে পারেন না !
দ্রাব্যদ্রব্যের আর একটি মজা এই যে, প্রথম ২

সাধারণ পান করিলেই বেশ পরিভূক্তি এবং শরীরে একটু বিশেষ ক্ষুধা পাওয়া যায়, কিন্তু উত্তরোত্তর যতই মাত্রা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই উহার পরিভূক্তির ভাগ কমিয়া আইসে, সুতরাং পূর্বের সুখময় ভাব পাইবার জন্ত, আরও পান করিতে ইচ্ছা হয় ও অসংযত পানের ফলে, পরিণেবে সংজ্ঞা হারাইয়া যতবৎ যথায় তথায় পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হয় ! ! ! এখন আর তাহার সেই সুখময় অবস্থাও মনে করিবার ক্ষমতা থাকে না। এই দৃশ্য অবস্থার দৃষ্ট প্রতিনিয়ত দেখিয়াও মদ্যপায়ী বা সাধারণের জ্ঞানচকু উন্মূলীত হয় না ! যে সমাজে অস্ত্রের স্বাধিকার্য্যনা করিয়া, সভাসমিতিতে প্রকাশ্য ভাবে মদ্যপান প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমাজের কথা ধরি না ! কিন্তু আমাদের সমাজেও, (যেখানে ইহার আশ্রয় লওয়া এখন পর্য্যন্ত লোকে কুকার্য্য বলিয়া জানে), যে দিন দিন এই মদ্যপানশক্তি প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে চলিল, তাহার কি কোন প্রতি-বিধান হয় না !

যক্ষণ ও পাকস্থলী ব্যতীত স্বংপিণ্ডও, বিশেষ ভাবে ইহাতে আক্রান্ত হইয়া পড়ে ; এক ঔল এলকোহল সেবনে, নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ৩ বার বর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ যতক্ষণ শরীরে মদ্যের ক্রিয়া বর্তমান থাকে ততক্ষণ স্বংপিণ্ড মিনিটে ৩ বার অথবা ২৪ ঘণ্টায় ৪৩০০ বার অধিক স্পন্দিত হইয়া থাকে। প্রয়োজন-ধিক এই কার্য্য করিতে যে, স্বংপিণ্ড বিশেষরূপ কষ্ট পাইয়া থাকে তাহা সহজেই অনুভবের। নভিকও

পানের মনস্ফলে বিকৃত হইয়া যায়। যকৃত, মস্তিষ্ক এবং
রক্তক যন্ত্রের টিসু উপর মদ্যের বিশেষ ক্রিয়াশক্তি আছে,
স্বতরাং পরিমিত মাত্রায় সেবন করিতে থাকিলেও, ঐ সকল
যন্ত্রের টিসু সমুদয়ের প্রকৃতই অনিষ্ট সাধিত হয়।

অনেক গ্রীলোক প্রসবের পর, নির্ঝোষ খাদ্যী অথবা শুষ্ক-
 কারিণীর প্ররোচনায় সুনিত্রা হইবার জন্য, প্রত্যহ একটু
 করিয়া মদ্যপান করিয়া থাকেন! এমন কি সদ্যজাত শিশুকে
 পর্য্যন্ত উহা ২১১ কোটা করিয়া সেবন করাইয়া থাকেন! এ
 প্রথা বড়ই দোষাবহ; ইহার ফলে ভবিষ্যতে ঐ সন্তানের
 মাতাল হইবার সম্ভাবনা বিশেষরূপে, এই স্মৃতিকাগারেই স্মৃতিত
 হইয়া পড়ে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, প্রত্যহ চিনি ব্যবহারে
 মদ্যপানশক্তি কমিতে পারে; চিনির সরবৎ যে অতিশয়
 তৃষ্ণানিবারক তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে; এবং এই জন্তই
 জর্মানীর সৈন্যগণের “শীঘ্র-
 গতির” (Quick march)

যম ছাড়িবার উপায়

সময়ে তাহাদিগকে ইহা সৰ্ব্ব পরিমাণ সেবন করিতে
 দেওয়া হয়। অন্য কোন খাদ্য জিনিষই ইহার সমতুল্য নহে।
 বিশেষ পরীক্ষায় অবগত হওয়া গিয়াছে যে, বিশেষতঃ উষ্ণপ্রধান-
 দেশে, অধিক পরিমাণে চিনি অথবা শর্করাবাহন্য খাদ্য জিনিষ
 ভোজন, এল্কোহল অথবা অন্য কোন প্রকার টিসুলেণ্ট পানীর
 সেবনের স্পৃহা কমিয়া যায়। যে জাতি অধিক শর্করা অথবা
 তদাধিকায়ুক্ত খাদ্যাদি ভোজন করে, তাহাদিগের অপেক্ষা

যাহারা উহা স্বল্পভাবে আহাৰ করিয়া থাকে, তাহারা অধিক মদ্যপায়ী হইয়া থাকে বলিয়া পরীক্ষায় জানা গিয়াছে। দেশীয় মদ্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা কমাইবার ক্ষমতা শরীরায় আছে বলিয়াই, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেন্ট, সমধিক পরিমাণে ইহা ক্রয় করিয়া, ফিলিপাইনের সৈন্তবারিকে ব্যবহার জন্য প্রতি বৎসর পাঠাইতেছেন। সল্ফিউরিক আসিড্ ২।৪ কৌণ্টা মাত্রায় প্রত্যহ সেবনেও, মদের আশক্তি কমিয়া যায়। অতিরিক্ত মদের নেশা হইলে, শীতল জলের কাপ্‌টা দেওয়া বা ৩।৪ হস্ত উপর হইতে, শরীরে জল ঢালিতে থাকিলে, স্বল্প নেশার ঘোর কাটিয়া সংজ্ঞালভ হইতে পারে; সংজ্ঞা পাইলে তখন উগ্র কাফি ধানিকটা সেবন করিতে দেওয়া কর্তব্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

মাদক দ্রব্য প্রস্তাব ।

তামাক, অহিফেন, গাঁজা, কোকেন ইত্যাদি ।

এই প্রস্তাবে বর্ণিতব্য বিষয়ের বর্ণনার পূর্বেই, মদ্যকে যাহাকে সম্পূর্ণ মাদকদ্রব্যেরই অন্তর্ভুক্ত করা কর্তব্য,—কেন এই প্রস্তাবের মধ্যে না ধরিয়া পূর্ব অর্থাৎ পানীয় প্রস্তা

মদ্য পানীয়রূপেই সমাজে কতকটা অবৈধভাবে চলিয়া যাই-
তেছে, তাই উহাকে পানীয়পদার্থের মধ্যেই ধরা গিয়াছে।
সুতরাং এই প্রস্তাবে অহিফেন, গাঁজা, সিদ্ধি, তামাক ইত্যাদি
সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া যাইব ; অজীর্ণতার উপর লক্ষ্য রাখিয়রাই
—আহার্য্য, পানীয় অথবা ধূমপানীয়, যে কোন দ্রব্যেরই হউক
না কেন,—সমুদয় দ্রব্যের যথাসম্ভব আলোচনা করিয়া যাইবার
ইচ্ছাবশতঃই, নিতা ব্যবহার্য্য না হইলেও, আমাদের ‘সমাজে
যাহা যাহা অল্পবিস্তরও সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকে,
তাহার আলোচনার মনোনিবেশ করিতেছি ।

তামাক :—জগতে ধনী, নিধন, পণ্ডিত, বৃদ্ধ, পুরুষ,
স্ত্রী (স্থলবিশেষে), সকলেই শ্রম ও ক্লান্তি অপনোদন জন্য ইহা
ব্যবহার করিয়া থাকেন। পরিমিত মাত্রায় ধূমপান করিলে, ইহা
হৃৎকোষ্ঠপরিষ্কারক এবং শ্রম ও ক্লান্তিনাশক ; লালাত্রাব, আন্ত্রিক
রসকরণ ও বৃদ্ধিনিঃসরণ বর্জনকারকও
ঘটে, কিন্তু সকলের পক্ষে নহে। ইহা

তামাকের গুণ

অধিক দিবস এবং অধিক পরিমাণে সেবনে কাহারও ২ কন্স,
মৃগীরোগের ন্যায় আক্ষেপ, অক্ষিতারার সঙ্কোচন, হৃদয়ের অব-
সাদভাব, বকের অস্বাভাবিক শীতলতা ও প্রচুর ঘর্ম্ম হইতে
দেখা যায়। তামাকের পাতার রস অবসাদক এবং আক্ষেপ নিবা-
রক ; ইহার শুক পত্র, উদ্ভেজক, বিবমিষাজনক, বমনকারক,
এবং কখন ২ বিরেচক। বিষমাত্রায় ইহা “কোমা” উৎপাদন
করিয়া, হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসপ্রশ্বাসের অসাড়াবস্থা আনয়ন করে

গ্রহণ যথাব। উহার পাতা চর্ষণ করিলে, গিলদেশ, স্বরনলী, এবং পাকস্থলীর উত্তেজনা জন্মে এবং পরিণামে অজীর্ণতা, স্নায়বিক অবসাদতা, কাষোত্তেজনার বর্ধতা এবং এমন কি বক্ষস্থল (angina) পর্যন্ত জন্মিতে পারে। ইহা ব্যতীত পরিপোষণ এবং পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাতও ইহা উপস্থিত করে; এই জন্ম স্বল্পবয়স্ক বালক বা যুবকের পক্ষে ইহার ধূমগ্রহণ বড়ই ক্ষতিকারক। সময়ে

সময়ে ইহা হইতে হৃৎপিণ্ডের অব্যাবহিক বৃদ্ধি ও ক্ষীণতা প্রভৃতিও জন্মিতে পারে।

ইহার অতিরিক্ত ব্যবহারে, যে সমুদয় বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে প্রতিনিয়ত দেখা যাইতেছে তাহার বর্ণনা করিবার পূর্বে, কি কি অবয়বে ইহা আমাদের আবালবৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বৃদ্ধগণ প্রায়ই তামাকু এবং নস্তুরূপে ইহা গ্রহণ করিয়া থাকেন, বালক এবং যুবকগণ সিগারেট, বার্ড-সাই, নস্তু (আজকাল), তামাকু এবং পানের সহিত গুণ্ডি, চোয়া, সুরতি, ইত্যাদি প্রকারে এবং গ্রীষ্মোত্তেরা তামাক পাতা (পূর্ববঙ্গের গ্রীষ্মোত্তেরা বিশেষতঃ), সুরতি, চোয়া এবং গুণ্ডি প্রভৃতি প্রকারে পানের সহিত, দিবা রাত্রি ইহা সেবন করিয়া থাকেন। ইহাও এক প্রকার নেশা, স্তূতরাং অভ্যাস বহু বাড়াইতে থাকে, ততই বাড়িয়া যায়। উড়িয়া দেশেরেরা গুণ্ডি এবং পশ্চিমপ্রদেশেরা ধূসান্ অর্থাৎ তামাকের শুষ্ক পত্র অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকে।

প্রকারভেদে

তামাক গ্রহণ

বাকালী চিরদিনই অশ্রুতরূপে বিস্তার পটিলসী, স্মৃতরাং ইংরাজের নিকট সিগারেট, সিগার, উড়িয়ার নিকট গুণ্ডি, পশ্চিমাদের হইতে সুরতি এবং নিজ দেশীয়ের তামাকু ও নশ্ত সকলি ব্যবহার প্রথা বজায় রাখিয়াছে। ইহারে বিবরণ কল সকলে বিদিত না থাকায়, জীমহলে পর্যন্ত ইহার প্রসার বৃদ্ধি জাত থাকিয়াও প্রতিরোধ করে না।

অধুনা বৈদেশিক দ্রব্যের আমদানি তালিকায় দেখিতে পাইবে, প্রতি বৎসর ৫০১৬০ লক্ষ টাকার সিগারেটেরি ধ্বংস আমরা করিয়া থাকি !! কিন্তু ইহা কি আমাদের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস? না কখনই নহে !! বরং আমাদের মুজ্জাগত বাণিজ্য আনয়নের ইহাই প্রধান কারণ। তামাকুসেবন শ্রমজীবীগণের পক্ষে বিশেষ আরাম-

তামাক খাওয়া

স্বথের জিনিস!

দায়ক, অথবা শারিরীক বা মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্তি জন্ম সেবনে, তৃপ্তি ও শান্তিপ্ৰদ, কিন্তু স্বথের খাতিরে উহা খাওয়ার অভ্যাস বড়ই দূষনীয়। আজকাল যুবক ও বালকগণের মধ্যে যে, অত্যধিক পরিমাণে তামাকুসেবন প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যে সম্পূর্ণ স্বথের খাতিরে ইহা বোধ হয় সকলেই বিদিত আছেন। যে স্কুল কলেজে, আমরা নিসঙ্কোচে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে বিজ্ঞানিকর জ্ঞান পাঠাইয়া থাকি, তথা হইতেই যে অপরিণত বুদ্ধির বালকগণ, এই কু অভ্যাস গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাও সর্ব বিদিত। কিন্তু অস্থিরমতি বালকগণের দোষ কি? তাহা-

দিগকে ত নীতিশিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হয় নাই ? অথবা এই সমুদয় ব্যবহার করিলে যে, শরীরের পক্ষে অপকার হইতে

পারে তাহাও ত বলিয়া দেওয়া হয় নাই ! তারপর একবার অভ্যস্ত হইলে, সমুদয় নেশার জায় ইহার ব্যবহারও সহজে আর ছাড়িয়া দিতে পারে না !

পরিমিত মাত্রায় তামাকের ধূমগ্রহণ যে, অনেকের পক্ষে অনিষ্টকারক নহে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু আবার কোন কোন লোকের শরীরে তামাক যে বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহাও অবিস্মৃত নহে ! তামাক পাতা চর্কণ বা নস্তু লইলে, পাকস্থলীর প্রদাহ সংঘটনের সম্ভাবনা, কিন্তু উহার ধূমে শ্বাসবীয় শূল জন্মিতে পারে। অধিকন্তু ইহাতে দৃষ্টিশক্তি দুর্বল এবং প্রতিহত

করিয়া দেয়, সমুদয় বস্তু বেশ স্পষ্ট

তামাকের ব্যবহার ও

অপব্যবহার কল

দেখা যায় না—এমন কি চক্ষে ছানি

পড়া পর্য্যন্ত ঘটিয়া অন্ধতা আসিয়া পড়িতে পারে। শ্রবণশক্তির দৌরলভা, কাণ ভেঁা ভেঁা করা, মাথায় প্রবলবেগে রক্তধাবণ, শিরোঘূর্ণন, চিত্তনিবিষ্ট হইয়া মানসিক কার্য সম্পাদনে অক্ষমতা ও মেলাকলিয়া এবং আত্মপ্রতি অবিশ্বাস্তাবও ইহাতে সংঘটিত হইতে পারে। নিদ্রাবস্থা গভীর না হইয়া, ভয়জনক স্বপ্নমালার বিজড়িত হইয়া পড়ে। এই সব জন্ত পরিপোষনের বিয় এবং শ্বাসযন্ত্রের বলক্ষয় হওয়ায়, সম—কার্যকারিত্বের (co-ordination) অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হইয়া, মাংসপেশীর বর্ধন ও তাহাতে মেদসঞ্চয়ের ক্রিয়া দ্রুততর হইয়া

আইসে। স্বাভাবিক স্মৃতি মন্বীহৃত হওয়া এবং পরিপাক শক্তির হ্রাস, গলার স্বরের বিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়াও বিরল নহে। ডাঃ লডার ব্রণ্টন (Laudar Brunton) বলেন যে, তামাকে নিকোটিন নামক উহার তীক্ষ্ণবীৰ্য্য বর্ধমান পাকা হেতুই, ইহা সেবনে অপকার করিয়া থাকে, কারণ নিকোটিন বিষবৎ অনিষ্টকরী জিনিষ। কিন্তু বিশেষ পর্য্যবেক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, তামাকের পচনাবস্থা (decomposition) হইতে উদ্ভূত পাইরিডিন্ (pyridine) ও কলিডিন্ (collidine) পদার্থদ্বয়ের অবস্থিতি জন্মই যত অপকার সংঘটিত হয়।

বিলাতী প্রণামত “পাইপ” বোলে তামাকের ধূমগ্রহণে, পূর্বোক্ত পাইরিডিন্ নামক পদার্থই অধিকতাবে ধূমপায়ীর শরীরে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু “সিগার” রূপে উহা গ্রহণে, বাহ্য বায়ুর সংযোগ অধিকতর পাওয়ার, তামাকের কলিডিন্ পদার্থই অধিক গৃহীত হইয়া থাকে। এই কলিডিন পদার্থ পাইরিডিন অপেক্ষা অল্প হানিজনক, সেজন্য ভারতবাসী ইয়ুরোপীয়গণ পাইপ অপেক্ষা সিগার অধিক গ্রহণ করিতে পারেন এবং তাহাতে বিশেষ অপকার করে না। দেশীয়

বিলাতী ও দেশী

ধূমপান প্রথা

প্রণামতে, তামাকের সহিত ওড় ও অত্যন্ত মসলা সংযুক্ত থাকায়, শুধু তামাক অথবা উহার পাতার ধূমগ্রহণ অপেক্ষা, অল্প ক্ষতিকারক হইয়া থাকে। এ কারণ তামাকসেবন যদিই কেহ প্রয়োজন মনে করেন, তাহা হইলে বিলাতী আদর্শে সজাগিত

সিগারেট বা বার্ডসাই সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী । ১৮১

‘না হইরা, দেশীয় প্রথমত মাথা তামাক সাজিয়া ধূমপান করাই
প্রশস্ত বলিয়া মনে করি। প্রসঙ্গক্রমে এখানে সিগারেটের
অনিষ্টকারীতার কথাও আলোচনা করা আবশ্যিক ; এই
সিগারেট সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী ;

সিগারেট ও সিগার

ইহাতে অজীর্ণতা, ফুসফুসের দোর্বলতা,
হৃৎস্পন্দন, এমন কি থাইসিস্ পর্যন্ত আনিয়া দিতে পারে।
এমন অপকারী জিনিষই আবার, অত্যধিক মাত্রায়
আমাদের বালক ও যুবকগণের মধ্যে ব্যবহৃত হইতে
দেখা যায়। ইহা কি কম পরিতাপের বিষয় !! বিলাতী
প্রথমত “পাইপ” ধূমগ্রহণও, সিগার ও সিগারেট অপেক্ষা
প্রশস্ততর। সকল সিগার ও সিগারেট সমান শক্তিবিশিষ্ট
ধাকে না, ব্যবহারকারীগণের জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে,
ইজিপ্‌সিয়ান অথবা তুরস্কের সিগারাদি অপেক্ষা, আমেরিকার
সিগার অপেক্ষাকৃত স্বল্প হানিজনক এবং ঘরের মধ্যে বসিয়া
উহার ধূমগ্রহণ অপেক্ষা, বাহিরের মুক্তবায়ুতে ধূমগ্রহণই
প্রশস্ততর।

তামাকের ধূমগ্রহণ সময়, বাহাতে উহা নিশ্বাসের সহ
ফুসফুস মধ্যে বাইতে না পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।
অজীর্ণতা রোগগ্রস্তগণ ইহার আবাদ
গ্রহণে যেন একেবারে বিরত থাকেন ;
যদি সামান্য অজীর্ণতা বর্তমান থাকে,
তাহা হইলে দিব্যরাত্রির মধ্যে ২১ বার মাত্র, খুব নরম
তামাক সেবন চলিতে পারে। সিগার অথবা সিগা-

তামাক ব্যবহারে
সামধানতা

রেট মোটেই স্পর্শ করিওনা এবং তামাকুর ধূম পরিপূর্ণ স্থানে আহার করিবেনা; তামাকুর ধূম পরিপূর্ণ স্থানে থাকাও বাহা, তামাকুসেবনও তাহাই জানিবে। প্রাতে উঠিয়াই তামাকু সেবন, অজীর্ণরোগীর পক্ষে উপযুক্ত নহে; আহারের পূর্বে বা পরক্ষণেও তামাকু গ্রহণ কর্তব্য নহে, কারণ তাহাতে পরিপাকশক্তি ধ্বংস হইয়া যায় ।

একই উদ্ভিদ হইতে সিদ্ধি, গাঁজা ও চরস উৎপন্ন হইয়া থাকে; পাতার নাম সিদ্ধি, মঞ্জরীর নাম গাঁজা এবং উহা হইতে নিষ্কৃত রসের নাম চরস জানিবে।

সিদ্ধি প্রধানতঃ কামবর্দ্ধক, নিদ্রাজনক, হৃদয়াক ও বহু রক্তস্রাবনাশক; অজীর্ণতা ও গনোরিয়া

পীড়ায়, সামান্য মাত্রায় ইহা ব্যবহারে

সিদ্ধি, গাঁজা, চরস

অনেক স্থলে উপকার হইতে দেখা যায়; কিন্তু নিয়মিত-রূপে অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইতে থাকিলে, উহা সেবন-কারীকে রক্তস্রাবযুক্ত করিয়া ফেলে। স্বাভাবিক নম্র স্বভাবও ইহার প্রভাবে বদমেজাজী হইয়া পড়িয়াছে দেখা

গিয়াছে। ইহার কাথ দ্বারা স্নায়বিক বেদনায়ুক্ত স্থান, এরিসিপ্যালস ও অর্শ স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হয়। ওলা-উঠার পূর্ক অবস্থায়, ইহা প্রয়োগে আফিমের জ্বায় সফল প্রদান করিয়া থাকে অনেক বলেন, কিন্তু আমরা তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না, কারণ অনেক সময় দেখিয়াছি উহা প্রযুক্ত হইলে বিপরীত ফল ফলিয়াছে। গাঁজাও সিদ্ধির জ্বায় নিদ্রাকারক, বেদনাহর এবং ক্ষুধা ও সাহসবর্দ্ধক। আফি-

যের ভায়, ইহা কোষ্ঠবদ্ধকারক বা অগ্নিমান্যজনক নহে, অথবা অহিকেনের ভায়, তাহার সহচর কষ্টপ্রদ উপ-সর্গাদিও আনয়ন করে না। মদ ও আকিমের ভায় ইহাও, অনেকে নেশা রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। পুরাতন বাত-রোগ, কষ্টরজঃ বা অতিরজঃ এবং শিরশীর্ষাদিতে ইহা ভেষজরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অভ্যস্তভাবে কিংবা দীর্ঘ-কাল সেবনে, ইহা মুখ ও চক্ষু রক্তবর্ণ করে, স্থিতিশক্তির দুর্বলতা এবং হস্তপদের কম্প ও ক্ষীণতাও আনয়ন করিয়া থাকে। চরসেন্দ্র ও সাধারণ গুণ এই জানিবে।

দ্রব্যের ভেদ গুণ

দ্রব্যমাত্রেই গুণসম্পন্ন, এবং তাহা

কেবলমাত্র পাঁড়াকালেই প্রযুক্ত হইলে উপশমপ্রদায়ক হয়, কিন্তু যদি তাহা শরীরে অভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে আর

উহার সে গুণ বর্তমান থাকে না, বরং অপব্যবহারজনিত মল-ফসরাগিই উৎপন্ন করিয়া থাকে।

আহিকেন :— ঔষধার্থ পরিমিত মাত্রায় সেবনে, মস্তিষ্ক-ক্লম্পিও এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রথমে উত্তেজন প্রকাশিয়া, পরে সমুদয় শরীরের অবসাদতা আনয়ন করিয়া থাকে। ইহা সাধারণতঃ নিদ্রাজনক, বেদনাহর, আক্ষেপনাশক,

অহিকেন

ঘণ্টকারক, মাদক ও মস্তিষ্কের অব-সাদক। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুগুলীর উপর ইহার ক্রিয়া থাকায়, স্নায়ু দ্বারা ইহা দেহের সর্ব ইন্দ্রিয়ের উপর ক্ষমতা বিস্তার করিয়া থাকে। আকিম বলমাত্রায়ও কিছু দিন সেবনে, স্তম্ভ ও বর্ষশ্রাব বর্ধিত হয়, পিত্ত, মেঘা ও রসাদি আবহাস প্রাপ্ত

হয় ও যুগপৎকাল ও গলদেশের শুষ্কতা জন্মায়। পাকিস্থানিক
রাসের আবহাওয়ায় হ্রস্বতরং কুখ্যাত কমিয়া যায় ; পিত্তরসের
ক্ষয় কমিয়া যাওয়ায়, পরিণামে কোষ্ঠবদ্ধতা আসিয়া পড়ে।
জ্বপিত্তের ক্রিয়াবর্ধন জন্য, নাড়ী বেগবতী হয়, ঘোর তন্দ্রাতাব
আইসার পূর্বেই, কাল্পনিক চিত্তাবিকাশে মন নানা প্রকার অতি-
নব ব্যাপারে লিপ্ত হয়। নিদ্রা ভালরূপ না হইয়া, ঘোর
তন্দ্রাপূর্ণ—সুতরাং স্বপ্নবিজড়িত হয় এবং জাগরিত হইলে
দেখা যায় যে, হর মাথা ধরিয়াছে, নয় উত্তম জীর্ণ হয়
নাই, কোষ্ঠও পরিষ্কার হইতেছে না এবং শরীর ক্ষুভীর্ণ
বোধ হয়।

আমাদের দেশে অহিফেণ বিশেষরূপে প্রচলিত দেখিবে ;
চীনদেশেও আবালবৃদ্ধবনিতার আরামদায়ক পদার্থ বলিয়া বিশেষ-
তরূপে এতদিন ইহা আদৃত ছিল ; কিন্তু বর্তমান চীনা গবর্ণ-
মেন্ট উহার বিষময় ফলে, চীনাজাতির জীবনীশক্তি দিন দিন
অবসাদগ্রস্ত হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, দেশ হইতে একেবারে
অহিফেণ বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য বহুপরিকর হইয়াছেন।
অহিফেণ প্রভাবে চীনাগণ এতই অবসাদাক্ষর হইয়া পড়িয়াছে
যে, সমগ্র জগতের অর্ধসংখ্যক অধিবাসীর বাসস্থান এবং
চিরদিন শোষাবীর্ষ্যে পরীক্ষান্ধ ঝাঁক। সত্ত্বেও, আজ চীনাগণ
জগতে সকলের নিকট অপদস্থ এবং বিধ্বস্ত ! উপর্যুপরি
এইরূপে বিধ্বস্ত হইয়াই, চীনা গবর্ণমেন্ট বুঝিয়াছেন যে, অহি-
ফেণ সেবনই তাঁহাদের জাতীয়শক্তি ধ্বংসের এবং জাতীয়

জীবনের উদ্ধীপনা নাশের কারণ—সুতরাং দেশে নবশক্তি সন্ধান

করিতে হইলে, জাতীয় জীবননাশের মূলোচ্ছেদ করাই সর্বতো-
ভাবে কর্তব্য। কিন্তু বহুদিবসের অভ্যাস একেবারে ছাড়িবার
উপায় নাই এবং সে চেষ্টার অপকার ভিন্ন
উপকারের কোনই আশা নাই; তাই

অহিংসে গীন

চীনা গবর্ণমেন্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, দশ বৎসরের মধ্যে
উহা সেবনের অভ্যাস পরিত্যাগ করিতেই হইতে, নতুবা
সেবনকারী আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে।

অহিংসের ব্যবহার দুবনীর বলিয়া আমরা এ কথা
বলিতেছি না যে, আলো কোন প্রকারেই উহার ব্যবহার
করা উচিত নহে; ঔষধরূপে ইহা সমুদয় প্রকার বেমনার
উপশমনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু যতিক্ষে প্রদাহে
ব্যবহার করা আদৌ কর্তব্য নহে। সকল প্রকার উত্তে-

জনা কিংবা আক্ষেপ, সাময়িক বিদ্রোহে ইহা এলো-
প্যাথির প্রধান ঔষধ। প্রধাণতঃ

ঔষধে অহিংস

অনিদ্রা, সারাটিকা, কটিবাত,

ক্যান্সার, রেনাল কলিক অথবা পিত্তশূল প্রভৃতিতে ইহা
প্রযুক্ত হইলে, উত্তেজনার উপশম হইয়া নিদ্রা আসিয়া পড়ে।
অহিংসের এই উপশমকারক ক্ষমতা আর কিছুই নহে—
ইহা কেবলমাত্র নেশা জন্মাইয়া শরীর অবসন্ন এবং বেদনাদির

বোধশক্তি হ্রাস করে মাত্র। এই শক্তি অহিংসের
ক্রিয়া বর্তমান কালাবধিই দেখিতে পাওয়া যায় এবং যে
মাত্র উহার ক্রিয়া হ্রাস হইতে থাকে, পূর্ব বেদনা ও পুনরায়

করিতে হয়। ফলে এমন সময় আসিয়া পড়ে যে, আর অহিফেণেও কাজ দেয় না এবং অন্ত কোন ঔষধেও (যত-
কণ অহিফেণের ক্রিয়ানাশক ঔষধ না পড়িতেছে) বিশেষ
ফল পাওয়া যায় না। বেদনা উপশমকারক রূপে ব্যতীতও
গ্রহণী, আম ও রক্তাতিসার, অতিরিক্ত স্নেহানির্গম, বহুমূত্র,
প্রচুর লালান্নাব ও প্রদরান্নাবের প্রাচুর্য্য হ্রাস করিবার জন্যও
অহিফেণ ব্যবহৃত হইতে সঙ্গী দেখা যায়। কিন্তু ফল সেই
একই অর্থাৎ প্রথমে স্বপ্ন কমিয়া, পরিশেষে আর কার্য্যকরী
হয় না; কারণ নিত্য ব্যবহারে উহার পৃথক ভেষজগুণ নষ্ট-
ভূত হইয়া, শরীরের প্রকৃতিগত বার্ষ মধ্যোই উহা পরি-
গণিত হইয়া যায়।

আফিমের আর একটি গুণ এই
যে, একবার ইহার প্রেমে মজিতে
পারিলে, আর অন্ত কোন প্রকার মাদক
দ্রব্যের, (যেমন মদ্য, গাঁজা, কোকেন ইত্যাদি) স্পৃহা
থাকে না। অস্ত্রান্ত মাদক দ্রব্যের সহিত ইহার বিভিন্নতা
এই যে, ইহা মানুষকে উন্মাদ করিয়া আত্মীয় স্বজনকে মারপিট,
গৃহবস্তুর অপচয় অথবা “টাকা উড়াইবার” সহায়তা করে না!
নির্দিষ্ট সময়ে, অভ্যাস পরিমিত আফিম পাইলেই তৎসেবী
সন্তুষ্ট, এমন কি জগৎ সংসার ভুলিয়া, কালনিক স্মৃতিচিন্তায়
অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে!

মাত্রাধিক্যতার অহিফেণ প্রাণনাশক—তাই আমাদের দেশে

দেশের বৃদ্ধগণ প্রায়ই ইহার সেবক এবং
অসুস্থতানে প্রায়ই অবগত হইতে পারা
যায় যে, কোন প্রকার পীড়া, শাস্তির
জন্ত, সর্বপ্রথম উহার ব্যবহারে তাঁহারা অভ্যস্ত হইয়া, পরি-
শেষে আর ত্যাগ করিতে পারেন নাই! এই বিষয়
জিনিষ কদাচ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে; অভ্যাস অধিক
দিনের হইলে, আর ছাড়িতে পারা যায় না—সুতরাং সময়
থাকিতে সাবধান হইয়া ইহা পরিত্যাগ করা কর্তব্য। একে-
বারে না ছাড়িয়া, ক্রমে মাত্রা কম করিয়া আনিতে হয় এবং
তাহাতে বিশেষ অপকারও করে না। আফিম খাইয়া নেশার
গোর লাগিলে, খানিকটা কাকি সেবন করাইয়া দেওয়া
কর্তব্য। কাকি অহিফেনের উত্তম প্রতিবেশক।

কোকেন নামক একপ্রকার মাদকদ্রব্য আজকাল
এত অধিকরূপে প্রচলিত দেখা যাইতেছে যে, বাধ্য
হইয়া গবর্ণমেন্ট চিকিৎসকের ব্যবস্থা তির, সাধারণে ইহা
বিক্রিত হইতে নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু গোপনে ইহা
এত অধিক বিক্রয় হইতেছে যে, আইন করা বা না করা
সমান দাঁড়াইয়াছে। কোকেনসেবী ইহা সেবন করিতে
পাইলে, কুধাতুকা একেবারে ভুলিয়া,
কেবল ইহাই খাইতে থাকে। যে কয়-

কোকেন

দিন ইহার বশে থাকে, তখন অন্ত কোন জিনিষ খাইতেও পারে
না,—কেবল কচুরি, চানাডা এবং পান সদা চর্ষণ করিতে

চাহে। কোকেনের জিন্নার, সমুদ্র শরীরে দোলন ও অঙ্গ-
বিকৃতি (বিশেষতঃ মুখমণ্ডলের), হইতে থাকে

চুরি করিতে স্পৃহা হয়। অন্য সময়ের নেশার জ্বর ইহাও অভ্যাসকারী পরিত্যাগ করিতে পারে না। চুরি করিতে প্ররম্বি কেবল ইহা ও “গুলি”তেই উদ্ভব করায়। অধুনা সহরে ইহা প্রায় প্রত্যেক পানের দোকানেই গোপনে বিক্রীত হইয়া থাকে। পাকস্থলী বিকৃতি, দিম্বার জড়তা, ভীতিপূর্ণ স্বভাব, বুদ্ধিবিকৃতি ও শারীরিক অবসাদতা অল্প গভীর অচেতন-বৎ নিদ্রা হইবার ফলে সংঘটিত ইহাতে দেখা যায়। কত ভ্রমলোকের সম্মান যে, কুসংসর্গে মিশিয়া ইহা খাইতে শিখায় অধঃপতিত হইয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। অধিক দিবস খাইলে পরিণামে ইহাতে পক্ষাঘাত পর্যন্ত দেখা দিতে পারে।

মাদকদ্রব্য মাঝেই বর্জন করিতে চেষ্টা পাওয়া একান্ত আবশ্যক, নতুবা পরিণামে উহা হইতে নানা গোলমাল উপস্থিত হইতে পারে।

নবম পরিচ্ছেদ ।

খাদ্য পদার্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

সাধারণতঃ আমরা অনেক সময়ে, জ্বরের অনুরোধে আহার করিয়া থাকি, কিন্তু কোন্ কোন্ জাতীয় পদার্থ আহার করা কর্তব্য, তাহার বিশেষ তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক মনে করি না। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আহার করিয়া বাই মাত্র। সুস্থ-শরীরীপণের পক্ষে এই প্রকার আহারে কোনই অপকার

যদিতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু অনুহুতরীয়ে বিবন কতি করিয়া থাকে দেখা গিয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ের উপর একটু দৃষ্টি সকলেরই রাখা আবশ্যক, বিশেষতঃ চিকিৎসকের— কারণ তাঁহার ব্যবস্থাসম্বন্ধেই রোগী আহার করিয়া থাকে।

বিভিন্ন দেশে যত্নবোধে খাদ্যপদার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নির্দিষ্ট থাকিতে দেখা যায়; ইয়োরোপ, আমেরিকা এবং অন্যান্য স্থানের যেতাজগণের আহাৰ্য্য প্রধাণতঃ কুটী ও মাংস; এন্টাইমো প্রভৃতি উত্তর য়েরুপ্রদেশের লোকেরা, সহজেই সৰ্ব্বপ্রকার চৰ্কিসংযুক্ত আহাৰ্য্য খাইয়া জীবনধারণ করে! এশিয়াবাসী, চীন, জাপান, পারস্ত, আফগান প্রভৃতি প্রায় সমুদয় জাতিরই—বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয়গণের—প্রধান খাদ্য, অন্ন ব্যঞ্জন, দ্রুত, দুগ্ধ, ফল ও মূল দৃষ্ট হয়। আরব্যাগণের

জায় মরুদেশবাসীগণ, তুটি, কলাই এবং বর্জুরাদি খাইয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীর যে প্রদেশে, বিভিন্ন দেশীয়ের আহার
যে রূপ খাদ্যই প্রচলিত থাকুক না কেন, প্রত্যেকেরই আহাৰ্য্য পদার্থের মধ্যে শরীররক্ষণ ও পোষণোপযোগী আবশ্যকীয় সকল উপাদানই প্রধাণতঃ বর্তমান থাকিতে দেখা যায়।

এই উপাদান সকল সৰ্ব্বপ্রথমে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত দেখা যায়, যথা, (১) নাইট্রোজেনস্ বা প্রোটিন পদার্থ এবং (২) অ-নাইট্রোজেনাস্ (নাইট্রোজেন রহিত) পদার্থ। চৰ্কিজাতীয়, যেতসার-জাতীয়, বনিজজাতীয় এবং জল, এই কয়টি পৃথক পদার্থ লইয়া বিভিন্ন বিভাগটি গঠিত

জানিবে। নাইট্রোজেনস্ বা প্রোটিন্
পদার্থ আবার (ক) জন্তব ও (খ)

খাদ্যের উপাদান

উদ্ভিদ প্রকারে দুই ভাগে বিভক্ত। এই নাইট্রোজেনস্
পদার্থ আমাদের শরীর সংগঠন ও সম্পূর্ণ করিবার জন্য,
বিশেষ প্রকারে আবশ্যক হয়। ধাকে—সুতরাং ইহার বিষয়
একটু বিশদভাবে জানা কর্তব্য। নাইট্রোজেন বিভাগ যথা :—
নাইট্রোজেন

জন্তব

এলুমিন, কেসিন, জিলাটিন, গ্লুটেন, এলবুমেন, লেগুমেন
মোবিউলিন, কর্ডুণ

আমাদের খাদ্য অন্তর্গত প্রোটিন পদার্থ যথা :—মৎস্য, মাংস,
ডিম এবং ছদ্ম ও ভেজিটেবল (vegetable) নাইট্রোজেন
যুক্ত পদার্থ। এখানে আমরা এই উদ্ভিদ নাইট্রোজেনের
কথাই বলিব। উপরের তালিকা হইতে ইহার অন্তর্গত আমরা
৩টি জিনিষের নাম দেখিতে পাই; এখন দেখিতে হইবে
কোন ২ প্রচলিত খাদ্যে ইহা দৃষ্ট হয়।

উদ্ভিদ প্রকৃতি

বিশেষ পরীক্ষায় জানা জানা গিয়াছে

যে, গ্লুটেন Gluten নামক পদার্থ, ময়দায় শতকরা ১১ ভাগ.

ছোলার ছাড়ুতে ১২। এবং চাউল মধ্যে ৫ ভাগ দৃষ্ট হয়। (ময়-

দায় চাপ বাধাইয়া, ক্রমে ক্রমে যেতসারীর অংশ বিধোত করিয়া
কেলিলেই, এই গ্লুটেন পাওয়া যাইতে পার)। ইহা অতিশয়

পুষ্টিকর খাদ্যপদার্থ। এলবুমেন albumen নামক পদার্থ আলুতে

শতকরা ১৫ভাগ এবং মটর বা তরুণ শুঁটিকাভীর পদার্থে

শতকরা প্রায় ২২ ভাগ লেগুমেন legumen নামক পদার্থ পাওয়া যায়। বালি, ময়দা ও আটার মুটেনের পরিমাণ অধিক ও খেতসারের অংশ স্বল্প দেখিবে। সরিষার মধ্যে, খেতসার অধিক এবং প্রোটিন্ স্বল্প। রাসায়নিক পরিমাণ দৃষ্টে ভূঁ-
 কাতীয় পদার্থ, অতিশয় পুষ্তিকর বলিয়া প্রতীত হইলেও, কৃষ্টি
 প্রকৃতি অপেক্ষা ইহারা বিশেষে পরিপাক পাইয়া থাকে,
 সুতরাং উহাদের ব্যবহারে সাবধান হওয়া কর্তব্য। যাহারা মৎস্য,
 মাংস বা ডিম্ব আহার করে না, এই জাতীয় উদ্ভিদ প্রোটিন
 পদার্থ নিরম্মিত আহার করা তাহাদের অবশ্য কর্তব্য। মনু-
 য়ের ঋতুসামগ্রীতে ১ ভাগ নাইট্রোজেন বহিত এবং ৪ ভাগ
 নাইট্রোজেন রহিত পদার্থের অস্তিত্ব থাকে আবশ্যক।

ঋতু পদার্থের মধ্যে, যে পরিমাণ দ্রব্য শরীরের পরিপাকক
 digestive এবং সমীকারক assimilative কার্যপ্রণালী দ্বারা
 গৃহীত হইয়া শরীরবিধানের গঠন, টিস্যু
 সম্বন্ধের মেরামত repairs এবং মাংস-
 পেশীর ও জৈবনিক vital শক্তি enc-
 ergy সরবরাহ করিতে সমর্থ হয়, তাহাকে অর্থাৎ সেই পরিমাণকে
 ঐ ঋতুপদার্থের মূল্য Food-value কহে। প্রত্যেক ঋতু
 পদার্থের, এইরূপে মূল্য value নিরূপক আদর্শ পরিমাণকে
 বৈজ্ঞানিক ভাষায় ক্যালরি Calorie বলে। যতদূর সম্ভব
 এইরূপে প্রত্যেক ঋতুপদার্থের মূল্য নির্দেশ পূর্বক, যে সকল
 দ্রব্য সহজে পরিপাক পায়, স্বাস্থ্যরক্ষা করে এবং প্রচুর, অগচ
 সহজলভ্য তাহাই আহার করা কর্তব্য। সময়ে সময়ে আবার

আহার্য পদার্থের
 নির্ধারণ

আহার্যপদার্থের পরিবর্তন করা নিত্য আবশ্যক, নতুবা
অরুচি জন্মাইতে পারে।

খাদ্য হিসাবে, নাইট্রোজেনাস্ পদার্থ যাত্রেয়ই সম্বাদ্ তপ
দেখা যায় না ; এলুমিনস্ ও কেসিন জাতীয় এই পদার্থই
বিশেষ প্রয়োজনে আসিতে দেখা যায়। জাতব এবং উত্তম
পদার্থ এবং ছুঙ্ক ও পানীয় জলের সহিত, নানা প্রকারে আমরা
খনিজপদার্থও ভোজন করিয়া থাকি। জল আমাদের খাদ্য
পদার্থের মধ্যে একটি প্রধানতম জিনিষ। ইহা আমাদের
শরীর ওজনের, শতকরা ৩০ ভাগ অধিকার করিয়া থাকে এবং
সর্বদা কুস্কুস, কীড়নী ও স্বক দ্বারা বহিঃনিষ্কৃত হইয়া বাই-
তেছে। এইজন্য প্রত্যহ তিন সের বা পাঁচ পাঁইট জল সর্ব-
প্রকারে আমাদের নিত্য পান করা কর্তব্য। পানীয়
হিসাবে যে, বিত্তজ জলই সর্বাধিক স্বাস্থ্যকর তাহা বখা
স্থানে বলিয়া আসিয়াছি।

ডাঃ কারপেন্টার Carpentar বলেন যে, সময়ে সময়ে
খেতসারজাতীয় আহার্য পদার্থের পরিবর্তনের ক্রম, আমিব-
জাতীয় ভক্ষ্যদ্রব্যেরও পরিবর্তন করা নিত্য আবশ্যক।

মৎস্ত আহারের প্রথা, আমিব আহারের

মৎস্ত ও মাংস

মধ্যে প্রেষ্ঠ বলিয়া নানা বৈজ্ঞানিকের

দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। ডাঃ জন ডেভী John Davy
বলেন যে, মৎস্তভোজীরা যেমন সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়,
তেমনি আর কোন প্রাণীর লোকে হইতে দেখা যায়
না। অবশ্য সকল প্রাণীর মত যে, সহজ পরিপাচ্য (সুতরাং

স্বাস্থ্যকর) নহে তাহা সর্ববাদীসম্মত। মৎস্যজাতীয় অর্থাৎ নাতিস্ক্রুৎ বা নাতি বৃহৎ মৎস্তই, যে সহজ পরিপাচ্য তাহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির সকালনজনিত শ্রান্তি দূর করিতে, মৎস্ত অপেক্ষা উপাদেয় শ্রেষ্ঠ ষাণ্ড উপদান আর নাই বলিলেও চলে, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। মৎস্ত মধ্যে ফস্ফরাস নামক পদার্থের অস্তিত্বই এরূপ ধারণার প্রধাণ কারণ, কিন্তু মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল ডাঃ লিউকিস সাহেবের মতে ইহা ভ্রমমূলক। অপিচ তিনি বলেন যে, ফস্ফরাস অধিক ভাঞ্জে শরীরের অপকার ভিন্ন উপকার বড় দেখা যায় না। রোমের সমৃদ্ধিকালে ধর্মযাজকগণ, তথায় মাংসের পরিবর্তে প্রায়ই মৎস্তাহার করিতেন এবং তাহার ফলে বহু চিন্তাশীল এবং কঠোর কার্য সম্পাদন করা সম্বন্ধেও তাঁহারা দীর্ঘজীবন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস এখনও যদি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, অতিরিক্ত মাংসাহারের বদলে মৎস্ত অধিক পরিমাণে ভোজন ও সুরার পরিবর্তে, পানীয়রূপে নির্মল জল ব্যবহার কবিত্তে পারেন, তাহা হইলে আজকালকার জ্বর, ডায়াবিটিস, বাত, ক্যান্সার প্রভৃতি রোগের আতিশয্য তাঁহাদের মধ্যে আর বর্তমান থাকিতে পারে না !!

নিম্নে কয়েকটি প্রচলিত ষাণ্ড পদার্থের রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ যুক্ত তালিকা দেওয়া গেল :—

নাম	নাইট্রোজেন	কার্বন	ধাতব	জল
চাউল	৭	৭৮	১	১৪
এয়ারট	৪	৮২	১	১৩
সাগুদানা				
পানিফল				
লাল আলু	২	২৮	৩	৬৭
গোল আলু	২	২৩	১	৭৪
বাঁধা কপি	১	৫	১	২০
বাদাম	২৯	৪৮	৪	১৯
নারিকেল	৬	৪৪	১	৪৯
কলা	৫	২১	১	৭০
খেজুর	৯	৫৮	০	৩৩
আম্র	১	১৫	১	৮০
আপেল	০	১১	০	৮৯
পেয়ারা	০	১১	০	৮৯
ফুল	০	৯	১	৯০
ফুলকপি	৬.৪	৩৬	০	৮৯
শসা	১.৫	১.৫	০	৯৭

B. বাঁচা ফল যেমনসকল, কিন্তু পাকা ফলে তৈলাক্ত পদার্থই অধিক থাকে ।

খাদ্যপদার্থের রাসায়নিক উপাদান । ১৯৫

নাম	নাইট্রোজেন	কার্বন	ধাতব	জল
চিনি	০	১০০	০	০
গুড়	০	৮২	০	১৮
মাখন ও দৃত	০	১০০	০	০
গম	১৩	৭২	২	১৩
জনার	৯	৭৫	২	১৪
যব	১১	৭২	২	১৫
মৎস্ত	১৪	৭	১	৭৮
মাংস	২২	১৪	১	৬৩
ডিম	১৪	০	১	৮৫
ডাইল, ছোলা	১২	৬২	৩	১৬
অরহর	১০	৬১	৩	১৬
মটর	১৫	৫৮	২	১৫
মসুর	২৪	৫২	২	১৫
বেঁসারী	২৮	৫৬	৩	১৩
বরবটি	২৪	৫২	৩	১৪
মুগ	২৪	৬০	৩	১৩
মাস কলাই	২২	৬২	৩	১৩
কলাই মুটি	৭	৩৬	২	৫৫
হুন্ড	৫	৮	১	৮৬

N. B. প্রত্যেক পদার্থ পদার্থের ১০০ ভাগের পরিমাণ ইহাতে বুঝিতে হইবে ।

রাসায়নিক তালিকা দিবার সময় ছুঙ্কের, সদা ব্যবহৃত প্রকার কয়টির বিশেষ তালিকা দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করি ; এই ছুঙ্ক আমরা প্রধাণতঃ দুই প্রকারে ব্যবহার করিয়া থাকি (১) শিশুবয়সে মাতৃস্তন্য এবং পরবর্তী সময়ে (২) গাভীছুঙ্ক—সময় বিশেষে মাহিষ, গর্দভী এবং ছাগীছুঙ্কও আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি (ছুঙ্ক প্রস্তাবে ইহাদের বর্ণনা দেখ) ।

বিভিন্ন ছুঙ্কের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ।

	নারী	মাহিষ	গর্দভী	গাভী	ছাগী
কল.....	৮৮।৮২	৮৪.১০	৮২.৮	৮৭।৮	৮৫।৮৭
অভরণ পদার্থ.....	১১।১২	১৩.৫০	৮।২	১২।২২	১০।১৫
নাইট্রোজেনস্ পদার্থ ১।২		৪.৬০	৩.৫৬	৩.৫	৩.৮
(ফেসিনোজেন ও আলুমিনি)					
ছুঙ্ক শর্করা.....	৬	৪	৪.২৪	৫	৭.৬৩
চর্কি.....	৩৫।৪	৭.১০	১.৮৫	৩.৫	৫.৪৩৪
তাম্র (ash)	০.২	০.৫	০.৬	৬	৫

এই তালিকা দৃষ্টে আমরা পাইলাম যে, নারীদুধ অপেক্ষা গাভী-
দুধে অধিক পরিমাণে কেসিনোজেন Casinogen আছে
এবং সঘর জমাট (ছানা হইয়া) রাখিয়া যায় ; ইহার অর্থঃ
কেসিন্ নারীদুধের কেসিন হইতে, অপেক্ষাকৃত ভারী ও অত-
রল, কিন্তু শর্করার পরিমাণে গাভীদুধ নারীদুধ অপেক্ষা নিকট ।
মাহিবদুধে চর্কি এবং প্রোটিন্ পদার্থ অপেক্ষাকৃত অধিক
দৃষ্ট হয় । মাহিব কিংবা গো দুধে জল মিশ্রিত করিলে, তবে
নারী দুধের সহিত সম উপাদান বিশিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু
গন্ধতী ও ছালীদুধ স্বয়ংই নারীদুধের সহ প্রায় সমপ্রকৃতি-
সম্পন্ন । প্রথমটি সহজে সংগ্রহ করিতে পারা যায় না এবং
শেষোক্তটিতে কেমন এক প্রকার গন্ধ থাকার জন্ত, সকলে পান
করিতে চাহে না । এইজন্য উহার প্রায়ই শিশুর দৈনিক
আহার রূপে ব্যবহৃত হয় না । ছাগীদুধ শিশুকে সেবন করা-
ইতে হইলে ছাগী স্বগৃহে রাখিয়া পালন করা কর্তব্য ।

দশম পরিচ্ছেদ ।

কোষ্ঠবদ্ধতা ।

এই পুস্তকের প্রথম তিন অধ্যায়ে আমরা দেখাইয়া আসি-
রাছি যে, কেমন করিয়া খাদ্য অথবা পানীয় পদার্থ সুবগ্ধবর,

পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে একে একে উপনীত হইয়া পরিপাক-ক্রিয়া সাধন করিয়া থাকে । প্রকৃতির এই আরও কার্য্যে কেমন করিয়া আমরা বিশেষ সাহায্য করিতে পারি তাহা, এবং কোন্ কোন্ জিনিষ পরিত্যাগ করায়, প্রকৃতির নৈমিত্তিক পরিপাকন ক্রিয়া সহজসাধ্য হইয়া উঠে তাহাও, যথাস্থানে বিদিত করা হইয়াছে । অজীর্ণতা যে সংক্রামক ব্যাধি নহে, তাহা বোধ হয় সকলেই

অজীর্ণতা

অবগত আছেন এবং পূর্ববর্ণিত অধ্যায়

গুলি পাঠ করিলে, সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, চেষ্টা করিলে অর্থাৎ স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী যথাসাধ্য পালন করি-

লেই, উহার হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া অবশ্য ঘাইতে পারে ।

যদিই বা কোন প্রকার অনিয়ম বা অত্যাচারে অজীর্ণতা দেখা দেয়, তাহা হইলে প্রকৃতির কার্য্যে সহায়তা জ্ঞাত যে সমুদয় প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সাধনে যত্নবান হইলেই দেখিবে যে, অজীর্ণতা আর ক্লেশ দিতে পারিবে না । প্রকৃতির নির্দেশিতে পথে যাইয়া, তাহারই কার্য্যে যদি সহায়তা করা যায়, তাহা হইলে কেন সে আমাকে ক্লেশ দিবে ? তবে অবাধ্য হইলে আমাকে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে !

আমরা জ্ঞানবুদ্ধিতে যতই কেন গরীবান হই না, প্রকৃতিকে আমাদের বশে কখনই আনিতে সমর্থ হইব না ; উপরন্তু সেই চেষ্টা করিতে যাইয়াই, উপর্যুপরি পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, শেষে হাল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হই । এখন বিজ্ঞিতের উপর বিজ্ঞতা, (সকল জানেই বাহা করিয়া থাকে) আপন আধিপত্য বিস্তার

পূর্বক নির্ধ্যাতন করিতে আরম্ভ করে ! কিন্তু যদি বিজিত সহ-
জেই তাহার বশতা স্বীকার পূর্বক, তাহার নিয়োগ মত চলিতে
অঙ্গীকার করে, তাহা হইলে বিজেতা সখ্যস্থাপন করিয়া বিজি-
তের সহ Co operative মিলিয়া কার্য্য করিতে পারে এবং
তাহাতেই সমুদয় কার্য্য সুশৃঙ্খলায় চলিয়া যায় ; প্রকৃতির সহিত
তোমারও সেই সম্বন্ধ জানিবে । প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিবার
ফলে, অজীর্ণতারূপ নির্ধ্যাতনের ভোগ

তোমাকে সহিতেই হইবে এবং

প্রকৃতির সহিত

সম্বন্ধ

তোমার অবাধ্যতাও যত অধিক হইতে

ধাকিবে, অজীর্ণতাও তত্রে তত্রে ভীষণ হইতে ভীষণতরভাবে,

প্রকৃতি কর্তৃক চালিত হইয়াই, তোমাকে কষ্টপ্রদান করিবে ।

নির্ধ্যাতনের মাত্রা চরমে উঠিবার পূর্বেই, যদি তুমি নিজ
দৌর্বল্য অমুভব করিয়া, প্রকৃতির বশতা স্বীকার করিতে পার,
তাহা হইলে সহজেই তাহার সখ্যতা লাভ করিতে পারিবে ।

কিন্তু যদি তোমাকে স্ববশে আনিবার জন্ত, প্রকৃতিকে বিশেষ
বেগ পাইতে হয় তাহা হইলে, জেদের বশে, সবল যেমন দুর্বল-
কে যাতনা প্রদান করিয়াই আত্মতৃপ্তি অমুভব করিয়া থাকে,

— স্ববশে আসিয়াছে জানিয়াও যেমন সহজে তাহার সহিত সুব্যব-

হার করিতে চাহেনা—সেইরূপ প্রকৃতিও তোমার বশতাত্তাব
দেখিয়াও, যেন কতকটা বিক্রপের হাসি হাসিয়া, সহজে তাহার
নির্ধ্যাতন প্রণালী উঠাইয়া লইতে চাহে না ! এই জন্তই অজী-

র্ণতা (সজ্ঞ পাক সহ) একবার বিশেষ প্রকারে, তোমার শরীরে
অধিষ্ঠিত হইতে পারিলে, সুনিয়মে চলিলেও তখন আর ২।১

দিনেই তাহার গ্রাস হইতে তুমি নিস্তার পাইতে পার না !

সুতরাং পূৰ্ণ হইতেই সাবধান হইয়া চলা কর্তব্য !

বাহ্য জগতে অগ্নিতে যেমন ইন্ধন না যোগাইলে, উহা প্রজ্জ্বলিত রাখা যায় না, সেইরূপ দৈহিক অগ্নি বজায় রাখিতে হইলেই খাদ্য-পানীয় রূপ ইন্ধনের আবশ্যকতা দেখা যায়। প্রকৃতির এই খাদ্যপদার্থাদি পরিপাক ও প্রসর্পন absorption করিবার শক্তি বড়ই সূক্ষ্মশলময় দেখা যায় ; মুখগহ্বর হইতে অল্প পর্যাণ্ত পথে, ঐ খাদ্যপদার্থাদি বিচরণ করিবার সময়ে, যেমন উহার সারাংশ শরীরে গৃহীত হইয়া থাকে, তেমনি অবশিষ্টাংশ দেহ মধ্য হইতে মলরূপে প্রত্যাহ বাহিনিঃসৃত হইয়া

যায়। প্রকৃতির এই নিয়ম গৃহ্ণনায়, যদি কোন প্রকার বাধা

প্রাপ্ত হয় তাহা হইলেই, উহা বিরূত

কোষ্ঠবদ্ধতা

হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আজকালকার

সভ্যতানিবেশক নানা প্রকারের রন্ধনযুক্ত খাদ্যপদার্থাদি ভোজন, বাসগৃহ ও শয্যাগৃহের প্রায়শঃ বায়ু চলাচলের অভাব, পাঠ বা মজলিস্ গৃহেই বসিয়া অধিক সময় যাপন, অথবা কৰ্ম্মক্ষেত্রে অধিকক্ষণ যাবৎ এক অবস্থাতেই থাকা হেতু, সকলকে বাধা হইয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিতে হয়। সুতরাং প্রকৃতির সহজসাধ্য কার্য্যও, বাধা প্রাপ্তি জন্ত সুসাধিত হইতে না পারিয়া, প্রত্যাহ খাদ্য পদার্থের অবশিষ্ট অসাড় অংশ বাহিনিঃসৃত করাইতে পারে না—ফলে কোষ্ঠবদ্ধতা দাঁড়াইয়া যায়।

কোষ্ঠবদ্ধতা অর্থে এই বুঝা যায় যে, এক, দুই বা তিন দিবস অন্তর মলপদার্থ নিঃসৃত হওয়া ; কোন কোন স্ত্রীলো-

কের এই কোষ্ঠ পরিবৃত্ত হওয়া, সম্ভাহে একবার করিয়া হই-
তেও দৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ইহার পরিণাম কি? প্রকৃতির
নিয়ম নির্দেশিত সময়ের (যাহা প্রত্যাহ

একবার অথবা সময়ে এক দিনান্তর

কোষ্ঠবদ্ধতার পরিণাম

পর্যন্ত ধরিতে পারা যায়) অধিকক্ষণ যাবৎ অল্পমধ্যে মল-
পদার্থ সঞ্চিত থাকায়, তথায় পচিতে decomposed আরম্ভ
হয় ও তাহার ফলে এক বিষময় পদার্থের সৃষ্টি হইয়া পড়ে।

এই বিষময় পদার্থকে টোমেন ptomaines নামে অভিহিত
করা হয়। অস্থির কাণ্ড নীরব থাকায়, এই টোমেন বিষ
শরীরবিধানে প্রস্রাবিত হইয়া যায় এবং রক্তক্ষীণতা, অবসাদতা,
দুর্বলতা, শিরঃপীড়া, ও কেমন একপ্রকার সাধারণ অসুখভাব,
উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহা হইতেই প্রাধান্যঃ ক্ষুধা-
লোপ, অজীর্ণতা, মনোবিকার এবং অনিদ্রাভাব জন্মাইতে

দেখা যায়। অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, এই সামান্য
কোষ্ঠবদ্ধতা (যাহা পীড়া বা উপসর্গ বলিয়া গণ্য হইবে) হইতে
কখনই উক্ত প্রকারের অনিষ্টকর ফলস্রাজী উৎপন্ন হইতে পারে
না! কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কোষ্ঠবদ্ধতা উপেক্ষার জিনিষ নহে;

ইহাই উপরোক্ত পীড়াদি আনয়ন পক্ষে বিশেষ কার্যসাধক
জানিবে। উপরন্তু অল্পমধ্যে মল, আবদ্ধাবস্থায় অধিক সময়
থাকা হেতু, পচিয়া বিঘাট পদার্থ সকল উৎপন্ন করতঃ, পুষ্কোক্ত-
রূপ ক্ষতি করিয়াই নিশ্চিত থাকে না; ঐ কঠিন, সঞ্চিত
মলপদার্থ সকল নিজেরাই স্বাস্থ্যের বড়ই হানিজনক জানিবে।

সঞ্চিত এই কঠিন পদার্থগুলি অস্থির শিরার উপর চাপ প্রয়োগ

করিয়া, হৃৎপিণ্ড মধ্যে নিয়মিত রক্তের প্রত্যাবর্তনে .বাধা জন্মাইয়া দেয় এবং ঐ শিরা সমুদয় অপ্রাকৃতিক চাপ পাইয়া ক্ষীণ ও বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। পরিশেষে শিরার এই বিরুদ্ধ অংশ সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকায় tumour পরিণত হইয়া পড়ে। এই টিউমার গুলিকেই সাধারণতঃ

অর্নের ইংগিতি

অশ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

এই সমুদয় জটাই, যদি স্বাস্থ্যবান হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে অধিক দিবস জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে যাহাতে এই কোষ্ঠবদ্ধতারূপ, দৈনিক সাম্যভাবনাশকারী শত্রুর হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করা কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক সকলেরই একান্ত কর্তব্য।

আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, মুখগহ্বর, পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যে ভুক্তপদার্থ পরিপাক পাইয়া, তাহার সারাংশ শরীরে প্রসর্পন ও অবশিষ্ট অসাদৃ অংশ মলরূপে বহির্গমন করানই প্রকৃতির একটি নিত্যকার্য্য। ইহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হইলেই আনিতে হইবে যে, তাহা সুস্থতার চিহ্ন নহে। কোষ্ঠবদ্ধতা সম্বন্ধে আলোচনা সময়, রোগীর কোষ্ঠ পরিত্যাগের সাধারণ অভ্যাসের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কারণ বিভিন্ন

লোকে বিভিন্ন প্রকারে কোষ্ঠবদ্ধতার কথা বলিয়া থাকে। কেহবা দিবসের মধ্যে ২৩ বার কোষ্ঠত্যাগ করিয়াও বলিয়া থাকে যে, তাহার কোষ্ঠবদ্ধ হয় না, অথচ কেহ বা সপ্তাহে একবার বাইয়াই তাহাতে পর্যাপ্ত হইয়াছে মনে করে! সুতরাং ব্যক্তি বিশেষের অভ্যাসের উপর দৃষ্টি রাখিয়া, তবে উহার প্রতিকারের চেষ্টা

কোষ্ঠবদ্ধতার প্রতিকার চেষ্টা। ২০৩

করিতে হইবে। এই প্রতিকার চেষ্টা

কোষ্ঠবদ্ধতার প্রতি-

আবার হই প্রকারের করিতে পারা

কার চেষ্টা

যায়, ১ম প্রতিবেদক অর্থাৎ কোষ্ঠবদ্ধতা

বাহাতে জন্মাইতে না পারে এবং ২য় প্রতিবিধান অর্থাৎ উহা

বিকাশ পাইলে, কেমন করিয়া বিদূরণ করিতে হয়, তাহার চেষ্টা

করা। এখানে আমরা প্রথম প্রকারের উপরই বিশেষ লক্ষ্য

রাখিব, কারণ রোগের চিকিৎসা করা অপেক্ষা, রোগ বাহাতে

না জন্মাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাই সমীচীন বলিয়া

বোধ করি। পাশ্চাত্য প্রদেশে ইহার জন্ম, অনেকে মধ্যে

মধ্যে সুবিখ্যাত করণার জলপানের জন্ম তত্তৎ স্থানে যাইয়া

ধাকেন—তথাকার করণার জল কয়েক দিবস পান করি-

লেই, সহজে বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে থাকে দেখা যায়।

আজকাল বাজারে ঐ সমুদয় করণার জল (অকৃত্রিম ও কৃত্রিম)

ভাবে সদাই বিক্রয় হইতেছে; প্রায়ই পরিষ্কার জলের সহিত

বাই কার্বনেট অফ সোডা bicarbonate of Soda অথবা

Carbonate of magnesia কার্বনেট অফ ম্যাগনেশিয়া

মিশ্রণে কৃত্রিম করণার জল প্রস্তুতীত হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়ে একস্থানে আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি যে

প্রাতে উঠিয়াই, এই প্রকারের করণার, অকৃত্রিম অথবা কৃত্রিম

জল, পূর্ণ এক গ্লাস পান অভ্যাস করিলে পাকশয়ের পাত্র

পরিষ্কৃত হইয়া, পাকস্থলীকে নিজকার্য সাধনে সম্যক উপযুক্ত

করিয়া দেয় এবং তাহা হইতেই অজীর্ণতা বিদূরীত হইয়া যায়।

(১) শব্দ্য হইতে উঠিয়াই যদি এইরূপে পূর্ণ এক গ্লাস জল পান

করা যায়, তাহা হইলে কোষ্ঠবদ্ধতাও দূর হইতে পারে। অল্পের মধ্যে এই জল খাইয়া, মলকে অতিরিক্ত কঠিনতা পাইতে বাধা দেয় এবং অন্তকে সঙ্কচিত করিবার উদ্দেশে উত্তেজিত করিয়া, উহার আধারস্থ মল বাহির করিয়া দিবার সহায়তা করে। কোষ্ঠ-বদ্ধতা যদি সামান্য ভাবের হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ শীতল জল, এক গ্লাস প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়াই পান করিলে, অনেক সময় বিশেষ ফললাভ হইতে দেখা গিয়াছে; কিন্তু ইহা একটু স্থায়ী ও অপেক্ষাকৃত কঠিন তাবের নিশ্চিন্ত পথ। হইলে, শীতল জল না খাইয়া, গরম জলের সহিত একটু লেবুর রস দিয়া খাইলেই বিশেষ ফল পাওয়া যায়। (২) মুকবায়ুতে পর্যাপ্তরূপে ব্যায়াম করা (৩) প্রাতে শীতল জলে স্নান, (৪) পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল পদার্থ ভোজন করিয়া, অল্পের মধ্যস্থ মলকে ভিজাইয়া moist রাখা প্রভৃতি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখাও বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। কিন্তু শৈশোক প্রকার বাবস্থা, কেবল-মাত্র অতি বয়স্রাবী ব্যক্তিগণের পক্ষেই প্রশস্ত, সাধা-রণের পক্ষে নহে জানিবে।

প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে, একবার করিয়া পাখানায় খাইয়া কোষ্ঠ পরিত্যাগের অভ্যাস বড়ই সুন্দর নিয়ম এবং কোষ্ঠ-বদ্ধতা দূরীকরণের একটি প্রধান নিয়মিত সময়ে কোষ্ঠত্যাগ উপায়। দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৫ মিনিট যাবৎ সময়, ইহার জন্য নিদিষ্ট করিয়া রাখা অতি-শয় কর্তব্য এবং তাহা প্রত্যাষে নিদ্রা হইতে উঠিবার পরই

কোষ্ঠভ্যাগের সময় নির্দিষ্ট রাখা । ২০৫

রাখিতে পারিলে ভাল হয়। শরীরের অসাড় বস নিঃসরণ করিবার জন্ত, নির্দিষ্ট এই সামান্য সময় যাহাতে কোন প্রকার কার্যগতিকে বাধা প্রাপ্ত হইতে না পারে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নিত্য যদিও সেই সময়ে কোষ্ঠ পরি-
কার না হয়, তথাপি নিয়ম করিয়া তাহার জন্ত নির্দিষ্ট সেই সময়টি ঐ কার্যে নিয়োজিত নিশ্চয়ই রাখিতে হইবে ;
কয়েক দিবস উপর্যাপরি এই ভাবে অভ্যাস করিলেই দেখিবে
যে, উহা বেশ অভ্যস্ত হইয়া আসিবে এবং ঠিক সেই সময়ে
স্বভাবতঃ কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে থাকিবে। কোষ্ঠভ্যাগের
সময় বেগ দেওয়া সম্পূর্ণ অসুচিত,

অথবা কোষ্ঠ পরিস্কৃত হইতেছে না
বলিয়া, অধিক সময় যাবৎ পায়খানায়

কোষ্ঠভ্যাগে বেগ দেওয়া
অসুচিত

বসিয়া থাকা অভ্যাস বড়ই দূশনীয়। উপরে বর্ণিত
উপদেশ পালন করা হইলে, কয়েক দিনের মধ্যেই দেখিতে
পাইব, (যদি বেগ দেওয়া বা অধিক সময় পায়খানায়
বসিয়া থাকা অভ্যাস থাকে) যে উহার আর আবশ্যকই
পাকিবে না।

পায়খানায় বসিয়া অতিরিক্ত বেগ দিলে, ঐ বেগ
দেহের অন্তান্ত যন্ত্র এবং রক্তাধারের উপর পতিত হইয়া,
নানা প্রকার বিষময় ফল উৎপন্ন করিতে পারে।
এই প্রকারে বেগ দেওয়ার, অনেক সময় বৃদ্ধগণের মস্তিষ্কের
শিরা ছিন্ন হইয়া এপোপ্লেক্সিস (apoplexy) বা সংশ্লেষ রোগে
মুহূর্ত হইতে দেখা গিয়াছে ; অন্তর্ঘূর্ণি (hernia) এবং অন্যান্য

ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে জানিবে। সুতরাং কোষ্ঠ-
পরিত্যাগের সময় বেগ না দেওয়া, আবালগৃহবনিতা সক-
লেরই কর্তব্য। অধিকক্ষণ বাবৎ বসিয়া কোষ্ঠ পরিত্যাগে,
পূৰ্বোক্তরূপ প্রাণের হানি বড় দেখা যায় না, কিন্তু তাহাতে
অৰ্শ এবং কোষ্ঠবদ্ধতাকে সম্পূর্ণরূপে আনয়ন করিয়া, বন্ধমূল
করিয়া দেয় বলিয়া এই বদভ্যাসও পন্থিত্যাক্য জানিবে।

কোষ্ঠবদ্ধতাগ্রস্ত রোগীর পক্ষে, আহার ও পানীয় সম্বন্ধে
কোন প্রকার বাচবিচার করা আবশ্যক কিনা তাহাই এখন
দেখা যাউক। একটু পূৰ্বেই একস্থানে আমরা বলিয়া আসিয়াছি
যে, কোষ্ঠবদ্ধতা বিদূরণ জন্য ভোজ্য ও পেষ বস্তুর মধ্যে তরল
পদার্থ পর্যাপ্তরূপে থাকা দরকার ; কিন্তু আবার অজীর্ণতা প্রস্তাব
সমালোচনা কালে বলা হইয়াছে, আহারের সময় যেন অধিক
তরল জিনিষ, যেমন জল, চা, মগ্ন ইত্যাদি, খাওয়া না হয়,
কারণ তাহাতে জীর্ণক্রিয়ায় বাধা জন্মাইতে পারে। এখানে
জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে যে, একবার তরল পদার্থ পর্যাপ্তরূপে
খাওয়া কর্তব্য বলা হইতেছে, আবার অন্তস্থলে তাহা নিষেধ
করা হইতেছে, তবে কোন্ পথ ধরিয়া চলা কর্তব্য ? আহার
পক্ষে পানীয় সেবন অতি কর্তব্য বলিয়া মনে হইবে,
তাহার পক্ষে ঠিক অতরল পদার্থ আহারের সময় উহা না
খাইয়া, একটু (১৫-২০ মিনিট) পূৰ্বে অথবা পরে পান
করাই ব্যবস্থা। (৪৩-৪৪ পাতায়
বর্ণনা দেখ)। এখানে আহার
বলিতে. অতরল পদার্থ অর্থাৎ চুই

কোষ্ঠবদ্ধতার ধূমপান ও
খাদ্য-পানীয় বিচার

কোষ্ঠবদ্ধতায় খাদ্য পানীয় বিচার । ২০৭

বেলায় আমাদিগের প্রধান আহাৰ্য্য, ভাতই অথবা রুটি
বুঝাইতেছে জানিতে হইবে। প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠি-
য়াই, তামাকুসেবনে অনেকের কোষ্ঠভ্যাগের চেষ্টা হইতে
শুনা যায়; যদি তামাকুসেবনে তাহার কোনই অপকার
হইতে দেখা না যায়, তবে এ প্রথা দুৰ্ব্বনীয় বলিয়া বর্জন
করিবার আবশ্যকতা নাই। অতিরিক্ত তামাকুসেবনেই অপ-
কার করিয়া থাকে, আবশ্যক স্থলে, নিয়মিত সময়ে উহার
পরিমিত ব্যবহারে কোনই দোষ দেখা যায় না। তাহা

বলিয়া যাহার তামাকুসেবন অভ্যাস নাই, তাহাকে কোষ্ঠ-
বদ্ধতা বিদূরণ জন্ত, তামাকুসেবন অভ্যাস করিতে হইবে,
একথা বলা হইতেছে না জানিবেন।

সমুদয় প্রকার ফলমূলাদি (টাটকা হইলেই ভাল
হয়)—আপেল, নাস্পাতি, পেয়ারা, আতা, আঙ্গুর, কমলা-
লেবু, মেওয়া ফলাদি, ডুমুর জাতীয় বিদেশী ফলাদি), ভোজন
করা কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীকরণের সহজ উপায়; জড়ান আচা-
রাদি (বিভিন্ন ফল সমুদয়ের), ধোঁসা, বিচি ইত্যাদি সম-
ন্বিত থাকায়, অল্পের উত্তেজনা উৎপাদন করিয়া, কোষ্ঠ পরি-
ষ্কারে সহায়তা করিয়া থাকে। এই আচার ইত্যাদি জড়ান
পদার্থ সকল, অজীর্ণরোগীর পক্ষে সম্পূর্ণ ব্যবহার নিষিদ্ধ।

তরী• তরকারী, শাকসব্জী সমুদয়ও কোষ্ঠবদ্ধতানাশক
জানিবে; এই কারণে শসা, সাঁক আলু, কপি, আলু, ইত্যাদি
পর্যাপ্তভাবে সেবন করা প্রয়োজন। প্রাতে রুটির সহিত

গুড় খাইতে দিলে বালকবালিকাদিগের কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিতে দেখা গিয়াছে ।

গাংসাদি না খাইলেই ভাল হয়, অথবা যদিই খাইতে হয়, তবে কদাচিৎ এবং স্বল্পমাত্রায় ; অধিক লবণ সংযুক্ত দ্রব্যাদি আহার না করা (পাশ্চাত্য

দেশেই ইহার অধিক প্রচলন দেখা যায়) ; ভোজ্যবস্তু পর্যাাপ্ত চর্কণ করা - দাঁত না থাকিলে উহা বেশ কুচি কুচি করিয়া যেন থেংলাইয়া রন্ধন করা হয়, তাহা হইলেই আর চর্কণের বিশেষ দরকার হইবে না - উগ্র চা, এবং মাদকদ্রব্যাদি ব্যবহার না করা, এবং আহার শেষ হওয়ার পরই ফলভোজন করা সকল কোষ্ঠবদ্ধ রোগী-

রই কর্তব্য । রাত্রিতে শয়নের সময় এক গ্লাস গরম অথবা শীতল জল পান করিয়া শয়নেও, পরদিন প্রাতে অনেকের কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে দেখা গিয়াছে । এখানে একটি বিষয় আমরা সাবধান করিয়া দিতে ইচ্ছা করি ; কোষ্ঠবদ্ধতা বিদূরণের জন্ত যে সমুদয় নিয়ম লেখা হইল, তাহা প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে পালন করা কর্তব্য নহে, কারণ তখন উহা তোমার স্বভাবের মধ্যেই গণ্য হইয়া পড়িবে সুতরাং উহার উপকারীতা আর বৃদ্ধিতে পারিবে না । তবে

আহার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থার কথা বলা হইল, তাহা প্রতি-পালনে কোনই ক্ষতির সম্ভাবনা নাই । আমাদের দেশে তরী তরকারী বা ফলমূলের অভাব নাই, ইচ্ছা করিলে নিত্য নুতন দ্রব্য ভোজন করা যাইতে পারে, কাজেই এক্ষণেই হিসাবেও উহা স্বভাবে পরিণত হইবার ভয় থাকে না ।

বায়াম শরীরের পক্ষে আবশ্যকীয় । ২০৯

বসিয়া বসিয়া অধিক সময় নিশ্চল অবস্থায় জীবন-যাপন করা কোষ্ঠবদ্ধতার একটি বিশেষ কারণ; উপযুক্তরূপে নিত্য বায়াম করা, শুদ্ধ যে কোষ্ঠবদ্ধতা বিদূরণ অথবা তাহার প্রতিষেধকরূপেই আবশ্যক তাহা নহে, সমৃদ্ধ শরীরবিধানই ইহাতে সূক্ষ্ম এবং শাস্ত্রিময় থাকে জানিবে। খাদ্য এবং পানীয় যেমন শরীরের পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয়, তেমনি বায়াম করাও শরীর সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জানিয়া, শরীরে অতিরিক্ত মেদ ও মাংস সঞ্চয়ের পূর্বেই, বায়ামে অভ্যস্ত হওয়া কর্তব্য—চিকিৎসার পূর্বে রোগের প্রতিবিধানে যত্নবান হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য জানিবে। যদি তোমার শরীর পূর্ন হইতেই মোটা পাকে,

বায়াম করা

তাহা হইলে তোমার মাংসপেশী সকল এবং শারীরিক বহাদি শ্রমসাধ্য বায়াম সম্পাদনে সমর্থ হইবে না; পূর্ন হইতে সাবধানতা না লইলে, মেদ সঞ্চিত শরীর, অনভ্যস্ত অতিরিক্ত শ্রমজন্য সহজেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক কাহারও পক্ষে, মোটা, থলথলে শরীরী হওয়া কর্তব্য নহে, হাড়ে মাংস জড়িত আঁটা শরীরই স্বস্থতা এবং সবলের লক্ষণ জানিবে।

সুতরাং স্বাস্থ্যসুখ বজায় রাখা, পরিপাটন শক্তি সমৃদ্ধীকৃত করা, জ্বংপিণ্ডের কার্য সম্যকরূপে সাধিত হইতে দেওয়া এবং সর্বোপরি অস্ত্রের নিয়মিত কার্য সম্পাদনের পক্ষে, সন্ধ্যায় ঘটাইয়া দিবার জন্য উপযুক্ত রূপ বায়াম দ্বারা, আমাদিগের মাংসপেশী সকল সবল এবং কর্তব্যনিষ্ঠ করিয়া

রাখা একান্ত কর্তব্য। শরীরস্থ পেশী সকলকে সদা কার্যালিঙ্গ রাখিতে পারিলেই, উহা বিকশিত এবং সবল হইয়া, যে কার্য সাধনের জন্ত সজ্জিত হইয়াছে, তাহা সম্পন্ন করিতে পারে, নতুবা নিশ্চেষ্ট থাকিলেই পেশী সকল পাতলা হইয়া শুকাইয়া যায় - এই অবস্থাকে atrophy শুষ্কতাব বলে—এবং অনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনে ও সক্ষম হয় না। কুৎপিণ্ড, পাকস্থলী ও অন্ত্রপ্রদেশও কতকভাবে, পেশীসমষ্টি বলিয়াই ধরা হইয়া থাকে, সুতরাং উহাদের স্বকার্যে নিবিষ্ট রাখার জন্ত ব্যায়াম একান্ত প্রয়োজন।

এখন কথা হইতেছে যে, এই ব্যায়াম কি ভাবে করা যাইতে পারে। শারীরিক উৎকর্ষতা সাধনের জন্ত, বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক ব্যায়াম শিক্ষক স্তাণ্ডার্ড প্রভৃতির অনুমোদিত প্রণালী আমরা সর্বোৎকৃষ্ট মনে করি; কারণ ইহার বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়, শরীরস্থ যাবতীয় পেশীরই রীতিমত চালনা হইয়া থাকে। শুষ্কতার বিশিষ্ট দ্রব্য লইয়া ব্যায়াম করিলেই যে, সত্তর দেহ সবল হইয়া উঠে তাহা

সাধার প্রথা

নহে, কিন্তু যে সে সামান্ত দ্রব্য হাতে

লইয়া (যে পেশী সমষ্টির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে) পূর্ণ-শক্তিতে তাহার পরিচালনা করিতে পারিলেই, সহজে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে দেখিবে। এই শরীর পরিচালনার সময়, তোমার মন বাহ্যতে একমাত্র উহাতেই নিবিষ্ট থাকে, তাহা করা একান্ত আবশ্যক জানিবে—চিন্তনবশ না করিতে পারিলে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। স্তাণ্ডার্ড প্রথা এবিধেও

বিশেষ অমুকুল দেখা গিয়াছে - স্প্রিং ডম্বেল (Spring dumbel) ব্যবহার করা এবং সমুদ্রে একখানি বড় আয়না রাখিয়া শরীর পরিচালনা করিতে উপদেশ দেওয়া, শুদ্ধমাত্র এক-চিহ্নতঃ করাইবার জন্তই জানিবে। হাতে কোন দ্রব্য না রাখিয়াও, শুদ্ধমাত্র পূর্ণশক্তির সহিত বিভিন্ন প্রকার শরীর পরিচালনায়ও ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে; কিন্তু কি প্রকারের পরিচালনায়, কোন্ কোন্ পেশী সম্যক পরিচালিত হইয়া উৎকর্ষলাভ করিতে পারে, তাহার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই জন্ত বিশিষ্ট ব্যায়াম শিক্ষকের অনুমোদিত প্রথা অনুযায়ীই উহা করা আবশ্যক।

পাদভ্রমণ অর্থাৎ পদব্রজে বেড়াইয়া বেড়ান, অতি সহজ উপায়ের শ্রেষ্ঠতম ব্যায়াম বলিয়াই সকলে অভিযত দিয়া থাকেন। (এ পাদ ভ্রমণ
সম্বন্ধে মন্তব্য ২০ পাতায় দেখ)

যে কোন প্রকারের ব্যায়ামই করা হউক না, যদি নিত্য নিয়মিত অভ্যাস রাখা না হয়, তাহা হইলে সবই

বৃথা। ঋণ্ণেয়ালি ভাবে ২১০ দিনের ব্যায়ামের পরেই, যদি শরীর একেবারে বলিষ্ঠ দেখিতে ইচ্ছা কর এবং তাহা না দেখিতে পাইলেই, তগ্নোৎসাহ হইয়া সকল ব্যায়ামই অফলদায়ক মনে কর, তাহা হইলে হইবে না। রামমূর্তী, স্তাণ্ডা প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যায়াম শিক্ষকের জীবনী আলোচনায় জানিতে পারা যায় যে, শৈশবে সকলেই নিয়তি-শয় দুর্বল ও পীড়াকাতর ছিলেন, কিন্তু একমাত্র অধ্যবসায় এবং

নিয়মিত অভ্যাসের ফলেই, এখন জগতে নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম
 প্রসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন !
 সকলকেই যে উহাদের জায় বীর হইতে হইবে তাহা
 নহে, তবে শরীররক্ষার জন্য স্টেট ব্যায়াম প্রয়োজন, তাহা
 অনগ্রই করিতে হইবে, নহূন। শারীরিক সুস্থতালভ করিতে

 পারা দুর্ঘট জানিবে ।

এই কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীকরণ জন্য, অমোক্ষ জোলাপ ব্যবহার
 করিয়া থাকেন। কোষ্ঠবদ্ধতা নিজে একটি রোগবিশেষ
 itself a Disease) নহে, কিন্তু শরীরবিধানের কোন
 কোন যত্নাদির বিশৃঙ্খল অবস্থাতেই, তাহার আনুসঙ্গিক
 লক্ষণরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে মাত্র। এই সামান্য বিষয়
 ভালরূপে অবগত না থাকাতেই সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা-
 কেই রোগ মনে করিয়া, উহা দূরীকরণের জন্য জোলা-
 পাদি ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ফলস্বরূপ তখন-
 কার মত কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যায় বটে, কিন্তু উহাই
 বারে বারে ব্যবহৃত হওয়ায়, পরিণামে কোষ্ঠবদ্ধতা শরীর-

 বিধানে বিধিবদ্ধ করিয়া দেয় এবং শুধু তাহাতেই নিরস্ত না
 হইয়া, ভবিষ্যতে কঠিনতর রোগ উৎপত্তির বীজ নিহিত

করিয়া রাখে। অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, সুস্থাবস্থায়
 বা অসুস্থ অবস্থাতেই হউক, জোলাপ লইয়া মধ্যে মধ্যে শরী-
 রস্থ ময়লা সকল, অস্ত্র হইতে বহির্গত করিয়া দেওয়া স্বাস্থ্যের
 পক্ষে একান্ত আবশ্যিক ; এই যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রমবূলক এবং

জোলাপে ব্যবহার্য পদার্থ ই বিষ ! ২১৩

ভিত্তিহীন বলিয়া জানিবে। এলো-

প্যাথিক চিকিৎসকেরা এই যুক্তি

মতই কার্য করিয়া থাকেন, কারণ

জোলাপের আংশিকতাঃ

তুল বিধান

ভাঁহাদের শাস্ত্রে রক্তমোক্ষণ, বিরেচক এবং বমনকারক ঔষধ প্রদান ও অজ্ঞান করিয়া যাতনার অমুত্তবশক্তি লোপ করান ভিন্ন অন্য ঔষধ নাই ! জোলাপের জন্ম যে সমুদয় ভেষজপদার্থ প্রদত্ত হইয়া থাকে (ক্যাষ্টার অয়েল, ক্যালমেণ্ড ম্যাগনেসিয়া, ক্লবার্ক, এলোজ, পডোফাইলম্, অক্সাল সল্ট (Salt) অর্থাৎ লাবনিক পদার্থ ইত্যাদি) তাহার সমুদয়ই অল্পাধিক পরিমাণে বিষের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। তীব্র বিষ সামান্য পরিমাণে খাইলেও, বমন ও বিরেচন উৎপাদন করে, অথবা পাকস্থলীর অনিষ্ট সাধন করে জানিবে ; স্বল্পতর তীব্র বিষপদার্থ সকলই বিরেচক ঔষধ বলিয়া সাধা-
রণতঃ গণ্য হয়।

এইরূপ জোলাপ লওয়া অভ্যাস হইতেই ওলাউঠা রোগের উৎপত্তি হইতে দেখা গিয়াছে। উপর্যুপরি জোলাপ লইতে থাকিলেই, সকল সময় উহা আশাপ্রদ ফলদায়ক হয় না, কারণ তখন কোষ্ঠ উন্মোচনকারী পদার্থ সকল শরীরের নিত্য স্বভাবজ স্রবোর মধ্যেই পরিগণিত হইয়া পড়ে। সুতরাং অভ্যাস মত জোলাপ প্রয়োগেও, যখন কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হইল না দেখা গেল, তখনই উগ্রতর বস্তুর সাহায্যে উহা করাইবার চেষ্টা হইয়া থাকে। ক্রিষ্ট কলে কি দেখা যায় ! উপর্যুপরি কষাঘাতে নিরতিশয় উত্তেজিত হইয়া, অস্ত্রের কার্য এতই সতেজে হইতে

ধাকে যে, উহা আবার অন্তের সাহায্যে বন্ধ করা প্রয়োজন
হইয়া উঠে। অন্তের এই অতিরিক্ত

উত্তেজনাবস্থা হইতেই কঠিন ওলা-

জোলাপের পরিণাম

উঠা পীড়া উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। অতএব অযথা জোলাপ
লইয়া, মুহু শরীরকে ব্যস্ত করিবার প্রয়োজন দেখি না ; তবে
যদি উহার একান্তই আবশ্যকতা বোধ কর, তাহা হইলে গ্লিসারিন
Glycerine সহ জল মিশ্রিত করিয়া, তাহার পিচ্কারী অথবা
কেবল মাত্র ঈষদুষ্ণ জল কিংবা সাবানগোলা জল দিয়া পিচ্কারী
করাইয়া দিতে পার। কিন্তু এই ব্যবস্থাও যেন ঘন ঘন করা না

হয়। মুহু বিরেচক স্বরূপ রাজিতে এক পোয়া দুধের সহিত
সামান্য কিস্মিস্ অথবা মনকা এবং শুষ্ক গোলাপের পাতা
কয়েকটা সিদ্ধ করিয়া খাইলেই, পর দিবস প্রাতে সুন্দর ভাবে
কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হইতে দেখা গিয়াছে।

উগ্র ঔষধাদি সেবনে অন্তকে অতিশয় উত্তেজিত না করিয়া,
আমাদের ব্যবস্থা মত কোষ্ঠবদ্ধতার প্রতিষেধক অনুষ্ঠান
ওলি এবং প্রকৃতই উহা উপস্থিত হইয়া ক্লেশদায়ক হইতেছে
বুঝিতে পারিলে “এনিমা” অর্থাৎ গ্লিসারীনাতির সামান্য পিচ্-
কারী ব্যবহার করিলে, প্রায়স্থলেই সুফল উৎপন্ন হইতে
দেখিবে। মাসে ২৩ বার জোলাপ ব্যবহার করা অভ্যাস-
যুক্ত অনেকে, আমাদের এই ব্যবস্থামত চালায়া ঐ কু অভ্যাস
একেবারে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এখন আর
কোষ্ঠবদ্ধতার ভয়ও তাঁহারা কোন ক্লেশ উপলব্ধি করেন না
জানিতে পারিয়াছি।

একাদশ পরিচ্ছেদ :

খাত্তের রাসায়নিক তথ্য বিচার ।

প্রাণীমাত্রেরই শরীরের বিভিন্ন টিসু সমৃদ্ধ, কৃত্রিম যন্ত্রের অল্পপ্রত্যয়ের জ্ঞান, সদাই কয়প্রবণ থাকিতে দেখা যায়। মাংস-পেশীয় সংকলনক্রিয়াদি সম্পাদন এবং দৈহিক তাপ জননের জন্য, সর্বদাই একটি শক্তি শরীর মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে দেখিবে। এই ছুই কার্যের জন্য প্রতিদিন $১৫০,০০০ + ৮০০,০০০ = ১,০০০,০০০$ কিলোগ্রাম [১ কিলোগ্রাম $= ১০০০$ গ্রাম, ১ গ্রাম $= ১৫০৪৩$ গ্রেণ] মিটার শক্তি ব্যয়িত হইতেছে। সুতরাং কার্যনিরত পূর্ণদেহীর শরীরস্থ টিসু সমৃদ্ধ যে, ইহাতে বিশেষ রূপে কয় এবং ক্রান্ত হইয়া পড়ে ইহা সহজেই বুঝা যায়। এই এই জন্তই মস্তিষ্ককোষ, মাংসুলার এপিথেলিয়াম ও রক্তকণিকা সকল, সময়ে সময়ে বদলাইয়া দেওয়া এবং নিয়মিত কার্য সম্পাদন জন্ত, সদা নূতন উপাদান সংগ্রহ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সুতরাং জীবের দেহ সর্বদাই তাহার পরিপোষণ ও বর্জন জন্ত নূতন নূতন পদার্থের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া থাকে জানিবে। টিসু সমৃদ্ধের কয় প্রাপ্ত অবশিষ্ট অংশ এবং শরীরবিধানে সদা আহারের আবশ্যকতা যে আহুতি (Combustion) চলিতে

থাকে, তাহার পরিণাম স্বরূপ উৎপন্ন দ্রব্য আমাদের দুস্ফুস, চৰ্ম এবং কিড্‌নী দ্বারা শরীরাত্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া আইসে। মোটামুটি হিসাবে একজন পূর্ণ বয়স্কের শরীরাত্যন্তর হইতে ২৪ ঘণ্টায় নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি নির্গত হইয়া থাকে, যথা :—

নাইট্রোজেন	২০ গ্রাম
কার্বন	২৮০ ”
লাবণিক পদার্থ	২৪ ”
জল	২০০০ ”

উপরি বর্ণিত এই ক্ষতি পরিপোষণ জন্তই, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হয়; এই খাদ্যপদার্থ শরীরাত্যন্তরে যাইয়া, উত্তাপজনন, ক্ষয়-লোপ এবং (যাহারা পূর্ণ দেহ প্রাপ্ত হয় নাই তাহাদের) পরিবর্দ্ধনের সাহায্য করিয়া থাকে ; সুতরাং ইহার বিশেষরূপ ব্যবহারিক প্রণালী স্বাভাবিক পরিমাণে সকলেরই জানা থাকা আবশ্যিক। আবার খাদ্যপদার্থ সকলেই কিছু এক ধর্মবিশিষ্ট নহে, কোন খাদ্যপদার্থ দ্বারা তাপজনন ক্রিয়া ভালরূপে সাধিত হয়, কাহারও দ্বারা টিস্যুর ক্ষয় পরিপূরণ হইয়া থাকে, কাহারও দ্বারা বা শরীরস্থ বর্দ্ধনক্রিয়া (Growth) সংসাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং সমুদয় খাদ্যপদার্থকে প্রকৃষ্টরূপে পরীক্ষা করিয়া, আমাদের শরীরপোষণ ও ক্ষয় নিবারণ এবং পরিবর্দ্ধনের জন্ত, যে যে প্রকার খাদ্যপদার্থ বিশেষ আবশ্যিক, তাহার একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কিন্তু এই বিশ্লেষণ ক্রিয়া কি প্রকারে সংসাধিত হইতে পারে? কোন ব্যক্তি

বিশেষের রুচি বা মতানুযায়ী কি ইহা
করা যাইতে পারে? না কখনই খাদ্য পদার্থের নিরূপণ
নহে। “জীবন ধারণ জন্ত আমাদের যে প্রকার খাদ্যপদার্থের
প্রয়োজন, তাহা আমরা কেমন করিয়া, প্রথমে জানিতে পারিব?
প্রকৃতি বা অজ্ঞ কেহ আমাদেরকে উহা ত বলিয়া দেয় নাই!
কাজেই যেমন হয় একটা সাব্যস্ত করিয়া লইতে হইবে”।
একথা বুদ্ধিমানের উপযুক্ত নহে! আমরা একটু অস্থ-
খাবন করিয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারি যে, প্রকৃতিই
স্পষ্টতঃ উহা আমাদেরকে দেখাইয়া দিতেছে, সুতরাং আন্দাজী
বা যেমন তেমন নিয়মের বশবর্তী হইয়া, এই অবশ্য প্রয়ো-
জনীয় খাদ্যপদার্থ নিরূপণ না করিয়া, প্রকৃতি নির্দেশিত পথেই
আমাদের চলা কর্তব্য।

জননী জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, অসহায় শিশু যখন
অজ্ঞ কোন প্রকার খাদ্যপদার্থ ভোজনে সম্পূর্ণ অসমর্থ থাকে, তখন
তাহার শরীর রক্ষা ও পোষণের জন্ত দেখা যায় যে, প্রকৃতি
মাতৃগুণে, তাহার জন্মবার পূর্বে হইতেই, হৃৎকের সঞ্চার করিয়া
রাখিয়াছেন! ইহা দেখিয়া মনে হয় না কি যে, ঐ নবজাত
শিশুর শরীর সম্পূর্ণের জন্ত যে সকল বিভিন্নজাতীয় পদার্থ
প্রয়োজনে আসিতে পারে, তাহার সমুদয়ই এই হৃৎকে যথা-
পরমাণে সঞ্চার আছে? সুতরাং বেশ দেখা যাইতেছে যে,

আমরা হৃৎকেই একমাত্র পূর্ণ খাদ্য রূপে গ্রহণ করিতে পারি,
কিন্তু ইহা একমাত্র শিশুর ক্ষেত্রেই সূত্রান্ত। শিশু ব্যতীত
অপরের পক্ষে কেবল হৃৎকেরই উপর
নির্ভর করা চলে না, কারণ তাহা হইলে

অত্যধিক পরিমাণে দুগ্ধ সেবন করিতে হয়। সম্ভবমত কাষ্য-
নিরত পূর্ণবয়স্ক লোকের, যদি শুদ্ধ দুগ্ধপানে জীবন কাটাইতে হয়,
তাহা হইলে প্রত্যহ ৮ পাইন্ট (প্রায় ৫ সের) দুগ্ধপানের আবশ্যক
হয়; কিন্তু উহার পরিমাণ অধিক সেবিত হইলে জল, ও অন্ত
২১টি উপাদান প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে শরীরে গ্রহণ করা
হইয়া যায়; সুতরাং পরিণামে ইহাতে পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে পুরা
স্বাস্থ্যলাভে ব্যাঘাত ঘটয়া পড়ে। আরও দেখা গিয়াছে যে,
একজাতীয় খাদ্য প্রত্যহ ব্যবহারে, আহারে বিতৃষ্ণা ও স্বাস্থ্য-
হানিও হইবার সম্ভাবনা দাঁড়াইয়া যায়। শিশুর পক্ষে কিন্তু এই
দুগ্ধই একমাত্র আহার ; দস্তাদানের পূর্বে তাহাকে অন্য কোন
প্রকার খাদ্য দেওয়া কর্তব্য নহে, কারণ লালারস এবং ক্রোমগ্রস
তখন পর্য্যন্ত তাহার শরীরে নির্গত হইতে আরম্ভ হয় না।
দুগ্ধ অবশ্য সহজে পরিপাক হইয়া যায় এবং অসুস্থ অবস্থায়
অধিক পরিমাণেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এখানে দেখিতেছি বিষম এক গোলযোগ উপস্থিত হইল ;
প্রকৃতি নির্দেশিত পথে যাইয়া, আমরা জানিতে পারিলাম যে,
দুগ্ধই একমাত্র পূর্ণ খাদ্য—কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, শুদ্ধ উহা
শিশুরই উপযোগী, পূর্ণ বয়স্কের নহে! তবে উপায়? অবশ্য
ইতালি হইবার আবশ্যক নাই, একটু চিন্তা করিলেই ইহার
মীমাংসা হইতে পারে।

আমরা অস্বগত হইয়াছি যে, শরীরবর্দ্ধন ও পোষণের
উপযোগী সকল উপাদানই দুগ্ধে যথোপযুক্ত ভাবে নিহিত
আছে; যদি শুদ্ধ একমাত্র দুগ্ধ গ্রহণে পরিণত বয়স্কের শরীর
পোষণ না হয়, তাহা হইলে এমন কোন খাদ্য পদার্থ তাহাদিগের

গ্রহণ করিতে হইবে যে, তাহার মধ্যে দুধের সমুদয় উপাদানই
বিদ্যমান থাকে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ

analyse করিয়া দেখা গিয়াছে যে

দুধের বিশ্লেষণ

দুধে, ছানা, মাখন, চিনি, কতকগুলি লবণ পদার্থ এবং জল আছে,
(রাসায়নিক তালিকা ১২৩ পাতা দেখ)। দুধ মছন করিলে মাখন
উৎপন্ন হয় ; ছানা ও মাখন তুলিয়া লইলে, উহাতে যে
জনীয়াংশ পতিত থাকে, তাহাতে দুধশর্করা ও বিভিন্নজাতীয়
লবণপদার্থ দ্রব অবস্থায় থাকিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং
দুধের বদলে (শিশু ভিন্ন অন্তের পক্ষে) নানাজাতীয় খাদ্য-
পদার্থ হইতে, শরীরপোষণের উপযোগী, (দুধ মধ্যে বিশ্লেষণ
করিয়া প্রাপ্ত) উপাদানাদি সংগ্রহ করিয়া লওয়া আবশ্যক।

সাধারণতঃ দুধের বদলে ভাত, ডাল, কুটি, মাছ, মাংস,
ডিম, তরীতরকারী, ফল ও মূল হইতেই আমরা ঐ সমুদয়
উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই। মাছ, মাংস, ডিম, ডাইল
ছানা প্রভৃতি পদার্থ হইতে মাংসপটক ছানাজাতীয় পদার্থ ;
ঘৃত, মাখন, চর্কি, মাছের তৈল ইত্যাদি হইতে তাপ ও শক্তি
উৎপাদক মাখনজাতীয় উপাদান এবং ভাত, কুটি, আলু, সব,
চিনি, গুড় প্রভৃতি খাদ্যপদার্থ হইতে শর্করাজাতীয় উপাদান বর্ধেই
পরিমাণে সংগ্রহ হইতে পারে। এই সকল খাদ্যের মধ্যে যে
লবণজাতীয় পদার্থ আছে এবং খাদ্য পদার্থের সহিত প্রয়োজন
মত যে লবণ সচরাচর যোগ করিয়া লওয়া হয়, তাহার দ্বারা এবং
যথা প্রয়োজনীয় জল পান করিয়া আমরা দুধহীন লবণ ও
জলের অভাব নিত্য দূর করিতে সমর্থ হই জানিবে। এই

রূপে বিভিন্ন খাদ্যপদার্থ আহারের জন্যই পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে দুগ্ধ ব্যবহার না করিলেও চলিতে পারে এবং তাহাতে শরীর পোষণের কোনই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না জানিবে।

দুগ্ধ বিশ্লেষণ করিয়া আমরা (১) ছানাভাজাতীয় উপাদান, (২) মাখনভাজাতীয় উপাদান, (৩) শর্করাভাজাতীয় উপাদান এবং (৪) লবণভাজাতীয় উপাদান ইত্যাদি ৪ প্রকারের উপাদান পাইয়া থাকি ; এবং তাহাতেই অবগত হইতে পরিয়াছি যে ঐ চারি প্রকার উপাদান যথোপযুক্ত পরিমাণে আমাদিগের নিত্য খাদ্যের মধ্যে থাকা আবশ্যক। এখন জানা আবশ্যক যে, উক্ত চারি ভাজাতীয় উপাদানের গুণ ও বিশেষত্ব কি এবং কোন প্রকার খাদ্যপদার্থে তাহা পাওয়া যাইতে পারে ? এই বিভাগের প্রত্যেক শ্রেণীর কার্যই যে, একেবারে সুনির্দিষ্ট ভাবে স্বতন্ত্র তাহা নহে ; একটির দ্বারা অল্পটির কার্যও কতক পরিমাণে হইয়া থাকে, তথাপি প্রত্যেক রকমেরই এক একটা বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। খাদ্যপদার্থের রাসায়নিক এই বিভাগের পৃথকীকৃত দ্রব্যগুলিকে Food Stuffs বা খাদ্যপদার্থের উপাদান নিচয় বলা হয়।

(১) ছানাভাজাতীয় উপাদান :—ইংরাজীতে ইহাকে Protied substance বলে এবং ইহাতে নাইট্রোজেন সমধিক পরিমাণে বর্তমান থাকে। মাংসপেশী ও দৈহিক অন্যান্য যন্ত্রাদির ক্ষয়পূরণ ও পুষ্টিসাধন করাই ইহার প্রধান কার্য।

খাদ্যানিহিত উপাদান

নিচয়ের বিভিন্ন গুণ

মুগ্ধ, মাংস, ডিম্বের যেতাংশ, পনির, ছানা, নানাবিধ ডাইল

গম ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত জানিবে । ময়দা, যবের ছাতু, চাউল প্রভৃতি খেতসারপ্রধান খাদ্যপদার্থ মধ্যেও ইহা অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে । আমাদের শরীরপোষণ জন্য এই জাতীয় খাদ্য পদার্থের সমধিক প্রয়োজনীয়তা জানিয়া রাখিবে, কারণ ইহার দ্বারাই শরীর মধ্যে নিয়ত যে ক্ষয় সাধিত হইতেছে, তাহার সম্পূরণ হয় । এই পদার্থনিচয় পাকায় এবং অন্তের মধ্যে জীর্ণ হইয়া পেপ্টোনে পরিণত হয় ; এই পেপ্টোন পোর্টাল (Portal) শিরায় প্রবেশ করে, কিন্তু সাধারণ রক্তাবর্তনের (circulation) মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বেই অদৃশ্য হইয়া যায় । কিন্তু যে উপায়ে ইহা প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ (Protoplasm) গঠন করে, অথবা বিভাজিত হইয়া অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, তাহা আজিও অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে ।

২ । মাখনজাতীয় উপাদান :—ইংরাজীতে ইহাকে fats চক্ষি বা Hydro-carbons বলে ; ইহাতে নাইট্রোজেন থাকে না, কেবল কার্বন, (carbon) জলজান (Hydrogen) এবং অক্সিজান (oxygen) থাকে । শর্করাজাতীয় খাদ্যপদার্থ অপেক্ষা ইহাতে অক্সিজান অল্প থাকে জানিবে । শারীরিক তাপ উৎপাদন করাই ইহার প্রধান কার্য । এই তাপই আমাদের কার্যশক্তি (energy) দান করিয়া থাকে । মাছ, মাংস প্রভৃতি ছানাজাতীয় পদার্থের তাপ ও শক্তি উৎপাদক এই ক্ষমতা নিতান্ত অল্প । মাখন ও শর্করাজাতীয় উপাদানযুক্ত খাদ্যপদার্থ হইতেই আমরা শরীর রক্তনোপযোগী তাপ ও কার্যশক্তি (energy) প্রাপ্ত হই । সুতরাং মাংস না

খাইলে শরীরে বলাধান হয় না, এ ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক । মাখন, ঘৃত, চর্কি, তৈল ইত্যাদি পদার্থ এই জাতীয় ঋণ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত । পাকায়িক রস (Gastric Juice) এই জাতীয় পদার্থের সংযোজক টিস্যু (Connective Tissue) দ্রব করিয়া লইয়া, চর্কি পদার্থটি পৃথক করিয়া দেয় ; পরে উহা অন্ত্রের মধ্যে পতিত হইয়া, ক্লোম এবং স্বল্পমাত্রায় অম্লাত্মক রসের মিশ্রণে দুগ্ধবৎ পদার্থে পরিণত হয় এবং অধিকাংশই অন্ত্রের লাক্টিয়াল (Lacteal) মধ্যে প্রবেশ করে ; সামান্য অংশই পোটাল শিরায় যাইয়া থাকে । ইহা শারীরিক তাপ জননিত করিয়া যে মাংসপেশীর কার্য সম্পাদনে সহায়তা করিয়া থাকে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

- । খেতসার বা শর্করাজাতীয় উপাদান :—

ইংরাজীতে ইহাকে carbo-hydrates বলে ; ইহাতেও নাইট্রোজেন নাই এবং মাখনজাতীয় উপাদান পদার্থের জ্বাল, কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন (অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায়) থাকিতে দেখা গিয়াছে । মাখনজাতীয় উপাদান পদার্থের জ্বাল ইহারও প্রধান বা শারীরিক তাপ এবং শক্তি উৎপাদন করা ; তবে প্রথমোক্ত উপাদানে এই তাপ ও শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা অধিক নিহিত জানিবে । চাউল, আলু, ময়দা, চিনি, গুড়, এরাকট, যব ইত্যাদি পদার্থ এই শ্রেণী ভুক্ত । মুখগহ্বর এবং পাকস্থলীতে ইহা পরিপাক পাইয়া, ড্রাক্স শর্করায় grape-sugar পরিণত হয় এবং ক্রমে পোটাল শিরায় দিয়া শরীরে শোষিত হইয়া যায় । এই জাতীয় ঋণের

আধিকো শরীরকে জ্বল করিয়া ফেলে ; সুতরাং যাহাদিগের মোটা হইবার আবশ্যক থাকে, তাহাদের পক্ষে এই জাতীয় খাদ্য অধিক খাইয়া, বলিয়া সৰ্ব্ব কাটাইলেই সহজে উহা সাধিত হইতে পারে ।

৪। লবণজাতীয় উপাদান :— ইংরাজীতে ইহাকে salts বলে ; নিম্ন ব্যবহায্য লবণই ইহার প্রধান জিনিষ । সকল প্রকার খাদ্যের মধ্যেই, অল্পাধিক পরিমাণে লবণ বিদ্যমান থাকায়, খাদ্যপদার্থের সহিত লবণ মিশ্রিত না করিলেও চলিতে পারে । কিন্তু সকল খাদ্যপদার্থে সমান পরিমাণে লবণ থাকে না, কাজেই দ্রব্যবিশেষে স্বল্প বা অধিক লবণ মিশ্রণ করিয়া লইতে হয় । জল ও অক্সিজেনকেও সচরাচর ইহারই মধ্যে গণনা করা হয় জানিবে । লবণজাতীয় উপাদানে মূত্রের লাল অধিক নিঃসরণ করায় এবং যকৃৎকে পিত্ত প্রস্তুতকরণে সহায়তা করিয়া থাকে । পাকায় হইতে যে পাচকরস Gastric-juice নিঃসৃত হয় তাহার অঙ্গাংশ Hydro-chloric Acid ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । লবণজাতীয় উপাদান বিশিষ্ট খাদ্যপদার্থ স্বাস্থ্যরক্ষার্থ আমাদিগের বিশেষ আবশ্যকীয় জানিবে ; ফলমূল এবং তরী তরকারীতে ইহা যথেষ্টই পাওয়া যায় । শিশুদের বাড়িবার সময় যথেষ্ট পরিমাণে খনিজ খাদ্যদ্রব্য (লবণজাতীয়) খাইতে দেওয়া উচিত, নতুবা তাহাদের অস্থি, দন্ত প্রভৃতি কঠিন অংশ সকল সম্যকরূপে পরিপুষ্ট হইতে পারে না । উত্তাপ ও শক্তি প্রদান করা ইহার কার্য বলিয়া পরিগণিত হইলেও, শরীরস্থ কঠিন অংশ সকলের পঠন করাই ইহার প্রধান কার্য জানিবে ।

উপরে বর্ণিত চারিজাতীয় উপাদান পদার্থ সমালোচনায় আমরা দেখিতে পাইলাম যে, মাছ ও মাংসের মধ্যে লবণজাতীয় ও মাখনজাতীয় পদার্থ স্বল্পমাত্রায় থাকে এবং শর্করাজাতীয় পদার্থ মোটেই থাকে না ; সুতরাং

ইহাকে নাইট্রোজেন-প্রধান খাদ্য বলা

উহাদের তুলনায়

সমালোচনা

হয়। চাউলে ছানা ও মাখনজাতীয়

উপাদান স্বল্প থাকে, কিন্তু শর্করাজাতীয় উপাদান অতিশয় অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকায়, ইহাকে শর্করা বা কার্বো-হাইড্রেট-প্রধান খাদ্য বলা হয়। চাউলে ছানা, মাখন ও লবণ-জাতীয় উপাদান স্বল্প থাকার জন্যই, ইহার সহিত যথা পরিমাণে ডাইল, মাংস, মাছ, ঘৃত, তৈল, তরী তরকারী, বা দুধ না খাইলে চলে না। চিনি ও গুড়ে ছানা ও মাখনজাতীয় উপাদান মোটেই নাই, কেবলমাত্র শর্করাজাতীয় উপাদানই বর্তমান, এই জন্য ইহাও চাউলের জায় কার্বো-হাইড্রেট প্রধান খাদ্যরূপে পরিগণিত জানিবে। ঘৃত, তৈল, চর্কি ইত্যাদি পদার্থে কেবল মাখনজাতীয় পদার্থই থাকে, অন্য কিছু থাকে না এইজন্য ইহাকে হাইড্রো-কার্বন জাতীয় খাদ্য বলা হয়। ডাইল, ময়দা, যবের ছাতু ইত্যাদি পদার্থে ছানাজাতীয় ও শর্করাজাতীয় উপাদানই সমধিক এবং মাখন ও লবণজাতীয় পদার্থ অল্প থাকে। ডাইলের সহিত ঘৃত বা তৈল যথোপযুক্ত ভাবে যোগ করিয়া লওয়া প্রয়োজন, কারণ ইহাতে মাখন-জাতীয় পদার্থ অল্প থাকে (৭৮ পাতা দেখ)। তরী তরকারী, দুধ, এবং পানীয় জলে লবণজাতীয় পদার্থই অধিক থাকে, অন্য জাতীয় পদার্থ কম জানিবে।

একজাতীয় খাদ্যে নির্ভর করিওনা । ২২৫

এই সকল খাদ্যপদার্থের সমালোচনার আবশ্যক বেশ দেখিতে পাইলাম যে, কোন একজাতীয় খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকা উচিত নহে। শুদ্ধ মাংস অথবা ভাত খাইলে, আমাদের শরীর সুস্থ থাকে না; কারণ মাংসে

মাত্রাধিকার বিষয় কল

ছানাঙ্গাতীয় উপাদান প্রচুর থাকি-

লেও, উহাতে অল্পাংশ উপাদানের সমৃদ্ধি অভাব দৃষ্ট হইতে আমরা দেখিয়াছি। আবার অল্পে শর্করাজাতীয় উপাদান যথেষ্ট থাকিলেও, ছানা, মাখন ও লবণজাতীয় উপাদান অল্প থাকে। ছানাঙ্গাতীয় খাদ্যপদার্থ অতিরিক্ত খাইতে থাকিলে, ইউরিয়া এবং ইউরিক অ্যাসিড্ অতি অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া, শরীরস্থ বহিঃনিসারক যন্ত্রাদির কার্য (যেমন যকৃত ও কিড্‌নীর) অতিরিক্ত বাড়াইয়া দেয়। অঙ্গুষ্ঠবাত, লিথিমিয়া, যকৃতের এবং কিড্‌নীর গোলযোগ এবং অজীর্ণতা ইত্যাদিও দেখা দিতে থাকে। আবার যদি তৈল, ঘৃতযুক্ত অথবা খেত-সারীয় Starchy পদার্থ অধিক খাওয়া হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত মোটা হইয়া পড়িবার সম্ভব এবং পরিণামে অজীর্ণ-

তাও দেখা দিতে পারে। আমাদের খাদ্যহারের মধ্যে যদি একেবারে নাইট্রোজেনস্ অর্থাৎ ছানাঙ্গাতীয় পদার্থ না থাকে, তাহা হইলে মানুষ অধিক দিবস বাঁচিতেই পারে না। এই ছানাঙ্গাতীয় পদার্থই আমাদের শরীরস্থ কয়প্রাপ্ত এবং ক্রান্ত টিসু সমৃদ্ধ যে, নূতন করিয়া দেয় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শীতপ্রধান দেশের লোকে, সহজেই সকল প্রকার চর্কিবৃত্ত খাদ্য আহাৰ করিয়া চৰ্জম করিতে পারে, কিন্তু এই

উষ্ণপ্রধান দেশের লোকের প্রধান ঋণ, অধিক পরিমাণে
শর্করাজাতীয় এবং farinaceous তরল প্রকারের হওয়াই
কর্তব্য ।

শিশু অথবা পূর্ণবয়স্ক লোকে যদি স্বল্পাহারে কাল কাটা-
 ইতে থাকে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, সে মালিন, শীর্ণ
 ও দুর্বল হইয়া পড়িতেছে ; সময়ে ২ ঐ দুর্বল অবস্থা হইতে
 উৎপন্ন উদরাময় অথবা রক্তামাশয় হইয়া মারাও যাইতে
 পারে । অনুপায় ক্রমশঃ আহারে অভ্যস্ত শিশুগণে দন ও
 Starchy খেতসারীয় দ্রব্য ব্যবহৃত হইলেই, প্রধাণতঃ দেখা
 যায় যে, অজীর্ণতা, পেটে বাতাস জমা, কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা
 উদরাময় উৎপন্ন হইয়াছে । আরও দেখিবে যে ঐ শিশু খিট-
 খিটে, বিরক্ত, নিদ্রাশূণ্য হইয়া শুকাইয়া যাইতে থাকে, চণ্ডে
 স্ফোটক Eruption দেখা দেয় এবং প্রায়ই মৃত্যুর পূর্বে উৎ-
 ক্লেপ convulsion আরম্ভ হয় । অনাহারে :—থাকিলে
 প্রধাণতঃ প্রথমে কুক্ষিপ্ৰদেশে বেদনা (চাপে উপশমিত)
 লক্ষিত হয় ; কিন্তু দুই এক দিবসের মধ্যে উহা মিলাইয়া
 যায় (Subsides) এবং এক প্রকার দুর্বলতা ও তীব্র
 পিপাসা অনুভব করিতে থাকে । এখন মুখমণ্ডল মালিন, দেহ
 হইতে একপ্রকার দুর্গন্ধ নির্গমন এবং শারীরিক শক্তি সত্তর সত্তর
 কমিতে আরম্ভ করে । পাত্রেয় উদ্ভাপ
 স্বাভাবিকাপেক্ষা কমিয়া যায় ; মান-
 আহারের পরিণাম

সিক শক্তিও সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল হইয়া পড়ে । প্রথমে বোকাটে
 ভাব, পরে ভীতভাব, এবং তাহা হইতে পরে উন্মাদের ভাব
 উৎপন্নও হইতে পারে । শক্তিহীনতার এই ভাব ক্রমশঃ লক্ষিত

হইতে হইতে, কখন বা কন্ডলসন্ হইয়াও প্রাণত্যাগ হইয়া থাকে । একেবারে খাদ্য ও পানীয় না থাকিলে ৮১০ দিনের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে ; তবে যদি জলপান করিতে পারে, তাহা হইলে এই সময়ের অধিক কালও বাঁচিয়া থাকা যায় ।

এইমাত্র আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, অত্যধিক, স্বল্প, অল্পপুষ্ট অথবা অনাহারে থাকিলে শরীরের পক্ষে তাহা হানিজনক হইয়া থাকে ; সুতরাং শরীরের ক্ষয় নিবারণ এবং তাপজনন ও সম্পূর্ণ জ্ঞান যাহা প্রকৃতভাবে প্রয়োজন, তাহাই আমাদের উপযুক্ত এবং স্বাভাবিক খাদ্য বলিয়া ধরিতে হইবে । বহুতর সুস্থদেহীর শরীর সুপরীক্ষায় জানিতে পারা

গিয়াছে যে :—

নাইট্রোজেনস	১৩০	গ্রাম বা	৪.৫	ওন্স
দুত-ইতল-চর্কিময়	৮৪	" বা	৩	
শর্করাজাতীয়	৪০৪	" বা	১৪.২	
লাবণিক পদার্থ	৩০	" বা	১	
	৬৪৮	গ্রাম বা	২৩	ওন্স

উপাদান বিশিষ্ট খাদ্য একজন ১, ভ্রমত পারিত্রিকী পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তির, স্বাস্থ্য সংরক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট । গার্ভী ডক্টর রাসায়নিক বিশ্লেষণ সহিত পূর্ণ লিখিত পূর্ণবয়স্কের খাদ্যের তুলনায় আমরা জানিতে পারি যে, উহার চর্কিজাতীয় অংশমাত্র পূর্ণবয়স্কের খাদ্যপদার্থের ষোলসারী অংশ গ্রহণ করিয়াছে (পাতা দেখ)

এই হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, সমু-
ক্ষ খাদ্যপদার্থের একের পাঁচ ভাগ,
নাইট্রোজিনস বা প্রোটিন পদার্থ

বিভিন্ন প্রকার পরি-
শ্রমের খাদ্য

হওয়া আবশ্যক এবং মোটের উপর এই খাদ্যপদার্থ সর্ব সাফল্যে প্রায় ২৩ ওঁন্স শুষ্ক অক্সিজেন দ্বারা পদার্থের সমান পরিমাণযুক্ত হওয়া কর্তব্য । যদি ধরা যায় যে, আমাদের সাধারণ খাদ্যের সহিত, আমরা তৎনিহিত শতকরা ৫০ ভাগ জল সেবন করিয়া থাকি, তাহা হইলে শুষ্ক এই ২৩ ওঁন্স অক্সিজেন পদার্থ, সাধারণ খাদ্য-পদার্থের ৪৬ ওঁন্সের সহিত সমান হইল । খাদ্যপদার্থের সহিত জল খাওয়া ব্যতীতও, আমরা সচরাচর ৫০৮০ ওঁন্স খাঁটি জল পৃথকভাবে খাইয়া থাকি । এইরূপ আদর্শ ব্যবস্থায় খাদ্য পদার্থের ৪০০০ স্কট টন শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা আছে । কিন্তু বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী এইরূপ ব্যবস্থিত আদর্শ খাদ্যপদার্থের কতকিংশ পরিবর্তন হওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠে ।

একারণ যে সকল ব্যক্তি অল্পে বসিয়া জীবন কাটায়, তাহাদের উপযোগী খাদ্যপদার্থের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

নাইট্রোজেন পদার্থ	৭৭	গ্রাম	বা	২'৫	ওঁন্স
৫৬ তৈল চর্বিময়	২৮	"	বা	১	
শর্করাভাষী	৩৪০	"	বা	১২	
লাবণিক পদার্থ	১৪	"	বা	০'৫	
	৪৫৯			১৬.২	

এই ব্যবস্থার খাদ্য, অল্প ব্যক্তির জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট বটে, কিন্তু কোন প্রকার পরিশ্রম করিতে থাকিলে ইহা যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে না ।

আবার একজন কঠিন পরিশ্রমীর পক্ষে উপযোগী খাদ্য

কঠিন পারিশ্রমীর খাদ্য পরিমাণ । ২২৯

পদার্থ নিরূপণ করিতে হইলে, নিম্ন প্রকৃতির হওয়া উচিত বলিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে, যথা :—

নাইট্রোজেনস্ পদার্থ	১৪২	গ্রাম বা	৫	ওন্স
চর্বি, শুভ তৈল "	: ৪৮০	" বা	৩	"
শর্করা জাতীয় "	. ৬৩০	" বা	২২.২	"

এইরূপ খাদ্য ৫:৩২ কুট টন শক্তি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইতে পারে। অবশ্য ইহা বলা বাহুল্য যে, আমাদের দেশের পক্ষে পূর্বোক্ত তালিকা লিখিত খাদ্য পরিমাণ খাটিবে না, কারণ শীতপ্রধানদেশের পক্ষে যে পরিমাণ দৈহিক উত্তাপের আবশ্যক, আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধানদেশে তাহা আবশ্যক হয় না। পূর্বোক্ত তালিকা সমুদয়ই শীতপ্রধানদেশের উপযোগী করিয়া লিখিত।

জীলোক পুরুষের সমান কাণ্ডা করিলেও, তাহার আহার পুরুষের অপেক্ষা দশভাগের এক ভাগ অংশ স্বল্প হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু অল্প পরিশ্রমী জীলোকদিগের পক্ষে, এক তৃতীয় বা এক চতুর্থ অংশ কম হইলেই ভাল হয়। ১০ বৎসর বয়সের বালিকাকে, পূর্ণবয়স্ক জীলোকের আহারের অর্ধ পরিমাণ খাদ্য দেওয়া কর্তব্য। ১৪ বৎসরের বালক কিন্তু পূর্ণবয়স্ক জীলোকের সমান আহার করিয়া পক্ষে দেখা গিয়াছে।

আরও একটু বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, স্বাভাবিক পরিশ্রমী মানুষের সচরাচর ব্যবহৃত উপযুক্ত খাদ্য :—

	না	কা
নাইট্রোজেনস্ পদার্থ ঊল্ল ৪'৫	৩১৬	গ্রেণ ১০৬৮ গ্রেণ
চর্কিময়	" " ৩	" " ১০২৪ "
শর্করা জাতীয়	" " ১৪'২৫	" " ২৭৬৮ "
	৩১৬'	৪৮৬০

থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং ৩০০ গ্রেণ নাইট্রোজেন এবং ৪৮০০ গ্রেণ কার্বন (২০ গ্রাম নাইট্রোজেন এবং ৩২০ গ্রাম কার্বন) মোটের উপর আমাদের প্রয়োজন জানা যাইতেছে। ইহাদের অনুপাত ১:১৫।

কোন একটি খাদ্যপদার্থ হইতেই, আমরা এই অনুপাত অনুযায়ী দেহস্থ নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারি না; যে কোন পদার্থই ধরা যাউক না কেন, বিশ্লেষণ analyse করিলেই দেখা যাইবে যে, হয় নাইট্রোজেন অধিক হইতেছে, না হয় কার্বন অধিক হইতেছে। সুতরাং এমন কয়েকটি পদার্থ আহাৰ করা প্রয়োজন, যাহা-

দেয় বিশ্লেষণ সমষ্টি একত্র করিলে,

মিশ্র খাদ্য পদার্থই

আবশ্যক

পূৰ্ণোক্ত স্বাভাবিক আবশ্যকীয় পদার্থ

(যাহা শরীর হইতে বহিনিঃসৃত হইয়া যাইতেছে) সংগ্রহ হইতে পারে। বিশেষ পরীক্ষায় জানিতে পারা গিয়াছে যে, মিশ্র খাদ্যপদার্থই শরীর সংরক্ষণ পক্ষে একান্ত উপযোগী। খাদ্যপদার্থের উপাদান আধিক্য যাহা পরিণাম হইতে পারে তাহা পূৰ্ণেই বলা হইয়াছে! এখন এই মিশ্র খাদ্যপদার্থ কি ভাবে

হইতে পারে তাহাই আলোচনার বিষয় । ইউরোপীয় প্রধানখাদ্যী
১সের রুটি এবং :৥ পোয়া মাংস খাইলেই, পূৰ্ব্বোক্ত অবস্থা
পরিপূরণ হইতে পারে, কিন্তু উহার সহিত যদি ১ বা ২ ঔন্স
মাখন থাকে, তবে ত আর কথাই নাই !

প্রধান খাদ্য ।

	কা	না
অর্ধ সের রুটি.....	১১০	৫.৫
১ পোয়া মাংস.....	৩৪	৭.৫
অর্ধপোয়া ঘৃত বা তৈল.....	৮৪	

আন্তঃসঙ্গিক ।

অর্ধ সের আলু.....	৪৫	১.৩
অর্ধ পাইন্ট ছদ্ম.....	২০	১.৭
অর্ধ পোয়া ডিম.....	১৫	২
১ ছটাক পনির.....	২০	৩
	৩০৫	২১

কিন্তু ইউরোপীয় প্রকার খাদ্য আমাদের দেশের পক্ষে মোটেই
উপযোগী নহে ; অবশ্য আমরা পূৰ্ব্বোক্ত হিসাব হইতে কথঞ্চিৎ
পরিবর্তন করিয়া সহজেই উহা আমাদের উপযোগী করিয়া লইতে
পারি ! স্বচ্ছলাবস্থার লোকের পক্ষে ঐ হিসাব মত আহারও
চলিতে পারে, তবে মাংসের স্থানে নিত্য ব্যবহার করা মৎস্য
এবং ডিমের পরিবর্তে ছানাজাতীয় অল্প কোন পদার্থ বসাইয়া
লইলেই ভাল হয় । মাংস এবং ডিম উক্তপ্রধানদেশে লোকের
প্রত্যহ আহার করা উচিত নহে । মাংসে ছানাজাতীয় পদার্থ

সর্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যমান থাকায় উহা যে, আমাদের শরীর রক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনে আসিতে পারে তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না । কিন্তু উপকারীতার সহিত যদি অপকারীতাও বর্তমান দেখা যায়, তবে

মাংসাহার

তাহা বর্জন করিয়া, যাহাতে বিত্ত

উপকারীতা আছে, তাহা ব্যবহার করাই সমীচীন নহে কি ?

কোন প্রকার রাসায়নিক অণুপাতের প্রতি না । তাকাইয়া, আমাদের মতে নিম্ন প্রকারের আহারই এই দেশীয়ের পক্ষে যথেষ্ট উপকারী বলিয়া গণ্য হইতে পারে, যথা :—

দিবসে ।

ভাত.....১ বা দেড় পোয়া চাউলের ।

(ডাইল, মাছের কোল, ভাজা ও ২৪টি বাজ্ঞন পদার্থ যথোপযুক্ত পরিমাণে) ।

দুগ্ধ.....আধ সের ।

রাত্রিতে ।

কুটি, লুচি বা পরোটা.....১ বা দেড় পোয়া আটা বা ময়দাব ।

(ডাইল, বা মাছের কোল, ভাজা ও ১২ টি বাজ্ঞন পদার্থ)

দিবাপেক্ষা স্বল্প পরিমাণে) ।

দুগ্ধ.....আধ সের ।

হুই বেলাই বাজ্ঞন বা তরকারীতে আলু যেন দেওয়া থাকে, সময়ে সময়ে উহা সিদ্ধ বা ভাতে দিয়াও খাওয়া কর্তব্য । কলা কাঁচা বা পাকা, বাহাই হউক প্রত্যহ বা ২১ দিন অন্তর সেবন করা কর্তব্য । রাত্রিতে কুটি বা লুচির বদলে জনকে ভাতুই

খাইয়া থাকেন। আহার অনেকটা অভ্যাসগত জানিবে, যেমনটি অভ্যাস করিবে, তাহাই চালাইতে হইবে, নতুবা নূতন জ্বা ব্যবহার করিতে যাইলেই অসুখ হইবার সম্ভাবনা। একই জিনিষ প্রত্যহ না খাইয়া, ডাইল, মৎস্ত বা তরী তরকারী, বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা করিলেই, আর অনবরত একই জিনিষ সেবনে অকুচি জন্মাইবার ভয় থাকিবে না। রাত্রিতে ভাত না খাইয়া, রুটি বা লুচির ব্যবস্থা

এ দেশের উপযোগী

অনেকে এই একঘয়েই নাশ জন্মও

আহার কি ?

করিয়া থাকেন। কিন্তু কাহাকেও

বা বাধ্য হইয়াই ইহা করিতে হয়, কারণ ভাতে জলীয়ামণ অধিক থাকায়, রাত্রিতে অনেকের পক্ষে উহা সহ হয় না, স্নাতরাং অপেক্ষাকৃত শুক রুটি বা লুচি আহার করিতে বাধ্য হন।

আমরা উপরে যেরূপ ব্যবস্থার কথা লিখিলাম তাহা স্বচ্ছল ব্যবস্থার উপযোগী, কিন্তু যাহাদের উহা জুটাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাদের পক্ষে কিরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত ? আমরা প্রতিদায়িত্বই চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাই যে, দরিদ্র গৃহস্থ এবং মুটেমজুর, কৃষক প্রভৃতির আহার কেবলমাত্র ভাত ও ডাইল—তরী তরকারী না হইলেও চলে, মৎস্ত, ঘৃত বা দুগ্ধের কথা ত ধর্তব্যই নহে ! কিন্তু তথাপি উহাদের শরীর, সামর্থ্য রক্ষণোপযোগী শক্তি আহরণ করে কোথা হইতে ? পূর্বে আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি যে, ডাইলে নাইট্রোজেনস্ পদার্থ, মাংস অপেক্ষাও অধিক আছে, কিন্তু চর্কিময় পদার্থ স্বল্পতর থাকে। শিবজ্ঞান উহাতে ঘৃত বা তৈল যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। স্নাতরাং দেখা যাইতেছে যে, যথেষ্টভাবে

ডাইলের ব্যবহারই মাঁচ, মাংস প্রকৃতি ছানাজাতীয় পদা-
র্থের অভাব পূরণ করিয়া থাকে ।

অজীর্ণরোগীর পক্ষে কিন্তু ডাইলের ব্যবহার স্বল্পভাবেই হওয়া কর্তব্য ; একারণ দরিদ্রের অজীর্ণরোগ দেখা যাইলে বড়ই গোলের কথা ! কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, এ পীড়া ধনী বা অভাবপক্ষে মধ্যবিত্তের গৃহে ভিন্ন দেখা যায় না !!

জীবনের অবস্থান্তেও আহারের তারতম্য হওয়া উচিত, কারণ যে সময়ে যাহা অধিক আবশ্যক, তাহাই পরিপূরণ করিবার নিমিত্ত, সেই জাতীয় আহার করাই বাবস্থা জানিবে । আমরা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, শিশুগণকে বর্দ্ধনের সময় খনিজ অর্থাৎ লবণজাতীয় খাদ্যই অধিক দেওয়া প্রয়োজন এবং দত্ত নির্গমনের পূর্বে তাহাকে কোন খেতসারীয় খাদ্য

দেওয়া কর্তব্য নহে । এখন দেখা যাউক পরবর্ত্তি অবস্থান্তেও আহারের ব্যবস্থা কি প্রকারের করা কর্তব্য । ৯ বৎসর পর্য্যন্ত বালক বালিকাকে হৃৎ ও খেতসারীয় পদার্থই অধিক দিবে ; কৈশোর হইতে যৌবন পর্য্যন্ত, ছাত্রজীবনে

শরীরের বর্দ্ধন এবং পরিপোষণ ক্রিয়া

বয়সভেদে

দ্রুত সাধিত হইতে দেখা যায়,

আহারের তারতম্য

সুতরাং এই সময়ে তত্ত্ব নির্মাপক (tissue building) খাদ্যই অধিক প্রয়োজনীয় । যথা যৌবন হইতে প্রৌঢ়কাল

পর্য্যন্ত নিত্য সচেষ্ট (active) কার্য্য কবিবার সময়, শক্তি energyউৎপাদক খাদ্যই প্রধানভাবে প্রয়োজন, সুতরাং মাংস-জাতীয় উপাদানবিশিষ্ট খাদ্য এইকালে যথেষ্ট পরিমাণে আহার

করা কর্তব্য কারণ (ইহা প্রধানতঃ শক্তিই উৎপাদন করে) ।
 বারুক্য অর্থাৎ জীবনের শেষাবস্থায়, যখন সমুদয় সচেতনতা লোপ
 পাইতে থাকে, তখন অনুত্তেজনীয় non-stimulating
 খেতসার ও শর্করাজাতীয় খাদ্যই প্রধানভাবে আহার করা
 কর্তব্য ।

বয়সভেদে আহারের তারতম্য যে প্রকারের হওয়া
 উচিত এখানে তাহাই বলা হইল মাত্র । ইহা দেখিয়া কেহ
 যেন মনে না করেন, যে একমাত্র উহাই কেবল আহার
 করিতে হইবে এবং অল্প কিছু আহার করা কর্তব্য নহে ।

মনুষ্যের খাদ্যাখাদ্য সঙ্কল্পে, শুধু বৈজ্ঞানিক উপায়ে রাসায়-
 নিক বিশ্লেষণ দ্বারা, মূলদণ্ডে নির্ণীত খাদ্যবিচার করিলেই
 চলিবে না—দেশকাল, যশ, পাত্র প্রভৃতির বিষয়ও আলোচনা
 করা বিশেষ আবশ্যক । সুতরাং ইতর জীবজন্তুর ন্যায় কেবল-
 মাত্র শরীরপোষণ এবং শক্তি ও তাপ উৎপাদক যে কোন
 খাদ্যই হউক না কেন, মনুষ্যের অল্প ব্যবস্থা করিলে চলি-
 বেনা ? “রুচি” বলিয়া মনুষ্যের নিজস্ব একটা জিনিষ আছে
 এবং তাহার জন্তই অসংখ্য জীবজন্তু অপেক্ষা মনুষ্য জগতে
 শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আছে । ইহাঙ্গিণের খাদ্য বিচারের
 সময়, এই রুচি জিনিষটা বাদ দেওয়া

রুচিভেদে আহার

যাইতে পারে না, সুতরাং খাদ্যে কতটা

নাইট্রোজেন আছে জানিতে পারিলেই যে চরম সিদ্ধান্ত
 হইয়া গেল, তাহা যেন কেহ মনে না করেন । “আপু রুচি থানা”
 বলিয়া আমাদের দেশে একটা প্রবাদ চলিত আছে, বোধ

হয় সকলেই জানেন, সুতরাং কেহ কাহারও জন্ত কোন খাদ্য নির্দিষ্ট করিয়া স্থির করিয়া দিতে পারেন না। কারণ হয়ত তাহা বাহার জন্ত নির্দিষ্ট হইল, তাহার রুচিকর নহে, কাজেই গাণ্ডির মধ্যে খাদ্যবিচারের ব্যবস্থা করা উচিত নহে। ব্যবস্থাপক এই পর্য্যন্ত বলিয়া দিতে পারেন যে, আমাদের শরীরপোষণ ও সংরক্ষণের জন্ত এই এই দ্রব্য আহার করা প্রয়োজন এবং সম্ভবমতঃ একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়াও দিতে পারেন (অধিকাংশ স্থলে তাহাও নিজ রুচি অনুযায়ীক হইয়াই পড়ে)। যদি উহা কাহারও রুচি সঙ্গত না হয়, তাহা হইলে একটু চেষ্টা করিয়া, নিজেই তিনি সেই সেই জাতীয় খাদ্য উপাদানবিশিষ্ট নিজের মনোমত খাদ্য ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারেন।

শরীরের ক্ষয় নিবারণ, তাপজনন, শক্তি সংরক্ষণ এবং সম্পূর্ণের জন্তই যে আহারের প্রধান আবশ্যিকতা এবং তাহার পরিমাণ কি হওয়া উচিত তাহা দেখাইয়া আসিয়াছি। ২৪ ঘণ্টায় পূর্ণদেহীর শরীর হইতে

যে পরিমাণ পদার্থ নির্গত হইয়া যায় শরীরের আর ব্যয় তাহাও দেখান হইয়াছে; সুতরাং মোটা-

মুটি হিসাবে, আয় ও ব্যয় হইতে আমরা প্রকৃত লাভবান কি ভাবে হইয়া থাকি; তাহা উপসংহারে দেখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। সুপরীক্ষায় আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, এই আর ব্যয়ের হিসাব নিকাশান্তে, শরীরের ওজন প্রায় সমভাবে থাকিতে দেখা বাইলেও, প্রকৃত পক্ষে ভিতরে আমরা লাভ-

বান হইয়াই থাকি। নিম্নলিখিত হিসাবটি দেখিলেই উহা সহজে সকলের উপলব্ধি হইতে পারিবে।

আয়			ব্যয়		
(বাগ পদার্থ ইত্যাদি হইতে)			(মল, মুত্র ও বাহ্যনিঃসৃত পদার্থ দ্বারা)		
নাইটোজেন	২০	গ্রাম	নাইটোজেন	২০	গ্রাম
কার্বণ	৩১৫	"	কার্বণ	২৭৪	"
জল	২০০০	"	জল	২০০০	"
লাবনিক পদার্থ	২৪	"	লাবনিক পদার্থ	"	২৪০
অক্সিজেন	৭০২	"	অক্সিজেন	"	৫৮২
	<u>৩০৬৮</u>			<u>২২০০</u>	

৩০৬৮—২২০০=৮৬৮ গ্রাম পরিমাণ দ্রব্য শরীরে থাকিয়া যায়।

এই ৮৬৮ গ্রাম পদার্থ—গাছা ২৪ ঘণ্টার হিসাব নিকাশান্তে শরীরে রহিয়া যায়—দ্বারা প্রত্যহ আমাদের, শরীর সম্পূর্ণ হইয়া থাকে জানিবে। আয়ব্যয়ের হিসাব সমানভাবে থাকিয়া যাইলে, এই সম্পূর্ণর আশা মোটেই থাকিত না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আমিষ ও নিরামিষ-আহার !

হিন্দু শাস্ত্রকারগণ আহারকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া গিয়াছেন, যথা, সাহ্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যে দ্রব্য ভোজন করিলে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় তাহা সাহ্বিক, যাহা ভোজন করিলে রজোগুণের বৃদ্ধি হয় তাহা রাজসিক এবং যাহা ভক্ষণ করিলে তমোগুণের বৃদ্ধি হয় তাহা তামসিক আহার বলিয়া পরিগণিত। আমিষ আহার তামসিক আহা-
রের মধ্যেই গণ্য ; এই আহারে অভ্যস্ত হইলে, লোকের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্যক সাধিত হয় না এবং পাশবিক প্রবৃত্তি সকল প্রবল হয়।

এই জগুই আখ্যা আমিগণ মোক্ষকামী নিরামিষ পক্ষের মত ব্যক্তি মাত্রকেই রাজসিক ও তামসিক

আহার বর্জন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এবং সুধীবর্গও আজকাল সাহ্বিক আহারের উপকারিতা ও তামসিক আহারের অপকারিতা উপলব্ধি করিতেছেন দেখা যাইতেছে। ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার অনেক ব্যক্তি, আমিষ আহার পরিত্যাগ করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার সুবিখ্যাত ডাক্তার এব্রামোউস্কি (Dr. O. L. M. Abramowski M.D Ph.D. M. O.H.) বলেন যে,

মামুষ কেবল সুপক্ক শুক কল মূল খাইয়াই সুস্থ ও সবল দেহ ধারণ করিতে পারে । অধিতে অন্নপাক করিয়া খাইলে, অন্নের অনেক পুষ্টিকর দ্রব্য বিনষ্ট হয়, (পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, গান ভান্নিবার husking সময় চাউলের পুষ্টিকর পদার্থ এক অষ্টমাংশ নষ্ট হয় ; তার পর মাজাই করিবার polishing সময় উহার বাহ আবরণ—বাহাতে প্রধানতঃ প্রোটিন্ পদার্থ থাকে—সহ এক চতুর্থ পুষ্টিকর অংশ আমরা ফেলিয়া দেই ; সর্বশেষে সিদ্ধ করিয়া ভাতের ফেণ ফেলিয়া দেও যায়, আর এক অষ্টমাংশ পুষ্টিকর পদার্থ আমরা পরিবর্জন করিয়া থাকি । সুতরাং দেবা যাইতেছে যে, মোটের উপর প্রত্যহ আমরা চাউলের অর্দ্ধ ভাগ পুষ্টিকর পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া ভোজন করিয়া থাকি ।) এই জন্ত শুধু ভাত খাইলে, আমাদের শরীর পোষণ হইতে পান্যাত্মক পুষ্টিভর মত পারে না—কাছেই উহার সহিত নাইট্রো-

জেনস্ পদার্থ সম্বলিত খাদ্য ভোজন করা অবশ্য কর্তব্য হইয়া উঠে । কিন্তু তাই বলিয়া যে, মৎস্য, মাংস, ডিম্ব ইত্যাদিই একান্ত আবশ্যক তাহা নহে ! মৎস্য মাংস না খাইয়াও, লোকে পরিপোষণ ও দীর্ঘজীবন লাভ করে, অনাময় হয় এবং বহু কষ্টের রোগের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে, বলিয়া বিলাতের প্রসিদ্ধ ডাক্তার ওল্ডফিল্ড (Dr. Joshua Oldfield D. C. L. M. A. M. R. C. S. L. R. C. P.) মত প্রকাশ করিয়াছেন । ঐ স্থানের আর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সিড্‌নী বিয়ার্ড (Sidney. H. Beard) বলেন যে, মৎস্য, মাংস, খাইলে মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও বিকাশ বিলম্বে সাধিত

হয়, আধ্যাত্মিক দৃষ্টি মলিন হয় এবং প্রকৃতি নির্ভয় হইয়া

উঠে ।

আমরা উপরে যাঁহা বলিয়া আসিলাম তাহার বিপরীতে মত প্রকাশ করিয়া, কোন কোন পণ্ডিত নিরামিষ আহারকে শরীর ধ্বংসের এক প্রকার কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । তাঁহারা বলেন যে, নিরামিষভোজীরা গানবদেহের যন্ত্রগত (organic) রোগ সমূহকে ততটা প্রতিরোধ করিতে পারে না, কারণ দৈহিক বীৰ্য্য ও মানসিক সূচেষ্টতার জন্য যঁতটা রক্তোৎপাদক দ্রব্য (proteid substance) আবশ্যক ততটা তাহারা আহ্বসাৎ করিতে পারে না ।

এই প্রকারের মাতান্ত্রসরণকারী কলিকাতা আমিস পত্রের মত

মেডিকাল কলেজের শারীরতত্ত্বের

অধ্যাপক (Dr. Mc. Cay ডাঃ ম্যাক্কে, সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী অনেক গুলি পরীক্ষিত তথ্য হইতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যাহারা কেবল ভাত খায়, সেই বঙ্গদেশের

অধিবাসীরা—ইউরোপের যে সকল দেশ শারীরিক হিসাবে হীনবহু, সেই সকল দেশের অধিবাসী অপেক্ষাও—শারীরিক হিসাবে অনেক নিকৃষ্ট । জীবনবীমা কোম্পানীদিগের তথ্য তালিকা হইতেও প্রমাণ হয় যে, যাহারা অজ্ঞাত ঋণের সহিত মাংসাহার করে, সেই প্রবাসী ইংরাজদিগের অপেক্ষা বঙ্গদেশের খাস অধিবাসীরা সৰ্ব্ব মারা যায় । তাহা-

দের অর্থাৎ অন্নভোজীদিগের, শরীরে রক্তের অভাব হয় এবং তাহারা প্রায়ই বৃদ্ধপ্রবী সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া পাকে । বেহের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে রক্তোৎপাদক শক্তি না থাকায়,

দৈনিক নৃত্যগুলির টিকিয়া থাকিবার পৰ্য্যাপ্ত শক্তি থাকে না। সেই কারণে ইংলণ্ড অপেক্ষা বন্ধদেশে, লোকে বহুমুত্র, নিউ-মোনিয়া, ফুসফুস ত্রণ, মালী বা প্রভৃতি রোগের কবলে পতিত হয়। এই সব কারণে Dr. Mc. Cay. নিরামিষ ভোজনের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মতে খাঁটি নিরামিষ আহাারে শরীরে রক্তের অভাব হয়, সুতরাং জীবনীশক্তিরও হ্রাস হয় এবং প্রকৃষ্ট শরীরে জীবানু (microbe) বংশবৃদ্ধি করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পায়।

আমাদের দেশীয় কৃতবিদ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্সমাখব
বল্লিক এম্‌. এ. এম্‌. ডি, মহাশয়ও “ছাত্রজীবনের আহার”
সবন্ধে একটি প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, “জাতব্য খাদ্য
এক প্রকার প্রোটিন্‌, পুষ্টিকর পদার্থের সারবিশেষ; ইহা অতি
সহজে পরিপাক পায় এবং শরীরে মিলিত হইয়া পড়ে; কিন্তু
মূল্যের আধিকা ও বৃথা বখ করার অপ্ৰবৃত্তি জন্মই, ইহা
খাইতে লোকে আপত্তা করিয়া থাকে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক
দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, ইহার ব্যবহার সম্ভব অনায়াসান্বয়ী।
Spencer সাহেব তাঁহার শিকা

ଅମିତ୍ତ ବଡ଼ାବଳ

সম্বন্ধীয় পুস্তকেও এই বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; অগিচ জাঃ সাদার-
ল্যাণ্ড (Sutherland) তাঁহার 'পঞ্চা বিষয়ক' পুস্তকে এই
মতই প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম বর্জন সময়ে যে, বাংলাভার
বিশেষ প্রয়োজনীয়, এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ দেখা যায়
না; কিন্তু জীবনের ধ্বংসস্থান সময়ে উহার ব্যবহার
হয় বা সোপ করান কর্তব্য। পুরুষাত্মক নীতিমত

প্রোটিন্ পদার্থ অনাহারে, আমাদের দেশীয় ছাত্রগণের জীবন ক্রমশঃই স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং তাহাদিগের নিত্য আহারের মধ্যে কোন প্রকার জান্তব মাংস থাকুক একান্ত কর্তব্য। এই প্রোটিন্ পদার্থের অভাববিশিষ্ট আমাদের ডাল-ভাত ইত্যাদি ভারী খাদ্য জিনিষ ভোজনের জন্যই আমাদের দেশীয় ব্যক্তিগণ সাংসারিক জীবনে নিশ্চেষ্ট ও স্ব স্ব জীবনের উন্নতি সাধনে বিরত হইয়া পড়িয়াছেন !”

মাংসে নাইট্রোজেনস্ পদার্থ সর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় এবং ফল ও উদ্ভিজ্জ খাদ্যদ্রব্যে নাইট্রোজেনের ভাগ অতি সামান্য মাত্রায় থাকায় আজকাল, কোন কোন পণ্ডিতের মতে, ইহার নিত্য ব্যবহার শরীর বর্ধন ও পোষণের জন্য একান্ত আবশ্যক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের (Yale University) অধ্যাপক চিটেন্ডেন্ (Chittenden) সাহেব বলেন যে, “যাহারা মাংসাহার করে, তাহারা প্রায়ই প্রয়োজনতিরিক্ত নাইট্রোজেনস্ খাদ্য ভোজন করিতে বাধ্য হয়, সুতরাং উহা শরীর পোষণের সহায়তা না করিয়া

অসুস্থতা এবং রোগের সৃষ্টির কারণ হইয়া পড়ে।” তিনি আরও বলেন যে, অতিরিক্ত মাংসাহার ও নাইট্রোজেনস্ খাদ্যাহার জন্য, শরীরে fermentation অর্থাৎ গাঁজলান ভাব সঞ্চার আরম্ভ হয়, এবং উহা খাদ্য পরিপাক ও শরীর পোষণের সাহায্য না করিয়া, খাদ্যপদার্থকে বিকৃত করিয়া দেয়। সুতরাং পরিপাকের পরিবর্তে নানাপ্রকার পচনক্রিয়া অন্তর্য্যে আরম্ভ হইতে দেখা যায়। অন্তর্য্যে অবস্থিত ক্ষুদ্র

মাংসাহার প্লেগের প্রতিবন্ধক নহে । ২৪৩

কীটাক্ত (germs) এবং মাংসাদি আহার্য পদার্থ সহ, শরীর-
ভ্যন্তরে নীচ কীটাক্তগণের কার্য বাহুলা হেতুই ঐ ferme-
ntation ক্রিয়া আরম্ভ হয় জানিতে পারা গিয়াছে ।

ডাঃ অসলার (Osler) বলেন যে
এই fermentation ক্রিয়া মৃত্যু-
মাংসাহারের দোষ

দেহের পক্ষে বিশেষ হানিকরক : কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে,
(plague) প্লেগ বহু শতাব্দী যাবৎ চীন, পারস্য, ভারতবর্ষ
প্রভৃতি প্রাচ্য জাতির মধ্যেই অধিকতবে হইতে দেখা যাই-
তেছে । এই সমুদয় জাতি বিশেষ প্রকারে অন্তোভাজী : মাংসের
হৃৎস্পন্দতা এবং কতক বা ধর্মবিশ্বাস জন্তও, অতি স্বল্প-
মাত্রায় উহারা উহা আহার করিয়া থাকে, সুতরাং মাংসাহার না
করাই যে, উহাদের মধ্যে প্লেগ্ আক্রমণের আধিক্যের

বিশেষ কারণ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই । ইহারা বলেন
যে, মাংস আহার করিলে শরীরে রোগপ্রবণতা বাধা
প্রাপ্ত হয়, কাজেই প্লেগ্ অথবা অত্র কোন সংক্রামক ব্যাধি
আসিয়া দেহ আক্রমণ করিতে পারে না ! আমেরিকা গবর্ণ-
মেন্টের বিশেষ নিয়োজিত ডাঃ ব্লু (Blue) সানফ্রান্সিস্-
কোতে যেতাজগণের মধ্যে, প্লেগের আক্রমণ সঙ্ঘট্ট তথা নিরু-
পণ কালে,কিন্তু পূর্বোক্ত মহামার্যগণের অসুস্থিতির ভ্রম দেখাইয়া
দিয়াছেন ! তিনি বলেন যে, মাংসাহার এ রোগের প্রতিবন্ধক

নহে !! অধিকন্তু ডাঃ কেলগ (Dr. Kellog) বলেন যে, প্লেগ
বস্ত্ততঃ ম্যুংসহারীগণেরই পীড়া ; কারণ ইন্দুর মাংসাহারী.
সর্বপ্রথমে এই রোগে সেই আক্রান্ত হয় ; তার পর flea

(এক প্রকার মাছ) মাংসাহারী না হইলেও রক্তশোষক ; ইন্দুর হইতে পীড়া ইহার নিজ শরীরে সংক্রামিত করিয়া, মৃত্যুদ্বাদেহে বহন করিয়া দেয়। বাহারা মাংস আহার না করে, তাহারা এ রোগের আক্রমণ হইতে নিস্তার পায় না। বটে, কিন্তু বাহারা মাংসাহারী তাহারা ই যে সহজে ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উঠে, তাহার প্রমাণ বহু দেখাইতে পারা যায়। ইহার কারণ এই যে, মাংসভোজী অপেক্ষা নিরামিষভোজীরা ক্লান্তি দমনে বিশেষ পটু বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং রোগপ্রবণতার প্রতি-
বিধানে নিরামিষভোজীরা ই যে অপেক্ষাকৃত সমর্থবান ইহা জানা যাইতেছে।

এ বিষয়ে আরও বিশেষ প্রমাণ দেখাইবার জন্ত আমরা Popular Science shifting পত্রে A. wagner সাহেব বাহা লিখিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—আমেরিকাবাসীরা দীর্ঘকালব্যাপী পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, বল ও সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে মাংসভোজী অপেক্ষা উত্তীর্ণ ভোজীরা ই শ্রেষ্ঠ ; বীরত্ব, সাহস বা ক্লেশসহিষ্ণুতা ও দীর্ঘজীবন লাভ, কোনটিই মাংসভোজীর একচেটীয়া monopoly নহে, উপরন্তু দীর্ঘকালব্যাপী গুরুতর পরিশ্রমের জন্ত শরীরাজাতীয় ঋণ, মাংস বা প্রোটিন্ জাতীয় ঋণ অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। সৈন্তগণের বহুদূর গতির long-march সময় পরীক্ষিত হইয়াছে যে, বাহারা শরীরাজাতীয় ঋণ ভোজন করে, তাহারা ই অল্পে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে পারে ; মাংসভোজীরা

২৪ জন্য ব্যতীত কেহই তেমন পারে ন্ম। মস্তপায়ীর শু
কথাই নাই !

ব্যবহারব্ধি প্রত্যক্ষ বাহ্য দেখা যাইতেছে, তাহা
অপেক্ষা কি শারীরতত্ত্বব্ধি কতকগুলি কারণের ওরূপ অধিক
প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে ? সভ্যজগতের সমস্ত
নিরামিষভোজীর অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, অনা-
য়াসেই Dr. Mc. Cay প্রভৃতি মাংসভোজন পক্ষপাতীগণের
বিষয় ভ্রম উপলব্ধি হইবে। নিরামিষভোজীদিগের শরীর
রোগপ্রবণ হওয়া দূরে থাকুক, আমিষভোজীদিগের অপেক্ষা
তাহারা অধিক রোগমুক্ত ও স্বাস্থ্যসুখ অধিক মাত্রায় উপভোগ
করিয়া থাকে। ভারত, জাপান, চীন, তুর্ক প্রভৃতি দেশের
নিরামিষাশী শ্রমজীবীগণের দৈনিক উপযোগীতা সম্বন্ধে অনু-
সন্ধান করিলেই ইহার সত্যাসত্য সহজেই অবগত হইতে
পারা যাইবে।

আমিষ ও নিরামিষের বন্দ ছাড়িয়া দিয়া একবার ভাবিয়া
দেখা উচিত যে, প্রকৃতি মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্য কি প্রকার
স্থির করিয়া দিয়াছেন ? মেট্‌চিনকফ, ফটোর, গট্‌য়ার Gautier
চিটেন্ডেন, ফ্লেচার প্রভৃতি মনীষিগণ জগতের বিভিন্ন অংশে
বিক্ষিপ্ত থাকিয়া, খাদ্য সম্বন্ধে যে গভীর গবেষণা ও অনুসন্ধান
করিতেছেন তাহার উদ্দেশ্য এই যে, (১) স্বাভাবিক পক্ষে
মনুষ্যের প্রকৃতি নির্দেশিত আহাৰ্য্য কি ? (২) কোন আহাৰ্য্য
পদার্থ মনুষ্যের পরিপাক যন্ত্রের বিশেষ উপযোগী হইয়া, তাহার
শারীরিক অভাব পরিপূরণ করিতে সমর্থ হইবে ? (৩) কি

দব্য আহার করিলে, তাহার অধিকাংশ সাক্ষাৎ পরিত্যক্ত

হইয়া, স্বল্প অসাড়রূপে বহিনির্গত হইতে পারে । এই সকল বিষ-
য়ের নিরূপণ লইয়াই তাঁহার। বাস্তব, সুতরাং আমিষ-নিরামিষ
লইয়া বিবাদে তাঁহার। রাজী নহেন ! আহার্য পদার্থ যাহাই
কেন হউক না, কোন প্রকারে শরীরের
অনিষ্ট সাধন না করিয়া, উহার পুষ্টি-
সাধন কার্য সমাধা করিলেই যথেষ্ট ।

মনুষ্যের স্বাভাবিক
খাদ্যাহার

এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ হইতে পারে না ; সুতরাং
যাহাতে রোগের উৎপত্তির সম্ভাবনা এমন ঋণ্য অবশ্যই বর্জ-
নীয় ! মনুষ্যের স্বাভাবিক আহার্য পদার্থ যে কি, তাহা
নিরূপণ করিতে হইলে, উহা দুই ভাবে করা যাইতে পারে,
যথা ।—(১) অজ্ঞাত জন্তুর সহিত তুলনায় কোন জাতীর সহিত
ইহার অধিক সাদৃশ্য তাহা দেখিতে হইবে (২) নানাপ্রকার
খাদ্যপদার্থের গুণাগুণ তুলনায় কোনটি বিশেষ উপযোগী

তাহা স্থির করিতে হইবে । খাদ্যপদার্থের দিক দিয়া দেখিতে
গেলে, জন্তু সমুদয়কে ৪ শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারা যায়,
যেমন, (১) হার্ভিভোরা Herbivora অর্থাৎ বাহার। বাস
পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে—গরু, ছাগল ইত্যাদি প্রকৃত
উদ্ভিদভোজী জীব । (২) কার্ণিভোরা Carnivora অর্থাৎ
মাংসাশী—যেমন কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি । (৩) অম্নিভোরা
Omnivora অর্থাৎ মিশ্র (আমিষ ও নিরামিষ) পদার্থ
ভোজী—যেমন শূকর ইত্যাদি (৪) ফ্রোগিভোরা Frogivora
অর্থাৎ বাহার। ফল, মূল, শাকাদি খাইয়া প্রাণধারণ করে—যেমন

সিম্পানীজ, বানর, আউরাংউটাং ইত্যাদি। এই চারি শ্রেণীর জীবের পরিপাকযন্ত্রীয় গঠনপ্রণালী বিশেষরূপে বিভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যের শরীরবিধানের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ইহা শেষোক্ত প্রকারের সহিত বিশেষ সাদৃশ্যযুক্ত এবং অপর তিন প্রকারের সহিত বিভিন্ন। ফল এবং শস্যভোজী জীবের দন্তগঠন, উহার সাজান প্রণালী এবং দন্তের এনামেল (enamel) মনুষ্যের দন্তের সহিত একই প্রকারের; কিন্তু অল্প তিন প্রকারের জীবের সহিত ইহার কোনই সাদৃশ্য দেখা যায় না।

পরিপাকযন্ত্রীয় নলের দৈর্ঘ্য তুলনা করিলেও দেখা যায় যে, চার্কিভোরায় উহা শরীরের দৈর্ঘ্যানুযায়ী ৩০ গুণ রুহৎ (নাসি-কার অগ্রভাগ হইতে মেরুদণ্ডের প্রান্তসীমা পর্যন্ত পরিমাপে), কার্নিভোরায় ৩ গুণ, অর্নিভোরায় ১২ গুণ এবং ফ্রিগিভোরায় ১২ গুণ রুহৎ দেখা যায়। মনুষ্যের পাকপথের নল পরিমাপেও দেখা গিয়াছে যে, উহা শরীর অপেক্ষা ১২ গুণ লম্বায় অধিক; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতি মনুষ্যকে ফল ও শস্যভোজী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। শরীর মধ্যে মাংস অতি সঙ্করে বিকৃত হইয়া যায় বলিয়াই, প্রকৃতি

মাংসভোজীগণের পাকপথের নল . অননলীর দৈর্ঘ্য।
দৈর্ঘ্যে অপেক্ষাকৃত স্বল্পতর করিয়া সমালোচনা।

রাখিয়াছেন; কারণ যত সত্তর উহা শরীরবিধান হইতে বহি-
গত করিতে পারা যায় ততই মজল। মনুষ্যের পাকপথের
নল যে দেহ অপেক্ষা ১২ গুণ লম্বা, ইহা দেখিয়াই মনুষ্য যে
প্রকৃতই মাংসভোজী নহে তাহাও স্থির করিতে পারা যায়। মাংস

ভোজী অন্যান্য প্রাণীগণের শরীরে যে, নানাপ্রকার রোগের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণও এই জানিবে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অধিক সময় শরীরবিধান মধ্যে মাংস পাকিতে বাধ্য হইয়া, সহজেই বিকৃত হইয়া পড়ে এবং তাহা হইতেই রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে ।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহা দেখিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্য মাংস নহে এবং ফল মূল, শস্ত, শাক-সব্জী ইত্যাদিই তাহার প্রকৃতি নির্দেশিত খাদ্য ।

শিশুর স্বাভাবিক খাদ্য দুগ্ধ ; প্রকৃতি শিশুর জন্য এই খাদ্য নিরূপণ করিয়াই, তাহার পাকপথের যন্ত্রাদি তদবস্থায়, সেই প্রকারের উপযোগী । করিয়া রাখেন । কিন্তু উহা পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে স্বাভাবিক খাদ্য নহে (ইহার কারণ পূর্বে দেখান হইয়াছে ২১৮ পাতা দেখ) । ভাল খাঁটি দুগ্ধ প্রকৃতই উপকারী খাদ্য ; ইহার গুণের সহিত মৃত জন্তু আদির বিকৃতভাবাপন্ন

মাংসের কোন তুলনাই হয় না । মনুষ্যের খাদ্যাদি জন্তু স্থিরী-কৃত্তপদার্থাদি, যেমন ময়না, ডাইল, চাউল, ফল মূল, ইত্যাদি হইতেছে শক্তি-সঞ্চয়কারী (energy storing) organism কিন্তু অন্তদিকে মাংস হইতেছে শক্তি-ক্ষয়কারী (energy-consuming) organism ।

শক্তির এই consumption ক্ষয় (যাহা শরীরের অক্সিডেশনের oxidation ফলে সংঘটিত হইয়া থাকে) সহিত এক প্রকার ছাই (ash) অথবা নষ্টীভূত (waste) পদার্থ গঠিত হইয়া থাকে ; মাংসে ইহা (এই নষ্টীভূত পদার্থ)

Saturated বিগলিত অবস্থায় থাকিতে দেখা গিয়াছে যতদূর

এই পদার্থ ভোজন করিলে, উই। জীবন-

যন্ত্রীয় (vital-machinery) কার্যে,

মাংস রোগের উৎপত্তি

কারণ কেন ?

বাধা প্রদান করিয়া, দেহস্থ ক্রিয়া

সকল বিপর্যাস্ত করিয়া দেয় ; ইহার ফলে গাউট (Gout),

বাত, কিডনী এবং হৃদরোগ সমুদয়, সংজ্ঞাস ও অজ্ঞান আরও

নানা প্রকার আয়ুর্বিদ্য গোলযোগ সংঘটিত হইতে দেখা যায়।

প্রকৃতি নির্দেশিত খাদ্যই আমাদের শারীরিক ও মান-

সিক অবস্থায় সুস্থতা রক্ষা করিয়া, উপযুক্তভাবে জীবন যাত্রা

নির্বাহ করে সম্পূর্ণ সক্ষম। পুরাতন অনুসন্ধান দেখিতে

পাওয়া যায় যে, জগতের সমুদয় প্রাচীন

জাতিই, য য সমুদয় সময়ে, নিরামিষাশী

প্রাচীন ভারতীয় সাক্ষ্য

ছিলেন ; পরে যেমন বিলাসিতা, ধনশালীতা এবং অলসতা ক্রমশঃ

বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তখন তাহারা আপনাদের সাদাসিধে

জীবন পরিত্যাগ করিয়া, মাংসাহার আরম্ভ করেন এবং তাহা-

তেই তাহাদিগের পূর্বকালীন শারীরিক ও জাতীয় জীবনের

হ্রাস হইতে লাগিল। অতএব যে সমুদয় জাতি অত্যাধিক

মাংসভক্ষক, তাহারাই যে বিশেষ লক্ষিত রূপে শারীরিক অধঃ-

পতন দিকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে তাহা সর্ববাদী

সম্মত। আমাদের এই কথার প্রমাণ স্বরূপ ইংলণ্ডের

ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল কমিটির রিপোর্ট, আমেরিকার শত-

ব্যক্তির কমিটির রিপোর্ট এবং ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি স্থানেরও

এ প্রকার কমিটির রিপোর্ট আমরা সকলকে পাঠ করিতে

অনুরোধ করি। সাদাসিধে স্বাভাবিক খাদ্যই যে সর্বশ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে আমাদের অধিক বলিবার আবশ্যক করে না, কারণ বিজ্ঞান এবং আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞানই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সন্দেহা দোষণ করিতেছে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, কোন প্রকার বাদান্তবাদের মধ্যে না বাইয়া, নিয়ত চক্ষের উপর বাহ্য দেখিতে পাইতেছি তাহাতে মাংসাহারের বিপক্ষেই মত ও প্রবৃত্তি যাওয়ার কথা। একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বাজারে বিক্রীত কসাইখানার মাংস প্রায়ই স্তূত জন্তর পাওয়া যায় না ; এবং আপাততঃ দেখিতে ঐ মাংস স্তূত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে উহা দোষশূণ্য কি দোষযুক্ত তাহা সহজে জানিবার উপায় নাই বলিলেও চলে। রোগদুষ্ট, বিষদুষ্ট, মৃত অথবা ক্রুশ জন্তর মাংস আহারই যে, নানাপ্রকার দূসাধা ও ক্লেশদায়ক রোগের উৎ-

পাত্ত কারণ তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

আমাদের মত

সমুদয় সভ্যজগতের স্বাভাৱ্য পরীক্ষক

মহোদয়েরা বৎসর বৎসর কালিত রিপোর্টেও ইহার সত্যতা ঘোষণা করিতেছেন দেখিতে পাইবে। কাণ্ডজ্ঞান বিবক্ষিত মাংসবিক্রেতারগণ আবার, সুবিধা পাইলেই অপরাপর জন্তর মাংস মিশাইয়া ব্যবসায় লাভবান হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে দেখা গিয়াছে। দেশকাল পাত্রভেদে মনুষ্য যে সকল-প্রাণীর মাংসই ভুঞ্জিয় সহিত ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাও দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু বিভিন্ন দেশের লোকের সহিত আমাদের এ প্রবন্ধের কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা আমাদের

মাংসাহার ও শাক্ত-বৈষ্ণবের প্রকৃতি । ৫১

দেশীয়গণের স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যেই যাহা বলা প্রয়োজন মনে করি তাহাই বলিতে চাহি।

আমিষ ও নিরামিষের গুণাগুণ বর্ণনা করিয়া বুঝা গ্রহ কলেবর আর বর্ধিত করিতে চাহি না; তুলনায় যতদূর দেখা গিয়াছে তাহাতে আমরা কোন ক্রমেই বলিতে পারি না যে, নিরামিষ আহারে শরীরে বলসঞ্চয় হয় না বা ক্ষেমাশক্তি বর্ধিত হইতে পারে না। মাংসাহারে যে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সমূহ রুদ্ধ এবং উত্তেজিত হইয়া থাকে ইহার প্রমাণ হিন্দুর মধ্যেই শাক্ত ও বৈষ্ণবে বেশ লক্ষিত হয়। বৈষ্ণবগণ প্রকৃতিতে নিরীত বলিয়া যে, মানসিক বৃত্তি সমূহে শাক্ত অপেক্ষা অপরূপে তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না। প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের কথা অথবা তৎসাময়িক হরিভক্তিপদায়ণ মহানুভবগণের দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া দিলেও, আধুনিক সময়ের প্রভুপাদ ৬ বিজয়রূপ গোস্বামী প্রভৃতি যত বা জীবিত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণকে মানসিক বৃত্তিতে কাহা অপেক্ষা নিকট বলিতে পারা যায়? মাংসভোজনে প্রকৃতির কৰ্কশতা উৎপন্ন হয় একথা যদি কেহ নৃক্তি ও প্রত্যক্ষ দর্শন সবেও মানিয়া লইতে না চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মনস্তত্ত্বের জ্ঞান, আমরা ঐ মত বাক্যকে ভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করিতেও পারি,—যেমন কৰ্কশ ও রুদ্ধ প্রকৃতির লোকই মাংসাদি ভোজনের উপযোগী। সকল মনুষ্যের প্রকৃতি কখনই এক প্রকারের হইতে পারে না। তাই বোধ হয় শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির বিভিন্নতাকেই লক্ষ্য করিয়া, হিন্দুসমাজে বৈষ্ণব ও শাক্তভেদে, আমিষ আহারের

ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে । হিন্দু ব্যবস্থাকারক শুদ্ধমাত্র মাংস ভোজন
নের ব্যবস্থা মনুষ্য প্রকৃতি দেখিয়া করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ! পাছে
পূর্ব বর্ণিত প্রকার, রোগদৃষ্ট, বিষদৃষ্ট, ^{হিন্দুর মাংসাহার ব্যবস্থা}
কৃশ অথবা অভোক্ষ্য বা অস্পৃশ্য জন্তুর

মাংস লোকে খাইতে অরিস্ত করে, তাই বিধি করিয়া দিয়া-
ছেন যে, “বৃথা মাংস” আহার না করিয়া, দেবতার উদ্দেশে
বলি প্রদান করিয়া তবে উহা আহার করিতে পারি। দেব-
তার নিকট বলি দিতে হইলেই, উহা সবল, বলিষ্ঠ এবং নীরোগ
দেখিয়া দিতে হইবে। পাটা, হরিণ এবং ভেড়া ব্যতীত অন্য
জন্তুর মাংস হিন্দুর চারিবারের কেহই স্পর্শও করে না দেখিতে
পাইনে, সুতরাং যাহা তাহার মাংস হিন্দুর শাক্তগণও, জগতের
অন্যান্য জাতির জায় অবাধে ভোজন করেন না দেখিতে
পাইবে। হিন্দু শাস্ত্রকারগণের ব্যবস্থিত “যজ্ঞার্থে পাশবো
সৃষ্টঃ” বুক্তির বলে শাক্তগণ যে প্রত্যকে আপনাদিগের উদর
ভূগ্ণির জন্ত, অথবা প্রাণীনাশ করিয়া থাকেন তাহার প্রতিকূলেও
অগ্নয়র বুক্তি দেখাইতে পারি। আত্মশক্তি জগৎজননীর
তৃত্বার্থে, উপাসনার সময় আপনাপন দেহস্থ পশুরূপ বড়রিপুর
বলিপ্রদান করিবার ব্যবস্থাই সম্ভবতঃ শাস্ত্রোক্ত প্রকৃত উদ্দেশ্য !

কিন্তু মাংসাহারে ইচ্ছুক কোন মহাত্মত্ব কর্তৃক স্বার্থ সিদ্ধির
জন্ত যে আধুনিক বিকৃত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নাই তাহা
কে বলিতে পারে ? “অহিংসা পরমো ধর্মঃ” যে দেশের
অবতারের মুখনিঃসৃত বাণী, সে দেশের নরনারীগণ পরোক্ষে
স্বার্থ জিতার্থে হইলেও, প্রত্যকে আত্মভূগ্ণির জন্ত যে অথবা

পশু বধ করিতে ব্যবস্থা করিতে পারে, তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। তবে জগতের ক্রমবিকাশ (evolution) বিয়তী অমুখ্যায়ী বা দেশকাল পাত্রভেদে যে, প্রাচীন ব্যবহার পরিবর্তন হইতে পারে* এবং হইয়াও থাকে তাহা আমরা স্বীকার করি। স্মৃতিরাজ আধুনিক সময়ে, একেবারে নিরামিষ ভোজনই যে করিতে হইবে অথবা উহাই করা কর্তব্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না। দ্রব্য বিশেষের গুণাগুণ জ্ঞাত থাকিয়া এবং স্বাস্থ্য রক্ষণোপযোগী নিয়মাবলী মানিয়া, প্রযুক্তি অমুখ্যায়ী মনুষ্য নিজ নিজ আহারের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারেন। কবি বলিয়াছেন “ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ” স্মৃতিরাজ সর্ব-বাদী সন্নত রূপে সকলের জন্য একই ব্যবস্থা হইতে পারে না।

আজকাল রোগীর পথ্যরূপে অনেকেই মাংসের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা অনেক সময় পথ্যের পরিবর্তে অপথ্যের কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া থাকে জানিবে; কারণ মাংসের মধ্যে জন্তুদিগের শরীরজাত বিবিধ দূষিত পদার্থ (Excrementitious matter) অস্বাভিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। উহাদিগকে পৃথক করিয়া মাংস-পথ্য প্রস্তুত-করণের কোন উপায় নাই। ইহা ব্যতীত টোমেন (Ptomain নামক এক প্রকার বিবাক্ত পদার্থ অনেক সময় মাংসের মধ্যে আপনা হইতে উৎপন্ন হয়। এরূপ মাংস বা মাংসের কাষ রোগীকে খাওয়াইলে পথ্যের পরিবর্তে বিষের কার্য্যই করিয়া থাকে। সময়ে সময়ে এই টোমেন বিবাক্ততা হইতে নিবৃত্তি

রোগে মাংস পথ্য

অব্যবস্থা

ভোজনকারীগণের মধ্যে অধিকাংশকেই, কলেরা বা সেই প্রকারের বিষম পীড়ার আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি ইউরোপে একস্থানে এই প্রকারে ৩০০ শত ব্যক্তি আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া, বিশ্বদূত রয়টার (Reuter) সংবাদ দিয়াছেন। কিন্তু উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতে প্রস্তুত করা পথ্যে ঐরূপ বিপদের কোন আশঙ্কাই থাকে না। বিশেষতঃ আমাদেৱ এই উষ্ণপ্রধান দেশে মাংসের কাথ অতি সহর বিরূত (decomposed) হইয়া যায়, স্ততরাং উহা অধিক সময় যাবৎ রাখিয়া পথ্যরূপে ব্যবহার করা চলে না। কিন্তু আমাদেৱ দেশস্থ অধিকাংশের অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায়, অনেক সময়ে তাঁহারা ঐ বিরূত কাথই রোগীকে সেবন করাইয়া থাকেন; ইহাতে রোগীর উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে চিকিৎসকেরও দুর্গাম বটিয়া যায়।

আমরা দেখিয়াছি যে বাত, কার্কস্কল, যকৃত স্ফোটক, ফিডনীর পীড়া, ক্যান্সার, অপেন্ডিসাইটিস্, বহুমূত্র, প্রভৃতি পীড়া অতিরিক্ত মাংসাদি ভোজনে হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়, সেই জন্য ঐ সমুদয় রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে মাংস পথ্য একেবারেই দেওয়া উচিত নহে। মাংসের ঘুষ না থাইলে শরীরে যে বলাধান হইতে পারে না একথা বথার্থ নহে। যদি একমাত্র মাংসই শক্তি সঞ্চয়ের উপযোগী হইত, তাহা হইলে পূর্বতন এবং আধুনিক যন্ত্র ও কুস্তীগীরগণ মাংস বর্জন করিয়া ছোলা (সিদ্ধ ও ভিজা), মাখন, ঘৃত, দুগ্ধ, বাঙ্গাম, পেস্তা

মাংসাহারে কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মায় । ২৫৫

প্রভূতি মেওয়া ফল খাইত না! বাগ্মিয়ক্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শীগণ মাখন ও শর্করাজাতীয় খাদ্যই অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিয়া থাকে; বর্তমানে প্রফেসর'রামমূর্ত্তা প্রভৃতি বিখ্যাত বলবানেরাও মাংসভোজন করেন না। তবে মাংসই যে শরীরে বলাধানে শ্রেষ্ঠ তাহা কেমন করিয়া বলিতে পারি! অন্তপক্ষে মাংসাহারে কোষ্ঠবদ্ধতার প্রবণতা দেখা যায়—রোগের সময়ে অথবা তাহা হইতে আরোগ্যের মুখে যদি কোষ্ঠপরিষ্কারই না হয় তবে ক্লেশ হইবে কোথা হইতে? ক্লেশ বোধ না হইলে আহারই বা করে কি প্রকারে? সুতরাং উহা বলাধানের কারণ না হইয়া, পরোক্ষে বলহানির কাণাই করিয়া থাকে। আমরা পূর্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি যে, মাংস মানবের স্বাভাবিক খাদ্য নহে এবং এখন দেখাইতেছি যে উহা প্রকৃত প্রস্তাবে অতুষ্ণ স্বাস্থ্যপ্রদায়ক খাদ্যও নহে। তবে রোগীর প্রকৃতি ও প্রকৃতি দৃষ্টে, সময়ে সময়ে (বিশেষ আপত্তিজনক স্থল ভিন্ন অত্যন্ত স্থলে) সামান্য পরিমাণ মাংসের কোলের ব্যবস্থা চলিতে পারে। এইরূপ স্থলে আমরা অনেক সময় মাংসের কোলের পরিবর্তে, ছোট ছোট মংসের কোলই ব্যবস্থা করিয়া থাকি। (ইহার বিষয় পূর্বে মংস্ত ও মাংসের শুণাশুণ বর্ণনা স্থলে বলিয়া আসিয়াছি)। অজীর্ণ রোগাক্রান্তের পক্ষে মাংস কখনই ব্যবস্থ্যয় নহে জানিবে।

যে দিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, বিগত কাল অপেক্ষা অধুনা মাংসাহার পরিবর্জন করার অতুষ্ণেই সুক্তি অধিক দৃষ্ট হয়; কারণ :—

১। রোগের প্রভাব :—জন্ম সকল নানা কারণে বিশেষ পীড়িত হইয়া পড়িতেছে দেখা যায় ; তাহাদের মাংস আহারে আমাদের শরীরেও রোগের বৃদ্ধিপ্রবণতা দেখা যাইতেছে এবং তাহাতেই অকাল, মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে ।

২। মাদকতার প্রভাব :—মাংস মাত্রেই অল্পাধিক মাত্রায় উত্তেজক ; সুতরাং উহার ব্যবহারে সমাজে মাদকতার পরিবৃদ্ধি লক্ষিত হয় ; মাংসাহারে রিপু সমুদয় বিশেষভাবে উত্তেজিত হয় দেখিতে পাইবে ।

৩। অতিরিক্ত আহারের প্রভাব :—মাংসাহারই ইহার প্রধান সহায় ; সকলেই জানেন যে কতকগুলি নিরামিষ তরীতরকারী খাওয়া অপেক্ষা, আমিষযুক্ত খাদ্যাদিই অধিক মুখরোচক, সুতরাং ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, লোকে খাইতে ভাল লাগিতেছে বলিয়া অধিক খাইয়া ফেলে ।

৪। পানি এবং চরিত্রহীনতার প্রভাব :—মাংস আহারই ইহার পরিসর বৃদ্ধিকল্পে প্রধান অবলম্বন জানিবে ।

৫। হত্যা এবং উত্তেজনার প্রভাব :—পণ্ডহনন এবং তাহার মাংস ভক্ষণ করায়, মানবের অন্তঃকরণ কঠিন ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, উহাতে তাহাদের উন্নত (Finer) মনোভাব (Sensibilitis) সকল বিনষ্ট করিয়া দেয় এবং তাহাতেই পাপাশুচরণ ও হত্যাশূচ্যাদি কার্যে প্রবর্তনা আপাইয়া দেয় ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অজীর্ণ রোগীর প্রতি উপদেশ ।

অজীর্ণতা অথবা ডিম্পপ্‌সিয়া অধুনা সহর বাসীগণের (মফঃস্বলেও) মধ্যে শনৈঃ শনৈঃ এত বর্ধিত হইতেছে যে, এ বিষয়টির উপর যাহাতে সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাহা চিকিৎসকমাত্রেয়ই করা আবশ্যক। ঔষধ অপেক্ষা পথ্য ও আত্মযত্নিক কতকগুলি স্বাস্থ্যসংক্রমীয় নিয়ম পালনই ইহার প্রধান প্রতিকারের উপায় বলিয়া আমরা পরীক্ষায় জানিতে পারিয়াছি।

নিম্নলিখিত নিয়ম কয়টি পালন করিলে, (অবশ্য যথাযথভাবে) অজীর্ণরোগী যাত্রেই অচিরে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইবেন :—

১। ধীরে ধীরে খাইবে;—আহার্য্য দ্রব্যগুলি যাহাতে সম্পূর্ণভাবে চর্কিত হয় সে পক্ষে দৃষ্টি রাখিবে, এমন কি সুস্থাবস্থায় যেরূপ প্রয়োজন তদপেক্ষাও (সম্ভব হইলে) অধিক চর্কণ করিবে। যে জিনিষে চর্কণ তেমন প্রয়োজন হয় না, তাহা সাধ্যমত পরিত্যাগ করিবে বা অধিক খাইবে না। স্বাস্থ্যপদার্থ মুখগহ্বরে যত অধিক সময় থাকিবে, পাকস্থলীতে বাইয়া হজম হইতে উহার ততই অল্প সময় লাগিবে।

২। আহারের সময় জল খাইবে না;—খা

পদার্থ যদি বিশেষ কঠিন প্রকারের হয়, তাহা হইলে ভোজন শেষ করিয়া ২১২ টোক খাইতে পার, অথবা আহারের অন্ততঃ আধ ঘণ্টা পরে, পূর্ণ এক গ্লাস জল খাইতে পার ।

৩। সাধারণতঃ অজীর্ণরোগীর পাকস্থলীতে, অধিক তরল পদার্থ মিশ্রিত খাদ্য অপেক্ষা কঠিন খাদ্যপদার্থ সহজে হজম হইয়া যায় ।

৪। আহাৰ্য্য পদার্থ যেন অত্যধিক, গরম বা অত্যধিক শীতল না হয় ;—শরীরের সম উত্তাপবিশিষ্ট খাদ্যপদার্থই খাওয়া কর্তব্য । আহারের পরই শরীরে ঠাণ্ডা লাগাইবে না (আমাদের দেশে শীতকালে) ।

৫। প্রয়োজনানুসারে আহার করিবে না ;—পরিপাকশক্তি স্বল্প হইলে সময়ে সময়ে প্রয়োজনানুসারে কম খাইবে । অধিক আহার করিলেই যে, বলবান হইতে পারিবে তাহা মনে করিও না, যে টুকু পরিপাক হইবে তাহাতেই বলাধান হয় জানিবে !

৬। দিবা রাত্রির মধ্যে দুই বারের অধিক আহার করিবে না এবং রাত্রির আহার অপেক্ষাকৃত কম করিবে । অজীর্ণ রোগীর পক্ষে এই দুইবার আহারই যথেষ্ট ।

৭। নির্দিষ্ট দুইবার আহারের মধ্যে সামান্য পরিমাণেও কোন জিনিষ খাইবে না ।

৮। আহারের ঠিক পূর্বে বা পরে কোন প্রকার ভীষণ মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম করিবে না । আহারের পরই নিদ্রা বাওয়াও কর্তব্য নহে, অন্ততঃ এক বা অর্ধ ঘণ্টা গল্পগুজব বা চিন্তাকর্ষক গল্পের পুস্তকাদি পাঠ করা কর্তব্য ।

অজীর্ণ রোগীর প্রতি উপদেশ । ২৫৯

শারীরিক অথবা মানসিক পরিশ্রমে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া কখনও আহার করিবে না ।

১০। কোন প্রকার মানসিক বিকার অবস্থায় (যেমন রাগ, ঘেব, কলহ, হিংসা বা গভীর চিন্তা) আহার করা উচিত নহে ।

১১। যাহা সহজে পরিপাক হয় কেবলমাত্র তাহাষ্ট আহাৰ করিবে ; নানা দ্রব্য সংযোগে প্রস্তুত করা, যে দ্রব্য সহজ পরিপাচ্য নহে তাহা স্পর্শ করিবে না । এক সঙ্গে ৩৫ প্রকারের জিনিষ ব্যতীত, নানা প্রকারের জিনিষও আহাৰ করিবে না । লেনু প্রত্যহ খাইবে ।

১২। কোন দ্রব্য আহাৰ করা উচিত কিনা তাহা পূর্বে স্থির করিয়া রাখিবে ; আহাৰ করিতে বসিয়া এ বিষয়ের চিন্তা করিও না ; আহাৰের সময় সর্বদা যদি তোমার মনে থাকে যে, হয়ত হইতে আমার অন্ত্র কঠিন হইতে পারে, তাহা হইলে জানিবে যে, উহা আহাৰে নিশ্চয়ই তোমার অন্ত্র কঠিন হইবে । আহাৰের সময় ভবিষ্যৎ কষ্টের কথা মনে করিও না ; প্রকৃত চিন্তে যাহাতে আহাৰ করিতে পার তাহাই করিবে ।

১৩। যে দ্রব্য আহাৰ বিষয়ে মনে সন্দেহ হইবে তাহা আহাৰের পূর্বেই পরিবর্জন করা কর্তব্য ।

১৪। চিকিৎসক অপেক্ষা পথ্যই রোগ আরোগ্য করণে বিশেষ উপযোগী ; পথ্য, বিশ্রাম এবং প্রকৃত্যাই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক জানিবে

১৫। আহারের সময় সাধামত একটি নির্দিষ্ট রাধিবে,
কদাচ তাহার ব্যতিক্রম করিও না। উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত
ব্যবস্থিত খাদ্য ভোজন করিবে, তাহা হইলে আর চিকিৎসকের
শরণাপন্ন হইতে হইবে না।

১৬। যুক্তি এবং বিবেচনার শাসনে ক্ষুধাকে রাধিবে ; যখনই
ক্ষুধা পাইল তখনই খাইলাম" এরূপ করিলে অজীর্ণ রোগীর
চলিবে না। ক্ষুধানিগ্রহিত করাই মনুষ্যের চরম উদ্দেশ্য নহে।

১৭। কোন আহার সহ্য হইবে, কোন আহার সহ্য হইবে
না, ইহা কেহ কোন অজীর্ণরোগীকে বিশেষ ভাবে স্থির করিয়া
দিতে পারে না ; ইহা দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন রোগীতে
বিভিন্ন জিনিষ সহ্য হয় না। একজনের যাহা সহ্য হয়, অন্যের
হয়তঃ তাহা হয় না, সুতরাং আহাৰ্য্য বিচার করার ভার নিজের
উপর রাধিতে হইবে (অবশ্য দ্রব্যাদির গুণাগুণ অবগত
থাকিয়া)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :- এ বিষয়ে আমাদের নিজের অভি-
জ্ঞতা হইতে কয়েকটি কথা বলিবার আছে। অনেক অজীর্ণ
রোগী, আহার করিয়া পাছে পরিণামে কষ্টভোগ করিতে হয়,
এই ভয়ে একরূপ সমুদয় খাদ্যপদার্থ পরিবর্জন করিয়া, দুধবাণি
বা জলবাণি খাইয়া থাকেন ; কিন্তু তাহাতেও রোগের হাত
হইতে নিস্তার পান না !! অথচ সমুদয় খাদ্যাহার পরিত্যাগ
করার ফলে এই হয় যে, রোগী আর কোন দ্রব্যই ভোজন
করিতে পারেন না ; আহার করিলেই অসুখ ভোগ
করিতে (অজীর্ণরোগীর) হয়। ইহা দেখিয়া আমরা সিদ্ধান্ত
করিয়াছি যে, কোন প্রকার খাদ্যপদার্থই পরিত্যাগ করা

উচিত নহে; সকল জিনিষই খাইবে, তবে পরিমাণে
 স্বল্প করিয়া এবং উপযুক্ত সময়ে। ইহা করিতে পারি-
 লেই দেখিবে যে, শরীরবিধান (System) সমুদয়
 জিনিষই সহিয়া যাইবে এবং অজীর্ণতার জন্মও বিশেষ ভাবে
 হইবে না। যে জিনিষ ব্যবহারে সহ্য হইতেছে না দেখিবে,
 তখনকার মত তাহা বাদ দিয়া, আবার ৪৮ দিন পরে উহা
 ব্যবহার করিয়া দেখিবে। এই প্রকার ২১ বার করিলেই
 উহা সহ্য পাইয়া যাইবে। আমরা কয়েকটি অজীর্ণরোগে
 প্যাথলজী অবস্থা সম্পন্ন এবং বার্লি বাতিরেকে সমুদয় আহাৰ্য্য
 পদার্থ বর্জনকারী রোগীকে, এই ব্যবস্থায় রাখিয়া প্রায় সকল
 দ্রব্যই আহাৰে পুনরভ্যাস করাইতে পারিয়াছি।

১৮। আহাৰে বসিয়া যাহাতে সুস্থচিত্তে এবং প্রকৃষ্টমনে
 ভোজন করিতে পার তাহা করিবে; বিশেষ কারণ সত্ত্বেও
 দস্তবমত রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করিবে না।

১৯। অত্যাচার এবং অনিয়ম হইতে সদা
 সাপ্যম ও আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে।
 মনে করিও না যে এক দিনের অনিয়মে কোন ক্ষতি হইবে
 না; শরীর সুস্থ থাকিলে অবশ্য উহা সামলাইয়া যাইতে
 পার, কিন্তু ভগ্নশরীরে উহা ক্ষতি করিবেই! যে দিন
 অনিয়ম বা অত্যাচার করিবে সেই দিনই যে অনুশ্রম করে
 তাহা নষ্ট; ২৪ দিন পরেও উহার প্রতিকূল ভোগের আশঙ্কা
 থাকে জানিবে।

২০। উপরে যে যে নিয়মগুলি প্রতিপালন করিতে লেখা
হইল, উহার কারণ এবং যুক্তি অনুসন্ধান করিতে হইলে পুস্তক
খানি একবার পাঠ করা কৰ্ত্তব্য। যদ্ব্যন্থানে উক্ত সমুদয় বিষয়ে-
রই বিস্তৃত ব্যবস্থা এবং যুক্তি দর্শান হইয়াছে দেখিতে
পাইবে।

সমাপ্ত ।
